সরস প্যাসেঞ্জার

প্রকাশক :
শ্রীগোপাল দাস মজুমদার
ডি. এম. লাইব্রেরী
কলিকাতা—৬

প্রথম প্রকাশ—শ্রাবণ ১৩৬৩

প্রচ্ছদ :—আশু বন্দ্যোপাধ্যায়

মুদ্রাকর :
শ্রীশীতলচন্দ্র ঘোষ
শ্রীধরনাথ প্রেস
৮৩বি, বিবেকানন্দ রোড,
কলিকাতা—৬

সূচি

সরস প্যাসেঞ্জার

রাত প্রায় ন'টা বাজে। সন্ধ্যা সাতটা থেকে রাইটিং প্যাডের শূন্য খাতার দিকে নিথর চোখে তাকিয়ে রয়েছেন তারাপদ রায়। সাদা খাতার দিকে তারাপদবাবু সেইভাবে তাকিয়ে রয়েছেন যেভাবে কৃষক তাকিয়ে থাকে খরাক্লিষ্ট জমির দিকে, যেভাবে ধীবর শুকিয়ে-যাওয়া বিলের দিকে তাকিয়ে থাকে।

আরও পরিষ্কার করার জন্যে, শহুরে পাঠকদের সুবিধের জন্যে বলা যেতে পারে তারাপদবাবু তাঁর খাতার সাদা পাতার দিকে সেইভাবে তাকিয়ে রয়েছেন যেভাবে ছাঁটাই শ্রমিক বন্ধ-কারখানার দিকে তাকিয়ে থাকে।

সারা সন্ধ্যা মাথা খুঁড়েও একটিও তাজা সজীব টলমলে রসিকতা তারাপদবাবুর মাথায় খেলেনি। তিনি চমৎকার জানেন, তাঁর এই হাসি-হাসি খেলা গোঁজামিল দিয়ে বেশি দিন চলতে পারে না। চুরি-চামারি যা করে হোক তাঁকে হাসির খোরাক জোগাড় করতে হবে না হলে এ লাইন ছাড়তে হবে।

কী করবেন ঠিক করতে না পেরে, ঠিক কীভাবে আরম্ভ করবেন এবং ঠিক কী যে আরম্ভ করবেন, একটিও মজার বিষয় বা গল্প মনে পড়ছে না। যা দু-একটা মনে পড়ছে সবই পুরোনো, বস্তাপচা, বারবার লেখা।

যখন রম্যনিবন্ধ রচনার সব আশাই ছেড়ে দিয়ে তারাপদবাবু স্থির করেছেন তাহলে অনেকদিন পরে একটা প্রেমের কবিতা লেখা যাক, বুড়ো বয়েসে প্রেমের পদ্য জমে ভালো। ঠিক সেই মুহূর্তে গঙ্গারাম। তার মুখে বেশ একটা উৎফুল্ল ভাব। তারাপদবাবুর সামনে সাদাখাতা ও মুখে গাম্ভীর্য দেখে সে গুপি গাইন—বাঘা বাইন ছবির সন্তোষ দত্তের স্টাইলে প্রশ্ন করল, 'রসিকতা কি কম পড়িয়াছে?'

তারাপদবাবু প্রায় মৌনভাবে ব্যাপারটা স্বীকার করলেন। গঙ্গারাম বলল, 'আর চিন্তা করবেন না হাসির খোঁজ পাওয়া গেছে।'

এরপরে গঙ্গারাম যা বলল সে এক রূপকথা, অবিশ্বাস্য।

সে বলল কাল রাতে স্বপ্নের মধ্যে সে একটা রেলগাড়ির সন্ধান পেয়েছে, 'সরস প্যাসেঞ্জার'। তার কামরায়-কামরায় রসিক যাত্রীরা বসে বসে গ্রাম-শহরের কত মজার গল্প বলছে। অফুরন্ত তাদের একেকজনের ভাণ্ডার। সে ট্রেনের ফেরিওলা পর্যন্ত হাসির বই বেচছে। হাসির গান গেয়ে ভিখিরিরা ভিক্ষা করছে।

তারাপদ রায় গঙ্গারামকে দীর্ঘকাল ধরে চেনেন। তিনি অনুমান করলেন কোথাও

থেকে নতুন জোকবুক কিনেছে বা সংগ্রহ করেছে। যেটা পুঁজি করেই আজ তার এই আজগুবি গল্পের অবতারণা।

যাচাই করার জন্য তিনি বললেন, 'দু-একটা নমুনা শুনি।'

নিঃসংকোচে গঙ্গারাম শুরু করল—

রেলগাড়ির প্রথম কামরায় দেখি এক ভদ্রলোক খুব জমিয়ে বসেছেন। তিনি সহযাত্রীদের জিজ্ঞাসা করলেন, 'জানেন আমার স্ত্রী আমাকে কি ভাবেন?'

সহযাত্রীরা বললেন, 'না তা আমরা জানব কী করে?'

ভদ্রলোক কপালে করাঘাত করে বললেন, 'কী আর বলব আমার স্ত্রী আমাকে মানুষ বলেই গণ্য করেন না। তিনি আমাকে একজন আধপাগলা লোক বলে মনে করেন।'

এবার শ্রোতারা জানতে চাইল, 'কিন্তু আপনি জানলেন কী করে?'

ভদ্রলোক বললেন, 'কাল সন্ধ্যাবেলা একটু দেরি করে বাড়ি ফিরেছি। বাড়ি ফিরে দেখি আমার স্ত্রী হাপুস-নয়নে কাঁদছেন। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'কী হয়েছে? কী ব্যাপার?' চোখের জল শাড়ির আঁচল দিয়ে মুছতে মুছতে স্ত্রী বললেন, 'একটু আগে পাড়ার লোকে বলাবলি করছিল, একটা আধপাগলা লোক রেলে কাটা পড়েছে, আমি ভাবলাম সেটা তুমি বুঝি।'

গঙ্গারামের গল্পটা শুনে তারাপদ রায় তাকে বাহবা দিলেন। অনেকদিন এমন তাজা গল্প চোখে পড়েনি তাঁর।

গঙ্গারাম উৎসাহিত হয়ে বলল, 'তাহলে অন্য কামরার একটা গল্প বলি, সেটাও স্বামী-স্ত্রীর ব্যাপার।'

তারাপদবাবু নিজ স্বার্থেই রাজি হলেন। তবে ঘড়ির কাঁটার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'পৌনে দশটা বাজে। রাতের খাওয়ার সময় হয়ে গেছে। তাড়াতাড়ি করো।'

গঙ্গারাম বলল, 'এ গল্পটা যিনি বললেন, এটা তাঁর নিজের গল্প নয়। এটা তাঁর পাশের বাড়ির বিরাজবাবুর ঘটনা...'

....বিরাজবাবু ভালাভোলা প্রকৃতির মানুষ। সরকারি অফিসে কাজ করেন। একটা ফ্ল্যাটবাড়ির তিনতলায় থাকেন। দুঃখের বিষয় তাঁর স্ত্রী ভারী দজ্জাল।

তিনি সব কিছু ভুলে যান। এই জন্যে ঘড়ি, কলম, চশমা, রুমাল ইত্যাদি অফিস বেরোনোর মুখে বাইরের ঘরের টেবিলে সাজিয়ে রাখেন। অফিসে বেরোনোর মুখে সেগুলো পকেটস্থ করে বেরিয়ে যান।

কিন্তু সেদিন ভুল করে বিরাজবাবু ঘড়ি, চশমা এসব না নিয়ে নেমে আসেন। তারপর খেয়াল হতে নিচ থেকে স্ত্রীকে চেঁচিয়ে ডেকে বলেন, 'আমার ঘড়ি চশমা সব ফেলে এসেছি।'

বিরাজবাবুর স্ত্রী নিচ থেকে ডাকাডাকি করা পছন্দ করেন না, তদুপরি স্বামীর এই ধরনের গাফিলতি তাঁর বরদাস্ত নয়। একে-একে ঘড়ি, চশমা ইত্যাদি এসে রাস্তায় পড়তে লাগল এবং ভেঙে চুরমার হতে লাগল।

বিরাজবাবু দেখলেন, সব চুরমার হয়ে যাচ্ছে। তিনি স্ত্রীকে বললেন, 'থাক, থাক, রুমালটা নিচে ফেলতে হবে না। সেটা আমি ওপরে গিয়ে নিচ্ছি।'

যদিও এ গল্পটা তেমন নয়, তারাপদ রায় গঙ্গারামকেও ধন্যবাদ জানালেন। গঙ্গারাম আরও গল্প বলতে যাচ্ছিল। এবার তাকে থামিয়ে তারাপদবাবু বললেন, 'আজ থাক, আবার পরে হবে।'

হাসির গল্পের স্বাদ

ঢাকা থেকে প্রকাশিত 'কালি ও কলম' পত্রিকায় আমি গোড়া থেকে নিয়মিত রম্যরচনা লিখে আসছি। এ অবশ্য নতুন কিছু নয়, আমার পাঠক-পাঠিকা জানে, ষাটে এবং সত্তরের দশকে কিছু সময় বাদ দিলে গত চল্লিশ বছরের বেশি কাল আমি অনবরত এই কুকর্ম করে যাচ্ছি।

সেই উনিশশো আটান্ন-উনষাটে রবিবাসরীয় 'জনসেবক' পত্রিকায় সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের উৎসাহে ও আনুকূল্যে আমার ধারাবাহিক রম্যরচনা শুরু। তারপর বহুকাল ধরেই আমি সেই একই লেখা আজও লিখে যাচ্ছি। প্রায় সমস্ত বাংলা দৈনিক পত্রিকায় আমি বছরের পর বছর একই লেখা লিখে যাচ্ছি। পাশাপাশি সাময়িকপত্রের সংখ্যাও কম নয়। শুধুমাত্র রম্যরচনার বই প্রায় তিরিশ-চল্লিশটা হয়ে গেছে। অনেক সময় প্রায় একই রকম রচনা পাশাপাশি প্রকাশিত হয়েছে।

পাঠক-পাঠিকারা রাগ করেছেন, অভিমান-অভিযোগ করেছেন। আমি কিন্তু এখনো অদম্য, আর দমেননি আমার সম্পাদক ও প্রকাশকরা। তাঁরা অম্লান বদনে এবং আনন্দের সঙ্গে আমার লেখা এবং বই এখনো ছেপে চলেছেন। কেউ টাকা দেন, কেউ টাকা কম দেন, কেউ দিচ্ছি-দেব, কেউ একেবারে দেন না।

কিন্তু তবু ওঁরা রেখেছেন বলেই আমি আছি।

সে যা হোক, ইতিমধ্যে আমার বয়স বেড়েছে। এখন আর ইচ্ছে নেই পুরোনো লেখা পড়িয়ে পাঠককে প্রবঞ্চনা করার। ইচ্ছে করলেই নতুন লেখা বানানো যায় না। হাসির লেখা ছক কেটে হয় না। সে এক দুর্বিষহ ব্যাপার। সেই জোর করা হাসি হাসতে গিয়ে চোখে জল আসে। অথচ হাসির গল্পের উপাদান ক্রমশ দুর্বল হয়ে উঠছে। যাদের সঙ্গে বসে একদা আমি "খোশ" গল্পে মশগুল হতাম তাঁরা একে একে নিশ্চিহ্ন কিংবা অস্তমিত হয়ে গেছেন। হাসির গল্পের বই, পত্রিকাও দুর্লভ। এ যুগে কেউ আর পত্রপাঠের মতো পত্রিকা বার করে ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়াতে চায় না।

সুতরাং আজীবন হাস্য ব্যবসায়ী এই প্রবীণ লেখকের কিছুটা মমত্ববোধ আছে এই

সম্পাদকের প্রতি। সেই মমত্ববোধ থেকে তাঁর হাতে একটি নতুন গল্প এবার উপহার দিচ্ছি।

আদালতে একটি নালিশ এসেছে। এক ব্যক্তির কুকুর এক হাসির গল্পের পত্রিকার সম্পাদককে কামড়ে তারপর আরো দু'জনকে কামড়েছে। হাকিম তাকে জিজ্ঞেস করলেন,—তোমার কুকুর এরকম করল কেন? এই তিনজনকে কামড়াল কেন?

আসামি বলল,—হুজুর ওই হাসির গল্পের পত্রিকা-সম্পাদককে কেন কামড়েছে বলতে পারব না। আমার কুকুর কিছুই তো পড়তে টড়তে পারে না। তবে বাকি দু'জনকে কেন কামড়েছে সেটা অনুমান করতে পারি।

হাকিম জিজ্ঞাসা করলেন,—কী অনুমান তোমার?

আসামি বলল,—হুজুর ওই সম্পাদকেব রক্তে পচা স্বাদ বদলানোর জন্য কুকুরটা বাকি দু'জনকে কামড়ে দেয়।

হাকিম বললেন,—সম্পাদকের রক্তের পচা স্বাদ তোমায় কে বলল?

—কাউকে বলতে হবে না হুজুর,—আসামির চমৎকার জবাব,—সম্পাদকের কাগজে লেখাগুলো পড়লেই বোঝা যায় সেগুলো কত পচা। সম্পাদকের রক্তেও যে সেই পচা স্বাদ থাকবে, এ বিষয়ে সন্দেহ কি!

বই

আমাদের শৈশবে দেখেছি বাংলা বছর শেষে বিরাট দুটো চটের ঝোলা নিয়ে এক ভদ্রলোক আসতেন। তিনি ছিলেন বই-এর ফেরিওয়ালা। চৈত্র মাসে চড়কের ঢাকের বাজনা যেমন বেজে উঠত শিবমন্দিরে, ইনিও তেমনি প্রবেশ করতেন আমাদের এলাকায়।

বাংলা বর্ষশেষে তিনি ছিলেন মূলত বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত কিংবা গুপ্তপ্রেস কিংবা পি এম বাগচির পঞ্জিকার ক্যানভাসার। পঞ্জিকা ছাড়াও তাঁর কাছে কখনও বসুমতী সাহিত্য মন্দিরের বঙ্কিমচন্দ্রের গ্রন্থাবলি পাওয়া যেত। পাওয়া যেত কৃত্তিবাসী রামায়ন বা ভারতচন্দ্র। না, রবীন্দ্রনাথ নয়; তবে মধুসূদন গ্রন্থাবলি মনে পড়ছে। এছাড়াও মনে পড়ছে হস্তরেখা বিচার, বশীকরণ বিদ্যা, সহজ ইন্দ্রজাল শিক্ষা, রন্ধন প্রণালী, সচিত্র গো-চিকিৎসা, সত্যনারায়ণ ও লক্ষ্মীর পাঁচালি—এই রকম সব বই। তবে হনুমান চল্লিশা দেখিনি। সমতল বঙ্গভূমিতে তখনও হনুমানজির প্রভাব বিস্তৃত হয়নি।

ভদ্রলোকের নাম ছিল বোধহয় নবকৃষ্ণবাবু। তিনি আমাদের এলাকায় আসতেন ঢাকা থেকে স্টিমারে। বাংলা বাজার, ঢাকায় বই-এর হোলসেলার ছিল, সেখান থেকে

বই কিনে তিনি ঝুড়ি ভর্তি করে আমাদের শহরে তাঁর পরিচিত কোনও এক ঠেক-এ রাখতেন। সকাল বেলা ঝোলায় বেশ কিছু বই ভরে নিয়ে শহরের নানা পাড়ায়, আশপাশের গ্রামগুলিতে চলে যেতেন।

সেকালের লোকের বাড়িতে মধ্যাহ্নের অন্ন কিংবা রাত্রিতে মাথা গোঁজার জায়গার অভাব হত না। নবকৃষ্ণবাবু পাড়ার মধ্যে ভরদুপুরে ঘুরতে ঘুরতে সাধারণত কোনো না কোনো বাড়ির গৃহকর্তা বা কর্ত্রীর আমন্ত্রণ পেতেন দুপুরে খেয়ে যাওয়ার জন্য। একান্নবর্তী গৃহস্থ পরিবারে ভাত একবারে রান্না হত না। দুপুরের আগে দুতিন বার রান্না হত। তার মধ্যে অতিথির আয়োজন হয়ে যেত। আর রাত্রিবাস, পূর্বপরিচিত নিরীহ বই-এর ক্যানভাসারকে কাছারি ঘরে বা বাইরের ঘরে বা দালানের বারান্দায় শুতে দেওয়ায় আপত্তির কিছু ছিল না। শুধু রাত্রিবাস নয়, নৈশাহারেরও ব্যবস্থা হয়ে যেত। সকলের যখন পাত পড়ত বাইরের অতিথিকেও ডাকা হত। আজকাল আর বই-এর এরকম ক্যানভাসার চোখে পড়ে না। এখন ক্যানভাসিং-এর কাজটা করছে বইমেলা।

কলকাতার প্রধান প্রকাশক সংস্থাগুলির অন্যতম মিত্র ও ঘোষ। তার দুই প্রতিষ্ঠাতা গজেন্দ্র মিত্র ও সুমথ ঘোষ বই নিয়ে বাংলার বাইরে বাঙালি অধ্যুষিত শহরে শহরে বিক্রির জন্যে ঘুরে বেড়াতেন। দে'জ পাবলিশিং-এর প্রতিষ্ঠাতা কিংবা সাহিত্যম-এর প্রতিষ্ঠাতা সম্পর্কেও এরকম কথা শোনা যায়।

তবে গজেন্দ্র মিত্র এবং সুমথ ঘোষ ছিলেন খ্যাতনামা লেখক। তাঁরা বই নিয়ে লোকের দোরে দোরে বিক্রির জন্যে ঘুরছেন, একালের কোনো সাহিত্যিক এরকমটা ভাবতে পারেন না।

বই বেচা খুব কঠিন কাজ। সল্টলেকে এক ভদ্রলোক বেল বাজিয়ে বাড়িতে বাড়িতে ফ্ল্যাটে ফ্ল্যাটে বই বেচার চেষ্টা করেছিলেন। যেভাবে ফলওয়ালা বা মাছওয়ালা করে, কিন্তু বইওয়ালা সফল হননি। অনেক বাড়িতেই তিনি জবাব পেয়েছিলেন, 'বই লাগবে না। আমাদের বই আছে।' কী কী বই, কী রকম বই কিছুই না জেনে এরকম আশ্চর্য জবাব ভদ্রলোককে ক্লান্ত করে তুলেছিল। তিনি এখন বই বিক্রি ছেড়ে লটারির টিকিট বিক্রি করেন।

আমি কলকাতায় প্রথম এসে সাহেবপাড়ায় যে গলিতে থাকতাম সেই ডেকার্স লেনের দুই প্রান্তে দুটি বড় খোলামেলা বই-এর দোকান ছিল। সবই ইংরেজি বই। ডেকার্স লেন ও এসপ্ল্যানেডের মুখে থ্যাকার্স পিঙ্ক-এর দোকান। লিফটে করে যেতে হত চারতলায় কি পাঁচতলায়। পেছন দিকে গ্রেট ইস্টার্ন হোটেলের ছাদের নিচে নিউম্যানের দোকান। থ্যাকার্স পিঙ্ক উঠে গেছে সে বোধহয় পঞ্চাশ বছর হয়ে গেল। নিউম্যান উঠি-উঠি অবস্থায় ছিল বহুকাল। নিউম্যান বই-এর সঙ্গে আরও অনেক সামগ্রী জড়িয়ে ধুকধুক করে কোনোরকমে বেঁচে ছিল অনেকদিন ধরে। তবে এখনও বেঁচে আছে কিনা তা জানি না।

এছাড়া ম্যাকমিলান কিংবা অক্সফোর্ডের দোকানও ছিল কলকাতায়। এগুলি সবই

ইংরেজি বই-এর দোকান। বাংলা বই-এর জন্যে যেতে হত কলেজ স্ট্রিটে। দাশগুপ্ত, বেঙ্গল পাবলিশার্স, এম সি সরকার, ডি এম লাইব্রেরি—বাংলা বই-এর সব বড়বড় আস্তানা। অধিকাংশই প্রকাশক। পাশাপাশি পুস্তক বিক্রেতাও বটে।

পঞ্চাশের দশকের গোড়ায় বাংলা বই-এর প্রকাশন ও বিক্রির চূড়ান্ত প্রসার ঘটিয়ে-ছিলেন সিগনেট প্রেস ও বুকশপের দিলীপ গুপ্ত। ধর্মতলায় ওয়েলিংটনের মোড়ে বিখ্যাত কমলালয় স্টোর্সে শাড়ি, গয়না, প্রসাধন দ্রব্যের মতো বইও বিক্রি হত। স্টোর্সের মধ্যে পাশেই ছিল রেস্তরাঁ, সেখানে দশ পয়সা দিয়ে মাংসের সিঙাড়া খেতে খেতে সদ্য কেনা বই-এর আস্বাদ গ্রহণ করা এক পরম প্রাপ্তি ছিল।

সেই যুগে প্রেমেন্দ্র মিত্র গ্রন্থ পার্বণের প্রস্তাব দেন। রবীন্দ্র জন্মদিন উপলক্ষে একপক্ষ বাঙালি পরস্পরকে বই উপহার দিক।

ব্যাপারটা কয়েক বছর ধরে ভালোই চলেছিল। তখন অবশ্য অধিকাংশ বাংলা বই প্রকাশিত হত পয়লা বৈশাখ থেকে অক্ষয় তৃতীয়ার মধ্যে। রথে উল্টোরথেও কিছু কিছু আর কিছু পুজোর সময়। এখন তো প্রায় সব বই-ই বেরোয় বইমেলায়। জানুয়ারির শেষ এবং ফেব্রুয়ারির প্রথম সপ্তাহে।

একজন খ্যাতনামা প্রকাশক তো বলেই ফেলেছেন, 'বইমেলা মানে মেলা বই।'

ইদানীংকালে বই শব্দটি নতুন মাত্রা পেয়েছে। পার্ক স্ট্রিটের মোড়ে জনৈক পুলিশ সার্জেন্টকে বইমেলার আগের দিন সন্ধ্যায় বই নিয়ে আসা টেম্পো ও ট্রাকগুলিকে আলাদা করে ছেড়ে দিতে দেখেছি। স্পষ্ট শুনেছি, তিনি বই-এর গাড়িকে লক্ষ্য করে বলেছেন, 'আসুন বেয়াইমশাই।' এখানে 'বেয়াই' মানে 'বই-বাহিক'।

বইমেলা কলকাতার ধমনীতে প্রবেশ করে গেছে। এই বইমেলাতেই এক আধপাগলা ভদ্রলোককে হতাশ হয়ে দোকানে দোকানে ঘুরতে দেখেছি। ময়লা ধুতি-পাঞ্জাবি পরা ভদ্রলোকটিকে প্রায় সব দোকানদারই চিনে ফেলেছেন। তাকে দেখলেই হাতজোড় করে বলছেন, 'না, না ও বই এখনও বেরোয়নি।'

ভদ্রলোকের করুণ মুখ দেখে আমার মায়া হয়েছিল। আমি তাঁকে 'কী বই খুঁজছেন' জিজ্ঞাসা করায় ভদ্রলোক ম্লান হেসে বলেছিলেন, 'একটা সামান্য সাধারণ বই।'

কৌতূহলী হয়ে আমি বললাম, 'কী নাম?'

ভদ্রলোক বললেন, 'পিপীলিকাদেব যৌনজীবন।'

* * *

পুনশ্চ : গত বছর পুস্তক পরিচয় বিভাগে কোথায় যেন লিখেছিলাম, 'একটি অত্যন্ত দুঃখের বই পড়ে আজ সকালবেলা আমার চোখে জল চলে এসেছিল' এবং সেখানে আমি স্বীকার করেছিলাম যে সেটি আমার ব্যাংকের পাশবই যেখানে জমার ঘর প্রায় শূন্য। দুঃখের বিষয়, আমার এই করুণ কাহিনি শুনে পাঠক পাঠিকারা কেউ নাকি এক বিন্দু অশ্রু বিসর্জন দেননি। বরং তাঁরা হাস্য সংবরণ করতে পারেননি।

পুরোনো দিনের মজার কবিতা

... হিতসাধিনী সভার চাঁদাচুরি কাণ্ড
ছড়িয়ে পড়েছে আজ সারা ব্রহ্মাণ্ড।
ছেলেরা দুভাগ হল মাগুরার কলেজে
এরা যদি বলে বেল, ওরা লাউ বলে যে।
চালতার ফল থাকে উভয়ের মাঝেতে,
তারা লাগে দুদলের সভাভাঙা কাজেতে।...

একটি বিখ্যাত, বহুপঠিত, সুদীর্ঘ ছড়ার সামান্য অংশটি দিয়ে এই নিবন্ধটি শুরু করলাম।

কোনো হেঁয়ালি না করে সরাসরি বলা ভালো, এই ছয় পঙ্‌ক্তি রবীন্দ্রনাথের একটি ছড়া থেকে উদ্ধৃত। এই রচনাটির নামই ছিল 'ছড়া', আরম্ভ হয়েছিল এইভাবে,

ঝিনেদার জমিদার কালাচাঁদ রায়-রা
সে বছর পুষেছিল এক পাল পায়রা।

এই রকম সরল আরম্ভ থেকে কলেজের ছেলেদের দুভাগ হয়ে লড়াই, আরেক দল সভাভাঙার কাজে নিযুক্ত।

এই ছড়া প্রায় একশো বছর আগে লেখা। কিন্তু পড়ে কেউ বলতে পারবে না এই কবিতা গতকাল রচিত হয়নি।

আরো পিছনে যাই। অনেক পিছনে। ১৮৫৭ সনের সেপাই বিদ্রোহের ঢের আগে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত লিখলেন,

...কামরূপেতে কাগ মরেছে,
কাশীধামে হাহাকার।...

ঈশ্বর গুপ্তই লিখেছিলেন,

ঢলঢল ঢলঢল বাঁকাভাব ধরে।
বিবিজান চলে যান লবেজান করে॥

নির্গুণ ঈশ্বরকে কবি ঈশ্বর গুপ্ত বলেছিলেন,

তুমি হে ঈশ্বর গুপ্ত, ব্যাপ্ত ত্রিসংসার।
আমি হে ঈশ্বর গুপ্ত, কুমার তোমার॥

সামান্য দশ-বারো লাইনে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের কবিতার মজা নিয়ে লেখা সম্ভব নয়। অদ্যাবধি অন্তত দশ-বিশটা গবেষণাগ্রন্থ রচিত হয়েছে ঈশ্বরগুপ্তের কাজমহিমা নিয়ে। এখনো আলোচনা হয়।'

নীলদর্পণের দীনবন্ধু মিত্রের একটি অবিস্মরণীয় পদ্য (গান) পীরের গান এখনো অনেকের মনে আছে। কোনো কোনো পঙ্‌ক্তি তো প্রায় প্রবাদ হয়ে গেছে :

মুসলমানের মোল্লারে ভাই
হাঁদুর মধ্যি সাধু।
কদু-কুমড়ো ছেড়ে দিয়ে
আকির মধ্যে মধু॥

(হাঁদু = হিন্দু, কদু = লাউ, আকি = আখ, ইক্ষু।)
এই কবিতার শেষে বলা হয়েছে,

মানিকপীর—
ষাঁড়ের মাথায় শিং দিয়েছে,
মানষির মাথায় কেশ।
আল্লা-আল্লা বলরে ভাই,
পালা কল্লাম শেষ॥
মানিকপীর—

নীতিকুসুমাঞ্জলি নামক নৈতিক শিক্ষার পদ্যমালার রচনাকার রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছিলেন ব্র্যান্ডি নিয়ে, সোডা নিয়ে :

... জলে না নিবায় তেজ
কাটে তার ঠান্ডি —
হে সখি, অনল সে কি?
— না সখি, সে ব্র্যান্ডি॥
... ওই শুন বজ্রশব্দে
বর্ষে অনর্গল
হে সখি! নীরদ সে কি?
— না, লো, সোডাজল। ...

এক রবীন্দ্রনাথ ছাড়া উল্লিখিত কবিদের জন্মসাল পৌনে দুশো থেকে দুশো বছর আগে। রবীন্দ্রনাথের দেড়শো জন্মবার্ষিকী দূরে নয়।

যে-কোনো হালকা কবিতায় একটা মেজাজ ছিল আকাশে-বাতাসে। সমস্ত দুঃখ-বেদনা এবং দারিদ্র্যের মধ্যেও রস-রসিকতার অভাব ছিল না। 'বন্দেমাতরমে'র উদ্‌গাতা, *আনন্দমঠ, দেবী চৌধুরাণীর* লেখক ঋষি বঙ্কিমকে একবার দেখুন। বঙ্কিম লিখেছেন, 'বিরহিণীর দশ দশা।'

অষ্টম দশা দিনে   বিরহ বিষাদিনী
মনদুঃখে কিনিল ইলিশ।
তিতিয়া নয়ন জলে   ভাজায় ঝোলে অম্বলে
খায় ধনী খান বিশ ত্রিশ।

ভাবা যায়, এরকম রসিকতা করবেন বঙ্কিমচন্দ্র?

প্রেম করব, ভালোবাসব, কবিতা লিখব না

স্ত্রী কিংবা প্রেমিকা, যাই হোক না কেন, নারীঘটিত পদ্য আমি জীবনে বিশেষ লিখিনি। সেই ভাবে ভাবলে আমার প্রেমের কবিতাও খুব বেশি নেই। এই প্রসঙ্গে পত্নী ও প্রেমিকা বিষয়ে কবিদের দিয়ে এই জাতীয় গদ্য লেখানো আমার কাছে কেমন যেন ছেলেমানুষি মনে হয় এবং সেই ছেলেমানুষি প্রায় ক্লিশের পর্যায়ে চলে গিয়েছে। সত্যভাষণ যদি করতেই হয়, তবে বলি স্ত্রী কিংবা প্রেমিকা যাই হোক, দু'জন মহিলাকে আমি কখনই একত্র করিনি। প্রথম যৌবনে আমি কিছু প্রেমের কবিতা লিখেছিলাম, সে সব আমার প্রাক্ বিবাহপর্ব, যেমন যমুনাদি কবিতাটি :

'এ কী হচ্ছে যমুনাদি, এভাবে কি প্রেম করা চলে?
একটু তাড়াতাড়ি করো, নাকি এটা ঠিক প্রেম নয়,
তুমি ঠিক প্রেমিকার পর্যায়ে পড়ো না, যমুনাদি,
তোমার বুকের দিকে তাকালে কৈশোর মনে পড়ে।
তুমি কি এখনো ভাবো আমি সেই ষোলো বছরের
সবুজ পাঞ্জাবি গায়ে দিয়ে আছি, মাসে একদিন
চুল দাড়ি একসঙ্গে কামাই, ক্ষীণ গোঁফ, দ্বিতীয়ার
বাঁকা চাঁদ, তোমারই ঠোঁটের কুলে কবে অস্ত গেছে।'

এই কবিতা ছিল নিতান্ত আমিষ, তবে বলি, এই যমুনাদি আমার প্রাক্‌বিবাহ কোনো যমুনাদি নয়, কেউ-ই নয়, কোনো একটি বিশেষ রমণীর প্রতি অনুরাগ আমি তেমন ভাবে কখনও প্রকাশ করিনি, জীবনেও না, কবিতাতেও নয়। ৪১ বছর আগে, আমার বিয়ের সময় লেখা কবিতা, 'শেষ বার বিদায়' খুব সৎভাবেই লিখেছিলাম :

গোপন সিন্দুক খুলে কয়েকটি চিঠি পথে ফেলে দিতে হবে
কিছু উষ্ণ দীর্ঘশ্বাস, এক আকাশভরা বিনিদ্র রজনী।
যেখানে পেরেক গাঁথা ছিল, ফোটো খুলে
চুন-বালি-পলেস্তারা
নতুন করাতে হবে; এলোমেলো ভালোবাসা ক্ষণিক যৌবনে
বড়ো বেশি পাওয়া গেছে—সিমেন্টের সবচিহ্ন কিছুতে
মোছে না।
হে অনুগ্রাহিকাবৃন্দ, শেষবার ক্ষমা করো, এই শেষবার,
চপল যুবার কোনও অস্থিরতা, যদি কারো উদার প্রশ্রয়ে
যদি মুহূর্তের তরে কোনোদিন কারো প্রিয়তম হয়ে থাকি;

বাসনায়, অনুরাগে কারো স্মৃতি কোনো ভুলে সিক্ত
হয়ে থাকি
শেষতম ক্ষমা চাই, শেষবার বাই-বাই, বিদায়-বিদায়

প্যারিসের সায়াহ্নের গন্ধমাখা যৌবনের আরক্ত রুমাল
দ্রুতছবি জানালায় ওড়াবার পরে কোলাহল মুখর জং মনে
কে এনেছো আহত গোলাপদল, ফেয়ারওয়েল
কয়েকটি কমলা
আমার কৈশোর স্মৃতি, যৌবন বেদনারসে উজ্জ্বল আমার
পথের সম্বল কিছু, নীল আলো প্লাটফর্মে বিদায়ের বাঁশি
ক্ষমা করো, শেষবার ক্ষমা করো, বিদায়, বিদায়।'

এরপরে 'বনানী' নামে আমার একটি কবিতা কিঞ্চিৎ প্রশংসিত হয়েছিল :

'বনানী নামে সেই মেয়েটির সঙ্গে অনেকদিন দেখা হয়নি
শেষবার দেখা হয়েছিলো
গত বছরের আগের বছর পুনর্মিলন উৎসবে,
আমরা বললাম, 'বনানী, সবাই কেমন বদলিয়ে গেছি
সকলেই কেমন ভারি হয়ে গেছে।
চশমা, পাকাচুল
শুধু তুমি আগের মতো আছো।
বনানী আগের মতোই মৃদু হেসে বললো,
'এই এক রহস্য'।'

তবে এই বনানী আমার প্রেমিকা নয়, আমার স্ত্রীও নয়, সে আমার চিরদিনের পবল সখি। এই প্রসঙ্গে আরেকটা খেয়াল খুশি ভালোবাসার কবিতা মনে পড়ছে। তার প্রথম দু'লাইন হল :

'ছুটির মধ্যে ট্রামে দেখা একটুখানি হেসে
বললে তুমি কেমন আছো সোনাকে ভালোবেসে?'

এই সমস্তের বাইরে আমার কিছু প্রেম অপ্রেমের কবিতা আছে। যার মধ্যে একটি হল 'জবানবন্দী' যেখানে আমি আদালতে হলপ করে বলেছিলাম 'হুজুর ধর্মবতার প্রয়াত শান্তিলতার সঙ্গে মদীয়ের কোনো খারাপ সম্পর্ক ছিল না', আর প্রেমের কবিতা বলতে মিনতিকে নিয়ে লেখা 'পরমহংস'। এই মিনতি মানে মিনতি রায় আমার স্ত্রী, তারই জন্যে, তারই ভয়ে, সারাজীবন হাত খুলে, মন খুলে প্রেমের কবিতা লেখা হয় না।

হে বেলা অবেলার প্রাণের প্রেমিকারা আমার কাপুরুষতা ক্ষমা করো, আমার গলা খুলে গান গাওয়ার সাহস নেই। প্রেম করব, ভালোবাসব, কবিতা লিখব না।

আল মাহমুদ

'কবিতা বোঝে না এই বাঙলার কেউ আর
দেশের অগণ্য চাষী, চাপরাশি
ডাক্তার উকিল মোক্তার
পুলিশ দারোগা ছাত্র অধ্যাপক সব
কাব্যের ব্যাপারে নীরব।
ম্যাগলার আলোচক সম্পাদক তরুণীর দল
কবিতা বোঝে না কোনো সঙ
অভিনেত্রী নটীনারী নাটের মহল
কার মনে কতোটুকু রঙ?
ও পাড়ার সুন্দরী রোজেনা
সারা অঙ্গে ঢেউ তার তবু মেয়ে
কবিতা বোঝে না!'

অথবা

'কবিতা তো ছেচল্লিশে বেড়ে ওঠা অসুখী কিশোর
ইস্কুল পালানো সভা, স্বাধীনতা, মিছিল, নিশান
চতুর্দিকে হতবাক দাঙ্গার আগুনে
নিঃস্ব হয়ে ফিরে আসা অগ্রজের কাতর বর্ণনা।
কবিতা চরের পাখি, কুড়ানো হাঁসের ডিম, গন্ধ-ভরা ঘাস
ম্লান মুখ বউটির দড়ি ছেঁড়া হারানো বাছুর
গোপন চিঠির প্যাডে নীল খামে সাজানো অক্ষর
কবিতা তো মক্তবের মেয়ে চুলখোলা আয়েশা আক্তার।'

উপরোক্ত কবিতার অংশদুটি যে কবির রচনা, তাঁর কোনো আলাদা পরিচিতির প্রয়োজন পড়ে না। তাঁর যে-কোনো কবিতার বই পাতা ওল্টালে, যে-কোনো কবিতায় চোখ বোলালে বোঝা যায় এ এক আলাদা ব্যাপার।

কবিতার ভুবন বলে একটা কথা আজকাল শোনা যায়, সেই ভুবনে আল মাহমুদের নিজস্ব একটি গৃহ আছে। সে গৃহের দরজা-জানলা হাট করে খোলা। সেখানে কোনো কৃত্রিমতা নেই, জটিলতা নেই। সেখানে পাঠকের উদার নিমন্ত্রণ। আল মাহমুদ আমার বহু পুরোনো বন্ধু। সে প্রায় পঞ্চাশ বছর হয়ে গেল।

আমি ১৯৫১ সালে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান থেকে কলেজে পড়তে কলকাতায়

চলে আসি। কিন্তু সেখানকার মাটি থেকে আমার শিকড় ছিঁড়ে যায়নি, এখনো ছিঁড়ে যায়নি। আমি কলকাতায় চলে এলেও আমাদের বাড়ির সবাই মা-বাবা, দাদু-দিদিমা, ভাইয়েরা, প্রতিবেশীরা, বন্ধুরা আত্মীয়েরা দেশে থেকে গিয়েছিলেন। সেই দেশ এখন বাংলাদেশে, কিন্তু আজকাল যোগাযোগ খুব কম।

এই তো সেদিন চোখের চিকিৎসা করাতে দক্ষিণ ভারতে যাবার পথে আল মাহমুদ কলকাতা থেকে ঘুরে গেল। কিন্তু আমি কোনো খবর পেলাম না। এরকম আগে হতে পারত না। তার আসার আগেই আমি খবর পেতাম।

সেই ১৯৫৪-৫৫ সালে যখন সুনীল-শক্তি বা শঙ্খ ঘোষের সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে পরিচিত হইনি, তাদের থেকে বয়সে একটু ছোটো বলে আমি কিন্তু দূর থেকে তাদের দলে ছিলাম। সে অবশ্য প্রথম দু-এক বছব।

ঠিক ওই সময়ে ঢাকা থেকে একগুচ্ছ কবি আত্মপ্রকাশ করেছিল, এঁরা হলেন শামসুর রাহমান, আল মাহমুদ এবং শহীদ কাদরী। পরবর্তীকালে অবশ্য এই তালিকায় যুক্ত হয়েছেন রফিক আজাদ, বেলাল চৌধুরী এবং নির্মলেন্দু গুণ। এঁরা প্রত্যেকেই ক্ষমতাবান কবি। শহীদ কাদরী অবশ্য লেখা এখন ছেড়ে দিয়েছেন। আল মাহমুদ এবং শামসুর রাহমান আগাগোড়া লিখে যাচ্ছেন। একটা কথা বলা ভালো, যখন আমি সুনীল-শক্তির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হইনি, 'কৃত্তিবাসে' একটিও কবিতা লিখিনি, সেই সময়ে আল মাহমুদের সঙ্গে আমার বেশ ঘনিষ্ঠতা। 'পূর্বমেঘ' নামে আমাদের একটা কবিতার কাগজ ছিল, আমি অন্যতম সম্পাদক। সেই কাগজে অযাচিতভাবে আমরা একটি স্বরচিত বিজ্ঞাপন দিয়েছিলাম—যার বক্তব্য ছিল তৎকালীন পূর্ববঙ্গের প্রধান কবি আল মাহমুদের একটি কবিতার বই বেরুচ্ছে। আমাদের সে-বয়সে নিজের লেখা বই, বিশেষত কবিতার বই প্রকাশিত হওয়া একটা বড় ব্যাপার। আল মাহমুদের একটা চিঠিতে সে-সংবাদ পড়েছিলাম, খুব সম্ভব বইটির নামও সেই চিঠিতে দেওয়া ছিল। সেই বিজ্ঞাপনটি নিয়ে তখন কিছু কথা চালাচালি হয়েছিল, যেমন এখনো হয়।

আল মাহমুদকে খুব কাছাকাছি পেয়েছিলাম ১৯৫৫ সালে, বাংলাদেশ-যুদ্ধের সময়ে। আমাদের বাড়িতে আল মাহমুদ এসেছিলেন। তখন তিনি পরিবার থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন। জিজ্ঞেস করেছিলাম, 'পরিবারকে ফেলে চলে এলে কি করে?' আল মাহমুদ বলেছিল, 'এটা সম্পূর্ণভাবে রাজনৈতিক ব্যক্তিগত ব্যাপার। আমি ব্যক্তিগতভাবে টার্গেট, কিন্তু আমার পরিবার নয়।' আসলে মুক্তিযুদ্ধের সময়ে বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবী-লেখক-কবিরা সন্ত্রাসের শিকার হয়েছিলেন। কিন্তু তাঁদের পরিবারগুলিকে সরাসরি আক্রোশের মুখোমুখি হতে হয়নি। এর ছয় মাস পরে কলকাতায় প্রেস ক্লাবে শামসুর রহমান আল মাহমুদ প্রমুখ কবিদের ডেকে একটি কবি-সভা করা হয়েছিল। সভার আহ্বায়িকা ছিলেন শ্রীমতী মীনাক্ষি চট্টোপাধ্যায়, স্বাতী গঙ্গোপাধ্যায় এবং মিনতি রায়ের মতো কবিপত্নীরা। এর পরে সত্তর-আশির দশক ধরে অনেকদিন কলকাতায় এবং পাশাপাশি ঢাকাতেও দুই বাংলাকে মিলিয়ে নানা কবিতা-উৎসব শুরু হয়েছে।

হঠাৎ আশির দশকে শুনলাম যে আল মাহমুদ মোল্লা হয়ে গেছে। কথাটা বিশ্বাস হয়নি। শুনেছিলাম সে নাকি হিন্দু বিরোধী। একদিন এই বলে যে কবিতা লিখতে শুরু করেছিল—

একদিন হেঁটে হেঁটে সেই ব্রতচারী
চলে এলো অন্ধকার রাতের মন্দিরে,
এ-রাতে অধিষ্ঠাত্রী পাথরের নারী
যেখানে বেদীর 'পরে আদিম তিমিরে।

—সেই কবিতার কবিকে হিন্দু-বিরোধী ভাবা অসম্ভব। পরে আবিষ্কার করেছি যে আল মাহমুদ বয়সের সঙ্গে ধার্মিক হয়েছে, তবে সে সাম্প্রদায়িক হয়ে ওঠেনি। তাই 'গজল' কবিতায় দেখি—

বকবাজ শহুরে মোল্লাদের উপদেশে আমি তিতিবিরক্ত
আর সাহায্যটুকু তো মদাসক্ত মাতালের নিঃশ্বাস থেকে আমি পেয়েছি।
আমাকে সেই মন্দিরের স্মৃতি ব্যক্ত করতে দাও
যে আমি জেগে উঠেছিলাম শুঁড়িখানার মূর্তিমতীর হাতের ছোঁয়ায়।

আইনত

অনেক সরকারি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানে কিংবা এলাকায় সাইনবোর্ডে জানানো থাকে—

বিজ্ঞপ্তি
সংরক্ষিত অঞ্চল
বিনা অনুমতিতে প্রবেশ আইনত দণ্ডনীয় অপরাধ।

অথবা দেখা যায় নোটিশ দেওয়া আছে,

ফোটো তোলা আইনত দণ্ডনীয়।

অনেক সময়ে দেখা যায় যে, অপরাধটা যে গুরুতর সেটা বোঝাতে আইনত শব্দটাতে একটা বিসর্গ যোগ করে লেখেন আইনতঃ।

এই বিসর্গটা অবশ্য নিতান্ত বাহুল্য এবং ভুল প্রয়োগ।

অবশ্য আইনত শব্দটিই এখানে বাহুল্য, দণ্ডনীয় অপরাধ কথাটিই যথেষ্ট, দণ্ডনীয় মানেই আইনত দণ্ডনীয়।

আইনের একটা প্রধান শাখা হল ফৌজদারি আইন, ক্রিমিন্যাল কোড বা দণ্ড-সংহিতা। যেখানে নির্দিষ্ট করে বলা আছে, কোন্ অপরাধে বিচারে অপরাধ প্রমাণিত হলে নির্দিষ্ট দণ্ডভোগ করতে হবে।

এক ভদ্রলোক কিঞ্চিৎ তহবিল তছরুপ করেছিলেন। এটা একটা পুরোনো ব্যাধি, সুযোগ পেলে অনেকেই করে কিন্তু অনেকেই, অধিকাংশই, পার পেয়ে যান, ইনি পাননি। গ্রেপ্তার হওয়ার পর আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধবের পরামর্শে এক দুঁদে উকিলকে নিযুক্ত করেন।

উকিল সাহেব কোর্টে আইন এবং নজিরের মোটামোটা বই খুলে বিচারককে বোঝালেন, যে-অপরাধে তাঁর মক্কেলকে সোপর্দ করা হয়েছে সেটা কোনো অপরাধই নয়, সে-অপরাধ যে কে করেছে সেটা নির্দিষ্ট করে বলা অসম্ভব। সুতরাং এ-কেসে শুধু সন্দেহের বশে একজন নিরপরাধ ভদ্রলোককে হয়রান করা হচ্ছে। আইনের ভাষায় যাকে বলে বেনিফিট অফ ডাউট, সেই সন্দেহজনক সুবিধা তাঁর প্রাপ্য।

মুক্তির পরে ভদ্রলোক যখন পুত্রের কাছে শুনলেন উকিল সাহেব মামলায় ফি নিয়েছেন কুড়ি হাজার টাকা, তিনি মাথায় হাত দিলেন। তারপর কিছুক্ষণ ঝিম মেরে বসে থাকার পর ছেলেকে বললেন, 'হাজার দেড়-দুই টাকা খরচ করে ওই রকম কয়েকটা আইনের বই তো তুইও কিনে নিয়ে কোর্টে দেখাতে পারতি।'

'বই তো কিনতে পারতাম', ছেলে বলল, 'কিন্তু কী কী বই তা জানি না। আর কোন্ পাতায় কী লেখা আছে তাও জানি না।'

আইন খুবই জটিল বিষয়। একই আইন ও একই নজির একেকজন ব্যবহারজীবী একেক কায়দায় প্রয়োগ করেন।

আইনজীবীরা আদালতে মামলার কালে যত বই, ব্যাখ্যা বা নজির, ল' জার্নাল পেশ করেন তার সবই কিন্তু প্রয়োজনীয় নয়। উচ্চ-আদালতের, বড় আদালতেব এটা একটা স্টাইল। এত বকবকানি জজ সাহেবরা শোনেন না। বইগুলো অনেকে পড়েও দেখেন না। তাঁরা আদালতে বসে বসে ঘুমোন, হয়তো চোখ বুজে নয়, মনে মনে ঘুমোন।

একজন বড় উকিলকে একবার জিজ্ঞাসা করেছিলাম, 'স্যার, আপনি যে এত মোটা-মোটা, ভারী-ভারী বই আদালতে নিয়ে যান কিন্তু আমার তো ধারণা এ-সব আইনই আপনার নখদর্পণে।'

বিনীত হেসে উকিলবাবু জবাব দিয়েছিলেন, 'না, না, এই বইগুলি আমার জন্যে নয়। এগুলো তো আমার ভালোভাবে পড়া। নিয়ে যাচ্ছি জজ সাহেবের পড়ার জন্যে।'

আইন নিয়ে খুব বেশি কচকচি করা বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। বরং আপাতত একটা সাদামাটা গল্প দিয়ে শেষ করি।

একজন নামকরা চর্মব্যবসায়ী ব্যবসা-সংক্রান্ত একটা মামলায় জড়িয়ে পড়েছিলেন। তিনি একজন ভালো উকিলের শরণাপন্ন হন। সেই উকিল তাঁর পেশায় খুবই যোগ্য ছিলেন, কিন্তু চশমখোর ছিলেন। টাকা-পয়সা ছাড়া আর কিছু বুঝতেন না।

উকিল মামলাটা গ্রহণ করার পরে ব্যবসায়ী তাঁকে একটি সুদৃশ্য চামড়ার পার্স দিয়ে বললেন, 'আমার এই সামান্য উপহারটুকু আপনার জন্যে এনেছি।'

উকিলবাবু একটু বাঁকা চোখে চামড়ার ব্যাগটার দিকে তাকিয়ে ভাবলেন, এই লোকটা এই উপহারটা দিয়ে আমার ফি এড়াতে চাইছে, বেশ কঠোরভাবে বললেন, 'এরকম উপহার আমি নিই না, আমার ফি সতেরো শো টাকা। টাকাটা দিন।'

একটু আহত হয়ে ব্যবসায়ী পার্সটা টেবিলের ওপর থেকে তুলে নিয়ে সেটা খুলে একটা একশো টাকার নোটের বান্ডিল বের করে গুনে গুনে সতেরোটা নোট উকিল-বাবুকে দিলেন। বাকি আট হাজার তিনশ টাকাসমেত পার্সটা নিজের পকেটে ভরে নিলেন।

উকিলবাবু শক্ত মানুষ, কিন্তু সেদিন বড় মনে কষ্ট পেয়েছিলেন।

বিবাহের চেয়ে

সম্প্রতি ওড়িশা অঞ্চল থেকে প্রায় শতায়ু এক ব্যক্তির মৃত্যুসংবাদ প্রচারিত হয়েছে, এবং তা বিভিন্ন ভাষার পত্রপত্রিকায় বিভিন্ন দেশে গুরুত্ব দিয়ে প্রকাশিত হয়েছে।

এক ভদ্রলোক নব্বইয়ের কোঠায় প্রায় শেষপ্রান্তে একশো বছরের মুখে দেহরক্ষা করেছেন। কিন্তু আজকের যুগে মানুষের আয়ু যখন ক্রমবর্ধমান, তখন অনেকেই একশো বছর বাঁচছেন, অনেকে তারও বেশি। এখন সোয়াশো-দেড়শো বছর হলে হয়তো সংবাদ হওয়া যায়, কিন্তু একশো বছর বেঁচে-থাকা কোনো খবরই না। এই ভদ্রলোকের মৃত্যুসংবাদ গুরুত্ব পেয়েছে অন্য কারণে। তিনি নাবালক বয়স থেকে শুরু করে মৃত্যুর দিন পর্যন্ত প্রায় একশোটি বিয়ে করেছিলেন। ঠিক একশো নয়, কেউ বলেন বিরানব্বই, মতান্তরে ছিয়ানব্বই।

ভদ্রলোকের বাসনা ছিল তিনি শতায়ু হবেন এবং সেইসঙ্গে একশোটি বিয়েও করে ফেলবেন। দুঃখের বিষয়, তা সম্ভব হয়নি। এবং মৃত্যুসংবাদ হলেও ঘটনার চমৎকারিত্বে সংবাদটি মিডিয়ার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে।

এককালে ভদ্রলোকেরা অনেকেই একাধিক বিবাহ করতেন এক স্ত্রী বর্তমান থাকতেই। এবং এ-নিয়ে কোনো সামাজিক সংকোচের বালাই ছিল না। তবে একালে এরকম হয় না। আইন করে একাধিক বিবাহ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে এবং এই দোষের সাজাও বেশ কঠিন।

একাধিক বিবাহের সবচেয়ে বেশি সাজা হল একাধিক শাশুড়ি। শাশুড়িতাড়িত পশ্চিমি সমাজে এরকম একটি কথা চালু আছে। বিবাহ-উত্তর নারী-পুরুষের সম্পর্ক যাকে এককালে ব্যভিচার বলে বিচার করা হত একালে সমাজ সেটাকে খুব একটা

হেয়ভাবে দেখে না। ধরে নেওয়া হয়, এর মধ্যে আধুনিকতা বা স্মার্টনেস আছে। যে-স্মার্টনেসের পরিণতি লিভ টুগেদারে বা সহজীবনে।

গত শতকের গোড়ায় বিবাহচিন্তায় নারী-পুরুষের সম্পর্কের বিষয়ে বাঙালি সমাজকে প্রভাবিত করেছিল শরৎচন্দ্রের রচনা। এক নীতিবাগীশ অধ্যাপকের কথা জানি যিনি অচলার প্রেম পবিত্র ছিল না, এই কথা বলে *গৃহদাহ* পড়াতেন না।

আশি বছর আগে কল্লোলীয় আধুনিকতার যুগে অচিন্ত্যকুমার, বুদ্ধদেব, প্রেমেন্দ্র, প্রবোধ সান্যাল এই জাতীয় বিষয়ে বাঙালির চিন্তাকে আলোড়িত করেছিলেন। পরবর্তী যুগে রামকৃষ্ণসেবী রক্ষণশীল অচিন্ত্যকুমার তখন লিখেছিলেন বিবাহের চেয়ে বড়।

অচিন্ত্যকুমার যখন *বেদে* লিখলেন, *কল্লোল-বিরোধী 'শনিবারের চিঠি'* গোষ্ঠী সজনীকান্ত-সুহৃদ এক সমালোচক বলেছিলেন, 'এই যুবকের কি বাবা-মা গার্জিয়ান কেউ নেই? ছেলে বলছে বে দে (বিয়ে দে) আর তাঁরা কিছু করছেন না।'

তারপরে অনেক যুগ পার হয়ে এসেছে। বিয়ে ব্যাপারটা কিন্তু এখনো শতকরা নিরানব্বই ক্ষেত্রে জলভাত হয়ে ওঠেনি। সত্যজিৎ রায় 'আগন্তুক' ছবিতে পরিষ্কার বলে দিয়েছেন, 'বিবাহ হল মানুষের সবচেয়ে পবিত্র প্রতিষ্ঠান।'

এই পর্যন্ত ঠিক আছে। কিন্তু এভাবে তো চলছে-চলবে চলবে না। চলছে-চলবের জন্যে দুটি গল্প। একটি পুরোনো, একটি নতুন।

এক, নাবালিকা কন্যার বিয়ের জন্যে অস্থির হয়ে উঠেছেন বাবা। কিন্তু মায়ের আপত্তি। 'এইটুকু মেয়ের কী বিয়ে দেব? আগে জ্ঞানবুদ্ধি হোক।'

বাবা বললেন, 'জ্ঞানবুদ্ধি হলে কেউ বিয়ে করে না। তখন আর বিয়ে দেওয়া যাবে না।'

দুই, মাঠে গাধা চরছে। বালক-পুত্রকে সঙ্গে করে বাবা বেড়াতে বেরিয়েছেন। সামনে চলে-আসা একটা গাধার দিকে আঙুল দেখিয়ে ছেলে বাবাকে জিজ্ঞাসা করল, 'বাবা, এটা কী?'

বাবা বললেন, 'এটা গাধা।'

পরে অনুরূপ আরেকটি জন্তু এগিয়ে আসতে ছেলে আবার একই প্রশ্ন করল। বাবাও একই উত্তর দিলেন। ছেলের মনে একটু সংশয় দেখা দিল, 'এটাও গাধা?'

একটু দেখে নিয়ে বাবা বললেন, 'এটা গাধার বউ।'

এবার ছেলের মোক্ষম প্রশ্ন, 'বাবা, গাধারাও বিয়ে করে।'

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বাবা বললেন, 'হ্যাঁ, শুধু গাধারাই বিয়ে করে।'

জ্যোতিষী

রেলগাড়িতে মানে বর্ধমান লোকালে শক্তিগড় যাচ্ছিলাম, ভাইঝির বিয়েতে 'ল্যাংচা' নামের বিখ্যাত মিষ্টির অর্ডার দিতে।

দুপুরের দিকের ট্রেন। কামরায় খুব ভিড় নেই। দিবাকরবাবুর সামনের দিকে এক মধ্যবয়সী ভদ্রলোক বসে আছেন—সুডোল, স্বাস্থ্যবান চেহারা, ব্যস্ত, সদাহাস্য মুখ। কেমন যেন চেনা-চেনা।

ভদ্রলোক নিজেই আত্মপরিচয় দিলেন, অযাচিতভাবে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আমাকে চিনতে পেরেছেন বুঝি?'

আমি কিছু বলবার আগেই তিনি আমাকে বললেন, 'আমি শ্রীনারায়ণ, টিভিতে আমাকে দেখে থাকবেন। খবরের কাগজেও প্রত্যেক রবিবার আমার ছবি ছাপা হয়। দেখলে চিনতে পারবেন।'

তখন খেয়াল হল এ ভদ্রলোক হলেন টিভি ও খবরের কাগজের একজন বহু-বিজ্ঞাপিত জ্যোতিষী। বোধহয় পসারও ভালো।

ইতিমধ্যে শ্রীনারায়ণ খপ করে আমার ডান হাতটা চেপে ধরে পকেট থেকে একটা আতস কাঁচ বার করে খুঁটিয়ে কররেখা দেখতে শুরু করেছেন। হাত দেখতে দেখতে তিনি কথা বলে যাচ্ছিলেন, জানা গেল, বর্ধমানে আর কালীঘাটে জ্যোতিষ-চেম্বার আছে, সপ্তাহে তিনদিন-তিনদিন করে বসেন, আজ বর্ধমান যাচ্ছেন।

আমার হাত ধরেই ভদ্রলোক ভ্রূকুঞ্চিত করে আমাকে বললেন, 'সর্বনাশ! আপনার তো খুব খারাপ সময়!'

আমি ঘাবড়িয়ে গিয়ে প্রশ্ন করলাম, 'কী রকম খারাপ?'

ভদ্রলোক বললেন, 'আপনার মা হয়তো মারা যাবেন শিগগিরই।'

আমি অবাক হয়ে বললাম, 'সে কী! আমার মা তো কুড়ি বছর আগেই মারা গেছেন।'

অদমিত জ্যোতিষী বললেন, 'তা হলে নিশ্চয় আপনার শাশুড়ি মারা যাবেন।'

এবার একটু মিথ্যের আশ্রয় নিলাম, বললাম, 'সে গুড়ে বালি। আমি বিয়েই করিনি, শাশুড়ি আসবেন কোথা থেকে?'

জ্যোতিষী চোয়াল শক্ত করে বললেন, 'অবশ্যই আপনার কোনো না কোনো ক্ষতি হবে। কররেখা মিথ্যা বলে না। আপনার অবিলম্বে একটা ক্ষতি হবেই।'

কোনো রকম দুশ্চিন্তা না করে আমি প্রশ্ন করি, 'কী ক্ষতি?'

প্রায় কিছু না ভেবে জ্যোতিষী বললেন, 'আপনার ছাতা চুরি যাবে।'

জ্যোতিষী ঠাকুরের ভবিষ্যদ্বাণী অবিলম্বে অক্ষরে অক্ষরে ফলেছিল। তিনি নেমে যাবার পর দেখতে পেলাম আমার ছাতাটি নেই।

দর্শকরা পালাবে

দী. কু. সা এই সংক্ষিপ্ত নামে 'অচলপত্র' সম্পাদক সুরসিক দীপেন্দ্র কুমার সান্যাল আজ থেকে পঞ্চাশ বছর আগে তাঁর কাগজে লিখেছিলেন, আজকালকার শিশুরা জন্মানোর পর 'মা'-'মা' বলে কাঁদে না, তারা কাঁদে 'সিনেমা'-'সিনেমা' বলে। বলা বাহুল্য, সেই সিনেমা শিশুটির বয়স এখন বার্ধক্যের দিকে। তিনি পলিতকেশ প্রৌঢ়।

সিনেমা সেই ভদ্রলোকের জীবনে বেশ বড় ভূমিকা নিয়েছে। 'মানে না মানা', 'শহর থেকে দূরে', 'উদয়ের পথে' পাড়ি দিয়ে তিনি সুচিত্রা-উত্তমে পৌঁছেছিলেন। সত্যজিৎ রায়ের 'পথের পাঁচালী', 'পরশ পাথর', 'আগন্তুক', 'গণশত্রু' সঙ্গে মৃণাল সেন, তপন সিংহ, সমেত তাঁর চলচ্চিত্র-জীবন। সেই ছা-পোষা ভদ্রলোক অবশেষে 'বাবা কেন চাকর'—এইরকম জটিল প্রশ্নের মুখে দাঁড়িয়ে 'শ্বশুরবাড়ি জিন্দাবাদ' স্লোগান দিচ্ছেন।

সে যা হোক, এসব জনপ্রিয় বা যুগান্তকারী চলচ্চিত্রের কথা নয়। পঞ্চাশের দশক থেকেই উৎপাত শুরু হয়েছে এক ধরনের আঁতেল সিনেমার। তার মধ্যে অনেক প্রতীক, অনেক কল্পনা। গঙ্গার ধারে শুয়ে আছে নায়ক, অনাহারে সে প্রাণত্যাগ করতে চলেছে। চোখের সামনে গঙ্গার পশ্চিম পাড়ে সূর্য অস্ত যাচ্ছে। পরিচালকের দক্ষতায় অবিলম্বে সেই অস্তগামী হলুদ সূর্যটি আকাশের নীল প্লেটে একটি উষ্ণ ওমলেটে পরিণত হল। ক্ষুধার্ত নায়ক সেই ওমলেটটি ছিঁড়ে ছিঁড়ে খেতে লাগলেন।

কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য বলেছিলেন, পূর্ণিমার চাঁদ যেন ঝলসানো রুটি। কবির কল্পনা অতদূর পর্যন্ত গিয়েছিল। কিন্তু আঁতেল পরিচালকের কল্পনা অস্তগামী সূর্যকে ওমলেটে পরিণত করে।

এসব তুচ্ছ ব্যাপার। একসময় সিনেমায় মৃত্যুর দৃশ্যে মুমূর্ষুর শয়নকক্ষে দপদপ করে প্রদীপ জ্বলত, যেন বন্দি আত্মার মুক্তির জন্য হাহাকার। এই সময় প্রদীপটা হঠাৎ নিভে যেতে ঘরের মধ্যে দণ্ডায়মান ডাক্তার মাথা থেকে টুপি খুলে ফেলতেন এবং বলতেন, 'মাই গড'। বোঝা যেত রোগী অক্কা পেল। শুধু বোঝা যেত না, ঘরের মধ্যে ডাক্তার টুপি মাথায় দিয়েছিলেন কেন। এবং দিবসে মনের হরষে কেন মোমবাতি জ্বালানো হয়েছিল।

গঙ্গারাম আমাকে বলেছিল, পরবর্তীকালে নাকি বুদ্ধি সিনেমায় মৃত্যুর দৃশ্যে একটা বিশেষ বৈচিত্র্য আনা হয়েছিল।

আদিগন্ত বিস্তৃত পটল খেত। সবুজ পটল লতায় সবুজ পটল হাওয়ায় দুলছে। মৃত্যুমুখী যাত্রী সেই সবুজ খেতের মধ্যে নেমে গেলেন। লং শটে তাঁকে অনেক দূর থেকে দেখা গেল। তারপর জুম ক্লোজআপ। পটলপাতায় হাত বুলোতে বুলোতে একটি নধর পটল তুললেন এবং সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যুমুখে ঢলে পড়লেন চরিত্রটি।

গঙ্গারামের মুখে এ-গল্প শুনে আমি বললাম, "ঠিক বুঝতে পারলাম না।"

গঙ্গারাম বলল, "বুঝলেন না? লোকটা পটল তুলল—মানে মারা গেল।"

গঙ্গারামের কথা সবসময় বলি। আজকে এবার আমার দুটো অভিজ্ঞতার কথা বলব।

চায়ের দোকানের মালিক আমার এক পুরোনো পরিচিত ভদ্রলোক আগে ভালো ফুটবল খেলতেন। পাড়ায় ছোটোখাটো ফাংশনে ভালো গান গাইতেন। তারপরে নাচের ইস্কুল করলেন। অবশেষে থিয়েটার ক্লাব। তারপর হঠাৎ একদিন চলচ্চিত্র পরিচালক হয়ে গেলেন। রীতিমতো আঁতেল পরিচালক। এই ব্যাপারে তাঁকে সাহায্য করেছিল তাঁরই চায়ের দোকানের বহুকালের খদ্দের কয়েকজন নামকাটা অভিনেতা-অভিনেত্রী।

তা, ওই ভদ্রলোক আমাকে একটা পাস দিয়েছিলেন তাঁর সিনেমাটি দেখতে যাওয়ার জন্য। আমি গিয়েছিলাম। কিন্তু বিনিপয়সার সিনেমা দেখা, যেতে বেশ দেরি হয়ে গিয়েছিল।

গিয়ে দেখি হলের সব দরজা বন্ধ। কিছুতেই ভিতরে ঢোকা যাচ্ছে না। কয়েকবার দরজায় বেশ জোরে জোরে ঠক-ঠক করলাম, কিন্তু কেউ ভিতর থেকে দরজা খুলল না। আমি অবশেষে হলের দোতলায় উঠে ম্যানেজারবাবুকে বললাম, "এটা কী ব্যাপার? আমার কাছে পরিচালকের ন্যায্য পাস রয়েছে। আমাকে হলে ঢুকতে দিচ্ছে না।"

ম্যানেজারবাবু হতাশভাবে বললেন, "কোনো উপায় নেই, কিছু করা যাবে না। একবার গেট খুললেই হলের ভিতরের লোকেরা পিলপিল করে পালিয়ে যাবে। হলে একটাও লোক থাকবে না।"

অনুরূপ আর একটি অভিজ্ঞতা আছে আমার। একদিন দক্ষিণ কলকাতার একটি হল থেকে নাইট শো দেখে বাইরে বেরিয়ে দেখি অঝোরে বৃষ্টি হচ্ছে। রাস্তায় কোমর পর্যন্ত জল। দর্শকেরা সবাই গাদাগাদি করে সিঁড়ির উপরে বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছি। দয়ালু ম্যানেজারবাবু দোতলা থেকে নেমে এসে বললেন, "আপনারা কষ্ট করে দাঁড়িয়ে আছেন কেন, বৃষ্টি সহজে ছাড়বে না। আপনারা হলের মধ্যে বসুন। আমি ছবিটা আর একবার চালিয়ে দিই।"

সঙ্গে সঙ্গে হুড়োহুড়ি পড়ে গেল। দর্শকেরা প্রবল বৃষ্টিতে কোমর জলে নেমে যে যার বাড়ির দিকে ছুটতে লাগলেন।

হল ফাঁকা হয়ে গেল। দেখা গেল দ্বিতীয়বার দেখবার মতো এক ব্যক্তিও নেই। সবাই পালিয়েছে।

একলা বৈশাখ

'ড্যাং ড্যাং ড্যাং লা
কার্তিক ঠাকুর হ্যাংলা
একবার আসে মায়ের সাথে,
একবার আসে একলা।'

এই ছড়াটির সঙ্গে আমরা মোটামুটি পরিচিত। দুর্গাপুজোর ঠিক পরেই কার্তিক পুজো হয়। দুর্গাপুজোর সময়েও দুর্গাঠাকুরের সঙ্গে কার্তিক ঠাকুর থাকেনই। সুতরাং শিশুমনে ছড়ার এই প্রশ্নটি জাগতেই পারে।

কিন্তু বুদ্ধদেব গুহ তাঁর এক রচনায় অন্য এক শিশুর কথা বলেছেন যে জানতে চেয়েছিল বৈশাখ মাস একলা কেন?

ব্যাপারটা একটু বুঝিয়ে বলা দরকার।

যেমন ২রা, ৭ই তেমনই অনেকে পহেলা বা পয়লা বৈশাখকে ১লা বৈশাখ লেখে। এরপর শিশুর মনে প্রশ্নটি জাগা অস্বাভাবিক নয়।

সে যা হোক, পয়লা বৈশাখ মানে বাংলা নতুন বছর। যখন জমিদারি ব্যবস্থা ছিল, যখন বাংলা সন অনুযায়ী খাজনা আদায় হত, এবং সে খাজনা এখনকার মতো দিলেও হয়, না দিলেও—এমন নয়। সে যুগে বাংলা পঞ্জিকার গুরুতর ভূমিকা ছিল। পরে পঞ্জিকা সংস্কার হয়েছে। ভারতীয় নতুন বছর বৈশাখ থেকে চৈত্রে চলে গেছে তারও দিন তারিখের মিল নেই। কিন্তু আজও পুরোনো বাংলা পঞ্জিকা রয়ে গেছে। এপার বাংলা ওপার বাংলা দুই বাংলাতেই তার সমান কদর, সমান প্রয়োজন।

আসলে এই যে বাংলা নতুন বছর, এ শুধু গঙ্গা-হৃদি বঙ্গদেশের ব্যাপার নয়। যেখানেই ধান ও রবিশস্য চাষ হয় ভারতবর্ষের সুদূর দক্ষিণ সীমানা থেকে তামিলনাড়ু, ওড়িশা, বাংলা, পূর্ব বাংলা, অসম হয়ে এই নতুন বছর ব্রহ্মদেশ, থাইল্যান্ড এবং ভিয়েতনামেও পালিত হয়। সোজা কথা, সমস্ত দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার নতুন বছরের এটাই সময়। হয়তো দিন-তারিখ একটু এদিক-ওদিক হয়। কিন্তু আমাদের যখন নববর্ষ তখনই দাক্ষিণাত্যে পোঙ্গল, অসমে বিহু।

এশিয়াতেই কেন, ইউরোপেও একসময় বছরের এই সময়ে নতুন বছর আরম্ভ হত।

পরে গ্রেগরিয়ান পঞ্জিকা অনুসারে জানুয়ারির প্রথমে নববর্ষ এগিয়ে যায়। তবে তখনও বেশ কিছু লোক পুরোনো রীতি অনুসারে পয়লা এপ্রিল নতুন বছর করত এবং এখান থেকেই 'এপ্রিল ফুল' প্রবচনের উৎপত্তি।

এসব পাণ্ডিত্যপূর্ণ বিষয় থাক। এর মধ্যেই সম্ভবত বেশ কয়েকটি ভুল কথা বলে ফেলেছি। আমি বরং আমার বাল্যস্মৃতির পয়লা বৈশাখকে একবার স্মরণ করি। ধূপ-চন্দন, নতুন কাপড়, খইয়ের মোয়া, নারকেলের নাড়ু, ক্ষীরের পুতুল—পয়লা বৈশাখ ছিল হিন্দু-মুসলমানের মিলিত উৎসব। এখন বাঙালি মুসলমানের ডিরেক্টরি পঞ্জিকাই অনুসরণ করে থাকেন।

পয়লা বৈশাখ ছিল আত্মীয়স্বজন নিমন্ত্রণ, মিষ্টি চালাচালি, অঢেল অপচয়ের উৎসব। প্রতিমা ছিল না, কোনো নির্দিষ্ট পুজোও ছিল না, তবে অনেকেই নানারকম মন্ত্রপাঠ করতেন। খুব সকালে স্নান করে আমরা পরিস্কার কিংবা নতুন জামাকাপড় পড়ে ঠাকুরঘরে প্রণাম করতাম। বড়দের প্রণাম করতাম।

এগুলো চিরাচরিত মামুলি কথা। এখন একটা গল্প না হলে এই রচনা রম্যরচনা থাকছে না।

গল্পটা দুঃখজনকভাবে মজার।

নব জামাতা অফিসের কী কাজে বাইরে থাকেন। জামাইষষ্ঠীর সময় আসতে পারবেন না। জামাইষষ্ঠীর অল্প কয়েকদিন আগেই পয়লা বৈশাখ। শ্বশুরমশাই পয়লা বৈশাখে জামাতাকে নিমন্ত্রণ করেছেন।

জামাতার খাওয়া-দাওয়ার পর বিকেলে জামাতার হাতে নতুন ধুতি-পাঞ্জাবি, নতুন জুতো তুলে দিয়েছেন। শ্বশুরমশাই লোকটি একটু বিলাসী। জামাতার জন্যে জুতো কিনতে গিয়ে নিজেও একজোড়া চপ্পল কিনেছেন। খুবই সুদৃশ্য সেটা।

জামাতা বাবাজীবন নিজের জুতো জোড়া ফেলে রেখে শ্বশুরমশায়ের জুতো দেখছিল। শ্বশুরমশায় জামাতার মনোভাব অনুধাবন করতে পেরে জামাতাকে বললেন, 'তুমি যদি নিতে চাও, এই জোড়াও নিতে পারো।'

জামাতা লজ্জা পেয়ে বলল, 'না। না।'

কিন্তু মনোভাব তো বদল হল না। কিছুক্ষণ পরে শ্বশুরমশাই দেখলেন তাঁর নতুন চটিজোড়া জামাতা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখছেন। শ্বশুরমশাই চটিজোড়া তাঁর হাতে তুলে দিয়ে বললেন, 'বাবা তুমি এ-জোড়া নাও।'

জামাতা মনে মনে খুশি হলেও মুখে বলল, 'যারা আপনার চপ্পল জোড়া দেখেছে তারা যদি আপনাকে জিজ্ঞেস করে, চপ্পল জোড়া কী হল কী বলবেন?'

শ্বশুরমশাই বললেন, 'কী আর বলব? বলব যে জুতো জোড়া কুকুরে নিয়ে গেছে।'

ব্যবসা-বাণিজ্য

ব্যবসা-বাণিজ্য এই যুগ্ম শব্দটি ইংরেজি 'Trade and Business' শব্দবন্ধের প্রায় সমার্থক।

'সমার্থক' না বলে 'প্রায় সমার্থক' বলতে হল এই কারণে যে ইংরেজি 'বিজনেস' শব্দটি শুধুই ব্যবসাবহ নয়, নানা রকম কাজকর্মও এর মধ্যে পড়ে।

যখন কোনো অকারণ অত্যুৎসাহীকে আপনি ধমক দেন 'মাথা লাগিয়ো না, এটা তোমার বিজনেস নয়', আপনি ব্যবসার কথা বলেন না।

ইংরেজিতে সন্ধি-সমাস নেই। সংস্কৃতজ বঙ্গভাষায় ব্যবসা-বাণিজ্য, ব্যবসা এবং বাণিজ্য দ্বন্দ্ব সমাস, যেমন দিন-রাত, রাম-লক্ষ্মণ।

ব্যবসা ঘরোয়া ব্যাপার, মূলত দোকানদারি। বাণিজ্য শব্দটি দ্বিমুখী, এক্সপোর্ট এবং ইমপোর্ট, অন্তর্বাণিজ্য এবং বহির্বাণিজ্য।

রবীন্দ্রনাথ ধনলক্ষ্মীর কাছে জানতে চেয়েছিলেন, 'কোন বাণিজ্যে বসত তোমার...?

লক্ষ্মীঠাকুরানি বোধহয় তাঁকে তেমন কিছু বলেননি। বিশ্বকবি তাঁর পিতৃ পিতামহের মত, তাঁর পূর্বপুরুষদের মতো কোনো বাণিজ্যেই তেমন সফল হননি।

একটি কাল্পনিক গল্পে রবীন্দ্রনাথ একদা বনিক-প্রধান ঘনশ্যামদাস বিড়লার সঙ্গে ব্যবসাপত্র নিয়ে আলোচনা করছিলেন। আলোচনাকালে মহামতি ঘনশ্যাম তাঁকে বলেছিলেন, 'স্যার, আপনার আর কি, দু'পয়সার কাগজ নিয়ে এক পয়সার কালি দিয়ে খসখস করে লিখলেন, ওমনি-ওমনি দু-চারশো টাকা হয়ে গেল।' রবীন্দ্রনাথ নাকি স্মিতহাস্যে বলেছিলেন, 'ঘনশ্যাম, তোমার নিজের কথাটা ভাবো। একটা চেকবই নিয়ে নিচের দিকে তোমার নামটা সই করে দিলে, সঙ্গে সঙ্গে ব্যাংক থেকে দু-চার লাখ টাকা এসে গেল।'

ব্যবসায়ীরা বলেন—শুভলাভ।

লাভ হল ব্যবসার মূল কথা। হালখাতার দিন ব্যবসায়ীরা দেওয়ালে লিখে রাখেন 'শুভলাভ'।

আমাদের অল্প বয়সে দেখতাম, শুভলাভ লিখে ব্যবসায়ীরা হালখাতা খোলেন ১লা বৈশাখে। কোনো কোনো হিন্দু ব্যবসায়ীরা অবশ্য হালখাতা করেন অক্ষয় তৃতীয়ায়।

আজকাল তো শহরে বিহারি লালাজি, রাজস্থানি শেঠজি, পাঞ্জাবি সর্দারজি ছাড়াও, ভাটিয়া, সিন্ধি, গুজরাটি নানাজাতের ব্যবসায়ী এসেছেন। এদের শুভলাভ আরম্ভের দিন অর্থাৎ হালখাতা খোলার দিন একেক ক্ষেত্রে এক এক রকম। রথযাত্রা কিংবা উল্টোরথে, দক্ষিণ ভারতের পোঙ্গল উৎসবের সময়, কখনও কখনও পশ্চিম ভারতের গণেশ চতুর্থীতে কিংবা উত্তর ভারতের দেওয়ালির সময় হালখাতা হয়।

কলকাতায় ক্রমশ দেওয়ালির দিনে হালখাতার উৎসব বাড়ছে।

মুসলমান দোকানিরা অবশ্য এখনও পয়লা বৈশাখেই হালখাতা করে। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য হালখাতা শব্দটি আরবি অর্থাৎ মুসলমানি। হালখাতার শুভলাভ শব্দটির একটি বিশেষ তাৎপর্য আছে। লাভ যেভাবেই হোক লাভ অর্থেই শুভলাভ—এই কথাটাই ব্যবসায়ী নিজেকে স্মরণ করিয়ে দেন।

শুভলাভের ব্যাপারটা একটু বলি—

'বিনামূল্যে চক্ষু পরীক্ষা করিয়া চশমা দেওয়া হয়'। মধ্য কলকাতার চশমা বাজারের এক দোকানে নলিনাক্ষবাবু চশমা কিনতে গিয়েছিলেন। তার চোখ পরীক্ষা করে কাচের পাওয়ার ইত্যাদি নির্ধারিত হল। তিনি চশমার ফ্রেম বাছলেন, এবার দামের পালা।

বহুদিনের অভিজ্ঞ পাকা দোকানদার চশমার কাচ-ফ্রেম সব গাড়ি ঝাড়ার হলুদ কাপড়ে মুছতে মুছতে সরাসরি খদ্দেরের চোখের দিকে তাকিয়ে খদ্দেরের প্রশ্নের জবাব দিলেন, খদ্দেরের প্রশ্নটা পুরোনো, 'খরচ কত পড়বে'? দোকানদার বললেন, 'একশ আশি টাকা'। তারপর খদ্দেরের মুখে কোনো ভাবান্তর না দেখে দুঃসাহসী হয়ে বললেন, 'প্রত্যেকটা কাচের জন্যে'। এরপরে নলিনাক্ষবাবু এতেও ভড়কাননি দেখে অকুতোভয়ে চশমা ব্যবসায়ী বললেন, 'আর এই ফ্রেমের জন্যে শ-দুয়েক টাকা দেবেন'।

নলিনাক্ষবাবুর মুখে কোনো ভাবান্তর দেখা গেল না। এখন দোকানদারের হাতে আরো তাস আছে। দোকানদার মৃদু হেসে বললেন, 'আপনার কাছে ফিটিংসচার্জ আর কি নেব? শ-দুয়েক টাকা দেবেন।' এতেও নলিনাক্ষবাবুর ভাবান্তর দেখা গেল না। কারণ তিনি বদ্ধ কালা, কানে কিছু শুনতে পাননি। তার চোখ আর কান দুই খারাপ। কানের ডাক্তার রশিদ সাহেব তাকে বলেছে, আগে চোখটা দেখিয়ে নিতে। আধুনিক শারীর বিজ্ঞান বলে—দেখা এবং শোনা, চোখ এবং কান অত্যন্ত কাছাকাছি ব্যাপার। উভয়ই উভয়ের উপর নির্ভরশীল।

পরের লাভের গল্পটা একটু অন্যরকম। এক তরমুজওয়ালা তার ছোটো ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে রাস্তার ধারে পাহাড় করে তরমুজ নিয়ে বসে আছে। একটু কাজে। বিক্রেতা উঠে যাওয়ার সময় ছেলেকে বলে গেলেন, দেড়-দু-কেজি ওজনের তরমুজগুলো দশ টাকা করে বেচবি। বাকিগুলো বেচতে যাবি না। আমি এখনই ফিরে আসছি। তরমুজ-ওয়ালার অনুপস্থিতিতে একজন দশ টাকা দিয়ে একটা তরমুজ নিয়ে গেল। বাবা ফিরে আসতে বাবাকে সেই পয়সা ছেলে দিয়ে বলল—'বাবা একটা লোক একটা তরমুজ নিয়ে এই দুটো পাঁচ টাকার কয়েন দিয়ে গেছে।'

বাবা কয়েন দুটো হাতে নিয়ে বুঝতে পারলেন সে দুটো মোটেই পাঁচ টাকার কয়েন নয়, পঞ্চাশ পয়সার আধুলি। ছেলের এই বোকামিতে তিনি রেগে গিয়ে তাকে এক থাপ্পড় মারলেন। ছেলে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল। তখন বাবার মনে একটু মায়া হল। ছেলেটার মাথায় হাত বুলিয়ে চোখ মুছে দিয়ে বললেন—কাঁদিস না বাপজান, তবুও পঁচিশ পয়সা লাভ আছে।

ঘটনা হচ্ছে ব্যাপারি গড়ে শতকরা পঁচাত্তর টাকা করে দাম দিয়ে কৃষকের কাছ থেকে তরমুজগুলো কিনেছেন। একটা যদি এক টাকায় বিক্রি হয় চার আনা লাভ থাকে।

ব্যবসা-বাণিজ্য নিয়ে গল্প করার অন্ত নেই। আমি নিজেও অনেকবার অনেক জায়গায় বলেছি। তারই মধ্যে দুয়েকটা স্মরণ করছি।

এক প্রবীন দোকানদার তাঁর কিশোর পৌত্রকে নিয়ে এসেছেন দোকানে। যত অল্প বয়েস থেকে দোকানের কাজকর্ম দেখে বুঝে নেয়, ততই সংসারের পক্ষে মঙ্গল।

অন্যান্য বড় মুদিখানার মতো এই দোকানেও ক্যাশবাক্সের পেছনে গদি, গদির ওপরে দেয়ালের গায়ে কাঁচের ফ্রেমের মধ্যে লেখা আছে, সততাই আমাদের একমাত্র মূলধন।

কৌতূহলী কিশোর পৌত্র গনেশ ঠাকুরের মূর্তির নিচে টাঙানো ওই রঙিন হরফে লেখা বাক্যটির মানে ঠিক বুঝতে না পেরে পিতামহকে জিজ্ঞাসা করল, 'দাদু, সততা কি জিনিস?'

পিতামহ একজন ঝানু দোকানদার। তিনি পড়লেন মহাবিপদে। একটু আমতা-আমতা করে তারপর বৃদ্ধ বলেন, 'শোনো তোমাকে গুছিয়ে বলছি। আমি আর তোমার ছোটো ঠাকুরদা, আমরা দুভাই এই দোকানের মালিক। আমি সকালবেলায় এই দোকানে বসি। তোমার ছোটো ঠাকুরদা বিকেলে বসে।

ধরো, একদিন সকালবেলায় একজন খদ্দের এসে জিনিসপত্র কিনতে গিয়ে ভুল করে, পঞ্চাশ টাকার নোটের বদলে একটা একশো টাকার নোট দিয়ে গেল। তখন ওই যে পঞ্চাশ টাকা উপরি লাভ হল, তার থেকে অর্ধেক মানে পঁচিশ টাকা আমি তোমার ছোট ঠাকুরদাকে দেব। এরই নাম সততা। ভাই তো জানে না যে খদ্দের ভুল করে পঞ্চাশ টাকা দিয়েছে, সুতরাং তাকে অর্ধেক ভাগ পঁচিশ টাকা না দিয়ে যদি পকেটে রেখে দিতাম, সে জানতেও পারত না। এই যে পঁচিশ টাকা তাকে দিলাম, একেই বলে সততা।'

সততার এ রকম ব্যাখ্যা শুনে সরল প্রকৃতির কিশোরটি অবাক। সে বলল, 'কিন্তু দাদু, পঞ্চাশ টাকা ভুল করে দিল যে খদ্দের'...

পিতামহ নাতিকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, 'খদ্দেরের ভাবনা তোমার নয়। ও কথা ভেবো না।'

ব্যবসা-বাণিজ্য খুবই জটিল ব্যাপার।

কোন্ জিনিসে কত লাভ, সেটা বিক্রয়কারী ছাড়া আর কেউ জানে না। জানার কথাও নয়।

যখন কোনো জিনিসের, বিশেষ করে ওষুধ, প্রসাধন সামগ্রী, প্যাকেটের চা-বিস্কুট এই জাতীয় মোড়কবদ্ধ দ্রব্যে খুচরা সর্বোচ্চ মূল্য লেখা থাকে, সেই মূল্য আসল দামের থেকে অন্তত বিশ-পঁচিশ ভাগ বেশি।

দোকানদার যখন বলেন, 'এ জিনিসটা আমি আপনাকে কেনা দামে দিচ্ছি', তিনি ডাহা মিথ্যে কথা বলেন। আসল কথা হল, লাভের জন্য মিথ্যে কথা বলা ব্যবসায়ীর কাজ নয়, সেটাই তার ধর্ম।

তবে লাভ সব সময়েই সরাসরি পথে আসে না। প্রতি কিলোগ্রাম ওজন করার সময় একশো গ্রাম শুধু হাতের কারসাজিতে কম দেন অনেক দক্ষ বিক্রেতা। অনেক সময় কারসাজিরও প্রয়োজন পড়ে না, কম ওজনের বাটখারা ব্যবহার করলেই চলে। আর কম ওজনের বাটখারা একটু খোঁজখবর করলেই কিনতে পাওয়া যায়।

তবে অনেক সময় লাভ বেশ ঘোরাপথে হয়।

সেই ঘড়ির দোকানের গল্পটা অনেকেরই হয়ত জানা। সেই ঘড়ির দোকানের সাইন বোর্ডে লেখা ছিল, 'এখানে অবিশ্বাস্য কম দামে ঘড়ি বিক্রয় হয়।' সত্যিই অবিশ্বাস্য কম দাম। বাজারের থেকে শতকরা পঁচিশ-তিরিশ টাকা কম।

দোকানদারের এক ঘনিষ্ঠ বন্ধু একবার তাঁকে প্রশ্ন করেছিলেন, 'এত ক্ষতি করে ঘড়ি বেচে লাভ কি?'

সেই দোকানদার নাকি মুচকি হেসে চাপা গলায় বলেছিলেন, 'ঘড়িটা বেচার সময় কলকব্জা' একটু বিগড়িয়ে দিই। তারপরে ক্ষতিটা ঘড়ি সারিয়ে পুষিয়ে নিই।'

জানি না, এই ঘড়ির দোকানদারের আখ্যান থেকেই 'ঘোড়েল' শব্দটি রচিত হয়েছিল কি না।

ব্যবসা-বাণিজ্য তথা ব্যবসায়ীদের নিয়ে গল্প-কথা ইচ্ছে করলে পাতার পর পাতা লিখে যাওয়া চলে।

কিন্তু হায়! সে সময় কোথায়? আর সেরকম সুরসিক পাঠকই বা কোথায়, যিনি ধৈর্য ধরে এই সব হাবিজাবি গল্প শুনবেন।

পাঠকদের বিরক্তির কারণ না ঘটিয়ে এ যাত্রা একজন চরম ব্যবসায়ীর জীবনের শেষ দিনের আখ্যান বর্ণনা করছি।

আশি বছরের কাছাকাছি বয়েস হয়েছে শ্রীযুক্ত গুরুচরণ দাসের। নিউ মার্কেট পাড়ায় তাঁদের পারিবারিক ব্যবসা জামা-কাপড়ের দোকানের। এই প্রতিযোগিতার বাজারেও এই পুরোনো দোকানটি বেশ ভালো চলে।

দোকানে অবশ্য পাঁচ-সাতজন কর্মচারী বা সেলসম্যান আছে। কিন্তু বৃদ্ধ নিজে বা ছেলেদের কেউ না কেউ দোকানে থাকে, বিক্রি দেখাশোনা করে। আজ বৃদ্ধ মৃত্যুশয্যায়। দুপুর গড়িয়ে বিকেলের দিকে। সকালেই ডাক্তার জবাব দিয়ে গিয়েছেন। দুপুর পর্যন্ত সম্পূর্ণ অবসন্ন অবস্থায় চোখ বুজে বালিশে মাথা দিয়ে পড়েছিলেন। এখন চোখ খুলেছেন। দেখলেন চারপাশে ছেলেরা দাঁড়িয়ে আছে।

অস্ফুট স্বরে বৃদ্ধ ডাকলেন, 'রাম'।

রাম সামনেই দাঁড়িয়ে ছিল। সে হাতজোড় করে বলল, 'এই যে বাবা আমি'।

এইবার বৃদ্ধ ডাকলেন, 'শ্যাম।'

শ্যাম পাশেই দাঁড়িয়েছিল। সে মাথা বাড়িয়ে দিয়ে বলল, 'এই যে আমি।' বৃদ্ধ এবার তৃতীয় ছেলের খোঁজ করলেন, 'যদু'। 'যদুকে দেখছি না'?

যদু খাটের পিছনে দাঁড়িয়েছিল। সে এগিয়ে এসে বলল, 'বাবা এই যে আমি এখানে।'

অতঃপর কনিষ্ঠ পুত্র মধুর খোঁজ করলেন বৃদ্ধ। মধুও সামনেই ছিল সে এগিয়ে এসে বলল, 'এই যে আমি।'

এতক্ষণ বৃদ্ধ ছটফট করছিলেন। এবার তড়াক করে খাট থেকে লাফিয়ে উঠে বললেন, 'বাহাদুর ড্রাইভারকে গাড়ি স্টার্ট দিতে বলো। আমি আসছি।' মুমূর্ষুর এমত আচরণ দেখে ছেলেরা স্তম্ভিত। তারা বাবাকে বলল, 'বাবা, এই অবস্থায় তুমি কোথায় যাবে?'

বৃদ্ধ বললেন, 'তোমরা সবাই এখানে আমার ঘরে দাঁড়িয়ে আছ। দোকান দেখছে কে? আমি দোকানে যাচ্ছি।'

বিজ্ঞাপন ব্যবসার প্রধান অঙ্গ। তবে একবার একটি বইয়ের বিজ্ঞাপন রবিবাসরীয় কাগজে 'পাত্রী চাই' কলামে দেখেছিলাম। এই বিজ্ঞাপনের পরে বইটির বিক্রি একশো গুণ বেড়ে গিয়েছিল।

রচনা শেষ করার আগে বিজ্ঞাপনটি হুবহু পেশ করছি :

পাত্রী চাই

পাত্রের বিশাল ব্যবসা। দিল্লিতে, কলকাতায় বাড়ি। লন্ডনে ফ্ল্যাট।

দিব্যেন্দু মুখোপাধ্যায়ের "উত্তপ্ত কামনা" উপন্যাসের নায়িকার মতো সপ্রতিভ, স্মার্ট পাত্রী চাই।

ব্যবসা-বাণিজ্যর মতো জটিল বিষয় নিয়ে আমার মতো ব্যক্তির এতসব রঙ্গ রসিকতা করা সঙ্গত হল না। তবু এই নিবন্ধ, এই রম্য আলোচনা শেষ করার আগে আয়কর দপ্তরের কাছে পাঠানো এক ব্যবসায়ীর এই চিঠিটি প্রকাশ না করে পারছি না।

এই ব্যবসায়ী ভদ্রলোক একটি ব্যতিক্রমী চরিত্র। তাঁর বিবেক আজো কখনো-কখনো তাঁকে দংশন করে। এই রকম ভাবে দংশিত হয়ে অবশেষে আয়কর অধিকর্তাকে নিম্নলিখিত পত্রটি দিয়েছিলেন,

মাননীয় আয়কর অধিকর্তা, সমীপেষু

মহাশয়,

গত কয়েক বছরে আয়কর রিটার্নে আমি কিছু কিছু আয় গোপন করেছি। বিবেকের দংশনে পীড়িত হয়ে অবশেষে আমি আপনাকে একটি দশ হাজার টাকার চেক পাঠাচ্ছি। দয়া করে গ্রহণ করবেন। ইতি জনৈক ব্যবসায়ী।

পুনশ্চ . এতেও যদি আমার বিবেক দংশন না কমে তবে ভবিষ্যতে সময় এবং সুবিধে মতো আরো কিছু কিছু টাকা পাঠাব। অনুগ্রহপূর্বক যথাসময়ে গ্রহণ করবেন।

পেনসিল, পেন্সিল

আগেরবার লিখেছিলাম জুতা, জুতো নিয়ে। উচ্চারণ পার্থক্যবশত জুতা এবং জুতোর মধ্যে প্রভেদ। পেনসিল, পেন্সিল-এর ক্ষেত্রে উচ্চারণ কিন্তু একরকম। কেউ আপত্তি করলে বলব অন্তত প্রায় একরকম। তবু দু'রকম বানান কেন?

আসলে আধুনিকতার ভূত পেন্সিলের ঘাড়ে চেপেছে। ন এবং স আলাদা হয়ে গেছে। আধুনিক বানানকারেরা বলছেন, বিদেশি শব্দ বাংলা ভাষায় যা আছে সেগুলি যথাসম্ভব যুক্তাক্ষর ভেঙে ফেলতে হবে। এই করে জার্মান—জারমান হয়েছে, বায়োস্কোপ—বায়োস্‌কোপ হয়েছে।

এতদূর বিদ্যে ফলানোর পর হঠাৎ খেয়াল হল এসব কী লিখছি? কাদের জন্য লিখছি? একালের পাঠক-পাঠিকারা চর্মচক্ষে পেন্সিল দেখেছেন তো? এই ডটপেনের যুগে কালি-কলম-দোয়াত-ব্লটিং পেপারের সঙ্গে পেন্সিলও প্রায় উধাও। অফিস-কাছারিতে ব্যবহার নেই বললেই চলে, স্কুল-কলেজেও অতি সামান্য। সেও অঙ্কনের বিশেষ প্রয়োজনে। জ্যামিতি, ভূগোল বা বিজ্ঞান, স্থাপত্যবিদ্যা—এইসব চর্চায় পেন্সিল না হলে চলে না, তাই।

আমাদের বাল্যকালে পেন্সিলের ছিল রমরমা। কত রকম যে পেন্সিল—গোল, চৌকো, তেকোনা, ষড়বাহু। ছোট বড়, সাদা কালো, রঙিন, লাল-নীল পেন্সিলের বৈচিত্র্যের অভাব ছিল না। যেমন দুহাত লম্বা এক ইঞ্চি ব্যাসের বিশাল পেন্সিল দেখেছি তেমনি দেখেছি কড়ে আঙুলের সমান লম্বা, একটা পানের বোঁটার মতো সরু পকেট ডায়েরির ভিতরে গুঁজবার জন্য পেন্সিল।

নরম-অতি নরম, শক্ত, অতি শক্ত শিসওলা পেন্সিল। সেগুলির গায়ে সাংকেতিক চিহ্ন থেকে বুঝে নিতে হত কোন্‌টি কোন্ জাতের। সাংকেতিক চিহ্নগুলি যতদূর মনে পড়ে ছিল এইচ দিয়ে আরম্ভ। এইচ-এর সঙ্গে বি দিয়ে এইচ-বি, তারপর এইচ বি বি, এইরকম সব পরিচয় দেখলেই ক্রেতা বুঝতে পারতেন কী ধরনের পেন্সিল।

পেন্সিল কাটা ছিল একটা আর্ট। সারাদিনে শুধু পেন্সিল কাটাতেই বেশ কয়েকঘণ্টা ব্যয় করত এমন স্থিতধী ছাত্রের অভাব ছিল না।

খাগের কলমের ছিল ডগা। পরে কালি-কলমের এল নিব। পেন্সিলের ক্ষেত্রে কিন্তু নিব নয়। শিস বা সিস। এই শিস নিশ্চয়ই শীর্ষ থেকে আসেনি, মনে হয় পেন্সিলের নিব সিসে দিয়ে তৈরি হয়—এই ধারণা থেকে বাংলায় পেন্সিলের শিস বা সিস কথাটি এসেছে।

পেন্সিলের প্রতাপ দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। প্রথম মহাযুদ্ধের কিছু আগে থেকে, বিশ শতকের

গোড়া থেকেই পেন্সিলের রমরমা। পেন্সিলের সাম্রাজ্য অটুট ছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষ হওয়ার পরেও।

মনে আছে, তখন স্কুলের নিচু ক্লাসে পড়ি; বাজারে পেন্সিলের খুব অভাব দেখা দিল। পেন্সিলের অভাবে লেখাপড়া শিকেয় উঠতে গিয়েছিল; সেইসময় সরকার আরও অনেক জিনিসের সঙ্গে রেশন কার্ডে খাতা-পেন্সিল দিতে লাগল।

পেন্সিলের সূত্রে রবারের কথা বলতে হয়। পেন্সিলের লেখা রবার দিয়ে মুছে ফেলা যেত। আমাদের ওখানে আমরা রবার বলতাম বটে, আসলে ওটাকে বলা হত 'ইরেজার' (Erase থেকে Eraser)।

দাদার খাতায় হাজার রকম কাটাকুটি থাকত। আমাদের একজন ভিনদেশি ভদ্রলোক সকালে বাড়িতে পড়াতে আসতেন। প্রথমদিন দাদার খাতা দেখে কাটাকুটি পরিষ্কার করার জন্য মাস্টারমশাই ইরেজার আনতে বলেছিলেন।

দাদা ইরেজার বুঝতে পারেননি। বাড়ির মধ্যে গিয়ে তারে শুকোতে দেওয়া চারটে ইজের (হাফপ্যান্টের বাঙালি সংস্করণ) নিয়ে চলে এসেছিল।

যাইহোক, লিখিতভাবে আমাদের পেন্সিলের সঙ্গে প্রথম দেখা হয় সুকুমার রায়ের 'হযবরল' কাহিনিতে। সেখানে কাকটা কিছু জবাব দিল না, খালি পেন্সিল মুখে দিয়ে খানিকক্ষণ কী যেন ভাবল। তারপর বলল, 'সাত দুগুণে চোদ্দোর নামে চার, হাতে রইল পেনসিল।'

আমার নিজের একটা বদভ্যাস ছিল আমি পেন্সিল চিবোতাম। কেন জানি না, নিজের অজ্ঞাতসারে আনমনে আমি আজো জামার কলার, হাতের রুমাল—এইসব চিবোই। ছোটোবেলায় চিবোতাম পেন্সিল। তবে পেন্সিলের পিছনে রবার লাগানো থাকলে চিবোতে পারতাম না।

পেন্সিলের একটা খারাপ ব্যবহার ছিল। মাস্টারমশাইরা দু আঙুলের ফাঁকে পেন্সিল দিয়ে শক্ত করে চেপে দিতেন। অসহ্য ব্যথা হত। বেশ কয়েকদিন ব্যথাটা থাকত! অনেকসময় কিছু লেখা যেত না, ধরা যেত না। অল্প কিছুদিন আগে আমার এক বান্ধবীতনয় আমার অন্যমনস্কতার সুযোগে আমার আঙুলের ফাঁকে একটা পেন্সিল ঢুকিয়ে হঠাৎ মুচড়ে দিয়েছিল।

এসব দুঃখ করে লাভ নেই। বরং অন্য একটা গল্প বলি। সে গল্পে পেন্সিল অবশ্য গৌণ।

একটি বাঙালি মেয়ে জন্মাবধি দিল্লিতে বড় হয়েছে। সম্প্রতি তার বাবা কলকাতায় বদলি হয়ে এসেছেন। তিনি মেয়েকে উত্তর কলকাতার বেথুন স্কুলে দিয়েছেন। তাঁর মেয়ে তো ভালো বাংলা বলতে পারে না। একদিন ক্লাসে দিদিমণি কী একটা প্রশ্ন দিয়েছেন। সবাই উত্তর লিখছে, হঠাৎ তিনি দেখলেন নতুন মেয়েটি চুপচাপ বসে আছে। তিনি ওকে লিখতে বলায় ও বলল, 'আমার পেন্সিল না আছে।'

দিদিমণিটি এবার মেয়েটিকে সংশোধন করে বললেন, 'তোমার পেন্সিল না আছে

এটা ঠিক নয়। তোমার পেন্সিল নাই।' বলে দিদিমণি আরও ব্যাখ্যা করে বললেন, 'আমার পেন্সিল নাই, ওর পেন্সিল নাই। তার পেন্সিল নাই। বাবার পেন্সিল নাই। মামাদের পেন্সিল নাই।' বলে দিদিমণি বসতে না বসতে মেয়েটি জিজ্ঞাসা করল, 'আর সকলেরই পেন্সিল কেন না আছে দিদিমণি?'

পেন্সিলের আরেকটা ঘটনা জানি। সেটা গঙ্গারাম আমাকে বলেছিল।

গঙ্গারামের এক মামার একটা কান নেই। একবার কাঠ কিনতে গিয়ে করাত কলে খুব ঘনিষ্ঠভাবে কাঠকাটা দেখতে গিয়ে ধারালো বৈদ্যুতিক করাতে তাঁর একটা কান ছিটকে বহুদূরে কচুঝোপের মধ্যে চলে যায়।

করাতখানার লোকেরা সন্ত্রস্ত হয়ে একদিকে যেমন মামাবাবুর কানে তুলো, টিংচার আয়োডিন এসব দিতে থাকে; অন্যদিকে যে কচুঝোপের মধ্যে কাটা কানটি ছিটকে গিয়ে পড়েছিল সেখান থেকে বহু খুঁজে কর্তিত কানটি উদ্ধার করে। কিন্তু গঙ্গারামের মামা সেই কানটি গ্রহণ করেননি। তাঁর বক্তব্য হল, 'কত কান কাটা লোক এসব জায়গায় ঘুরে বেড়ায়, তাদেরই কারো কান এটা। এরকম নেড়া কান আমার ছিল না, আমার কানে একটা লাল-নীল পেন্সিল গোঁজা ছিল।'

ওয়াইফের নাকে

অনেকদিন পরে আবার এই সেদিন ষষ্ঠিচরণের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। আমাদের পাড়ার মোড়ে, এইমাত্র ষষ্ঠিচরণকে দাঁড়ানো অবস্থায় দেখলাম, এর আগে প্রতিবার বসা অবস্থায় দেখেছিলাম। দেখলাম হাঁটতে হাঁটতে কথা বলতে পারেন না একদম, দাঁড়িয়ে কথাবার্তা চালাতে হয়। তবে দাঁড়িয়ে কথা বলার সময় কাঁধে একেবারে ঝাঁকিটাকি দেন না, ঠোঁটটা অবশ্য কাঁপে। দেখলুম ষষ্ঠিচরণও ব্যাপারটা জানেন, আমাকে প্রশ্ন করলেন, 'আপনি নতুন বাড়ি করেছেন শুনলাম।'

নতুন বাড়ি কথাটা আমার খুব ভালো লাগল না, কিন্তু কথা না বাড়িয়ে বিনীত এবং লজ্জিতভাবে ঘাড় নেড়ে স্বীকার করলাম।

'তা বাড়ি কেমন হল?' ষষ্ঠিচরণের প্রশ্নটা সামান্য এড়িয়ে গিয়ে বললাম, 'অসামান্য'।

আমার উত্তরে ষষ্ঠিচরণ বিশেষ খুশি হলেন বলে মনে হল না। বিশেষ করে তাঁর একটা জিজ্ঞাসায় খুব ঘাবড়ে গেলাম, 'আপনি কি আমার ওয়াইফকে কখনো দেখেছেন?' হঠাৎ বাড়ির প্রসঙ্গ থেকে স্ত্রীর প্রসঙ্গে চলে যাওয়া ষষ্ঠিবাবুর পক্ষে মোটেই অস্বাভাবিক নয়, যে কোনো সূত্রে স্ত্রী স্মরণ করা বরং স্বভাব।

আমি জানলাম, 'না সে সৌভাগ্য হয়নি আমার।' ষষ্ঠিচরণ তখন বললেন, 'তাহলে আর ওয়াইফ দেখলেন কি? জানেন আমার ওয়াইফ কখনো মাছ কুটতে, তরকারি কুটতে হাতের আঙুল-টাঙুল কেটে গেলে কিছুতেই আয়োডিন, ডেটল কিছু লাগান না, স্রেফ একটু পান খাওয়ার চুন লাগিয়ে দেন, সঙ্গে সঙ্গে রক্ত বন্ধ হয়ে যায়, ঘা-টা কিছু হয় না।'

একটু ভেবে ষষ্ঠিচরণ আবার বললেন, 'আচ্ছা, আপনার শ্বশুর বাড়িতে কেউ শিকার-টিকার করতে পারে?'

নিজের স্ত্রীকে বাদ দিয়ে শ্বশুরালয়ে কাউকে ঠিক শিকারি-টিকারি বলে মনে হয়নি, কাজেই লজ্জিতভাবে বললাম, 'কই তেমন তো মনে হল না।'

'এই দেখুন', ষষ্ঠীচরণকে প্রবল উল্লসিত দেখাল, যেন রাজ্য জয় হয়ে গেল এইভাবে বললেন, 'শিকার করা কি সোজা কথা। শিকার করতেন আমার মামাশ্বশুর-মশায়। জয়রামপুর-হিতৈষীতে তাঁর মারা পাগল শেয়ালের ছবি বেরিয়ে ছিল, কলকাতার কাগজেও ছবি পাঠিয়েছিলেন ছাপার জন্যে, কিন্তু, সম্পাদকরা পাগল শেয়ালের ছবি ছাপাতে সাহস পেলে না, বিশেষ করে তখন কলকাতায় যা গরম।'

'আমার বড় মামাশ্বশুর মেডেল পেয়েছিলেন বড়সাহেবের কাছে শিকার করার জন্য। বড়সাহেবের তিব্বতি কুকুর, এই লোম, এই কানের লতি (হাত দিয়ে দেখালেন ষষ্ঠিচরণ) নাম দিয়েছিলেন চুঁয়াচো। সেটা হঠাৎ ক্ষেপে গেল একদিন। বড়সাহেবের নতুন মেম এসে সেদিনই জানলা-দরজার পর্দা পালটিয়েছিল। সে তো আর জানত না কুকুরটা নীল রং দেখলে ক্ষেপে যায়। সব পর্দা নীল রঙের। কুকুরটা ক্ষেপে গিয়ে প্রথমেই একটা পর্দা কামড়ে ছিঁড়ে ফেলল, তারপরে গুড-লাক লেখা একটা পাপোশ। খাঁটি বিলিতি পাপোশ, সেই আমলের অ্যান্ডারসনের দোকানের। বড়সাহেব এই খবর পেয়ে মামাশ্বশুরকে সঙ্গে করে অফিস থেকে ছুটে এলেন। দম নেওয়ার জন্যে একটু থামলেন ষষ্ঠিচরণ, পকেট থেকে প্যাকেট বের করে একটা সিগারেট ধরালেন, তারপর আবার শুরু করলেন, ততক্ষণে চুঁয়াচো একেবারে ক্ষেপে গেছে। একটা ড্রেসিংটেবিলের ওপরে উঠে দেওয়াল ঘড়িটা কামড়ানোর চেষ্টা করছে। বড়সাহেবকে দেখেই লাগাল এক ছুট সোজা বাইরের দিকে।

'বড়সাহেব আমার শ্বশুরমশাইকে বললেন, 'ইসকো মার ডালো গুপালবাবু।' মামাশ্বশুর সঙ্গে সঙ্গে দোনলা বন্দুক নিয়ে বারান্দায় গিয়ে কুকুরটাকে গুলি করলেন। কুকুরটা ছুটছে, থামছে। মামাশ্বশুরও গুলি করছেন। বারো রাউন্ড গুলি করলেন। একটা গুলিও লাগল না।' এইখানে ষষ্ঠিচরণ গর্বিতভাবে আমার দিকে তাকালেন, হাতের সিগারেটটায় বেশ দুটো জোরে টান দিয়ে আবার শুরু করলেন। 'ততক্ষণে বড়সাহেব নীল পর্দাগুলো দেখতে পেয়েছেন; তাড়াতাড়ি পর্দাগুলো খুলে ফেললেন। নীল পর্দা দেখলে তাঁরও ভীষণ মাথা ঘোরে। আর পর্দাগুলো খুলে ফেলামাত্র চুঁয়াচো একেবারে শান্ত হয়ে গেল। লেজ নাড়াতে নাড়াতে বড়সাহেবের কাছে ছুটে এসে পা চাটতে

লাগল। বড়সাহেব তো ভীষণ খুশি। সঙ্গে সঙ্গে দেরাজ খুলে একটা সোনার মোহর বের করে মেডেল করিয়ে পরিয়ে দিলেন মামাশ্বশুরের গলায়। দিয়ে বললেন, 'গুপাল, তুম চুঁয়াচো কা লাইফ সেভ কিয়া, তুম বড় শিকারি আছো।'

ষষ্ঠিচরণ হাঁটা শুরু করলেন, শুধু একবার পিছনে ফিরে আমাকে বললেন, 'আমার ওয়াইফের নাকে দেখবেন, সেই মোহর ভেঙে তার মেজোমামি সাতটা নাকছাবি বানিয়ে ছিল, তারই একটা দিয়েছিল। এখন আমার ওয়াইফের নাকে আছে।'

প্রশিক্ষণ

প্রশিক্ষণ শব্দের অর্থ শিক্ষা বা শিক্ষণ থেকে কতটা আলাদা, সেটা বিবেচনার বিষয়।

একদা কল্লোল যুগের লেখকেরা সে-কালীন প্রাচীনপন্থী বিখ্যাত মাসিক পত্রিকা প্রবাসীকে তাচ্ছিল্য করে বলত, 'প্রকৃষ্টরূপে বাসি'। সেই কায়দায় প্রশিক্ষণকে হয়তো বলা হয় 'প্রকৃষ্টরূপে শিক্ষণ'। তবে প্রশিক্ষণ কথাটায় জোর বেশি। গাম্ভীর্য আছে।

সেলাই দিদিমণি এখনো সীবন-প্রশিক্ষিকা হয়ে ওঠেননি, একথা যাঁরা ভাবেন তাঁরা যে-কোনো উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়, যেখানে বাংলায় লেখাপড়া হয়, সেখানে দেখবেন ক্রীড়া-প্রশিক্ষকের পাশাপাশি সীবন-প্রশিক্ষিকা রয়েছেন। একালের শিক্ষণ-ব্যবস্থায় কবি জয় গোস্বামীর সেলাই দিদিমণি কবে নিঃশব্দে অন্তর্হিতা হয়েছেন।

শিক্ষা যেখানে শেষ হয় সেখানেই প্রশিক্ষণ শুরু। তবে সে-প্রশিক্ষণ কতটা কার্যকর হয়, সেটা বলা কঠিন। বিশেষ করে প্রশিক্ষকদের সম্পর্কে বাজারে যেসব গল্প আছে সেগুলো মোটেই রম্য নয়।

একটা গল্প লিখেছিলেন শিবরাম চক্রবর্তী। মূল গল্পটা বোধহয় স্টেফান লিককের রচনায় ছিল, অবশ্য মার্ক টোয়েনও হতে পারে, অথবা জেমস থার্বার। হাজার হাজার পৃষ্ঠা হাসির রচনা লিখে এবং পড়ে এখন আমি সব গুলিয়ে ফেলেছি। এইতো সেদিন এক সাহিত্যবাসরে গিয়েছিলাম। তখন একটা ছোটগল্প পড়া হচ্ছে। গল্পটা চেনা। পড়া শেষ হতে আমি বললাম, 'মনে হচ্ছে, অনেকদিন আগে কোথায় যেন আমি এরকম একটা গল্প পড়েছিলাম।'

সবাই সমস্বরে হা-হা করে উঠল, 'সে কী মশাই। এ তো আপনারই লেখা গল্প পড়া হচ্ছিল।'

সে যা হোক, শিবরাম চক্রবর্তীর গল্পটা বলি।

সাঁতার প্রশিক্ষণকেন্দ্রে সাঁতারের প্রশিক্ষক নবীন সাঁতারুদের সাঁতার শেখাচ্ছিলেন। জলাশয়ের পাড়ে দাঁড়িয়ে তিনি একের পর এক নির্দেশ দিয়ে যাচ্ছিলেন, 'আর একটু

কাত হয়ে', 'আর একটু গলা উঁচু করে', 'পিঠ নামিয়ে, আরেকটু পিঠ নামিয়ে', 'পা আরও জোরে চলবে'—ইত্যাদি ইত্যাদি।

নির্দেশ দিতে দিতে তিনি উত্তেজিত হয়ে পড়েছিলেন, 'এবার চট করে বাঁ-দিকে কাত হয়ে ঘুরে যেতে হবে'—এরকম কিছু বলতে গিয়ে সাঁতার-শিক্ষক জলে পড়ে গেলেন। শুধু জলে পড়ে গেলেন তা-ই নয়, জলে পড়ে হাবুডুবু খেতে লাগলেন। সাঁতার জানা তো দূরস্থান, তিনি জলে কোনোদিন নামেনইনি। মিথ্যে যোগ্যতা দেখিয়ে প্রশিক্ষক হয়েছেন। ছাত্রেরা তাঁকে জল থেকে না তুললে সেদিন তাঁর মৃত্যু ছিল অনিবার্য। তাঁর পেট টিপে এক কলসি জল বের করার পর অদমিত সেই ভদ্রলোক বললেন, 'শুধু শুধু তোমরা আমাকে জল থেকে তুললে। একটা নতুন ট্রিক দেখাতে যাচ্ছিলাম, সবাই মিলে এমন টানাটানি করলে।' সম্প্রতি ইন্টারনেটে অনুরূপ একটা সত্য ঘটনার কথা জানা গেছে। গল্পটি জার্মান দেশের।

রাজপথে এক ব্যক্তি গাড়ি চালাতে গিয়ে বেসামালভাবে ধাক্কা মারে। যথারীতি পুলিশ আসে। এসে তাঁর ড্রাইভিং লাইসেন্স দেখতে চায়। দেখা যায়, ভদ্রলোকের কোনো ড্রাইভিং লাইসেন্স নেই।

'আপনি কী করেন'? এ প্রশ্ন পুলিশ করায় ভদ্রলোক বলেন, 'আমি ড্রাইভিং প্রশিক্ষক অর্থাৎ লোকদের ড্রাইভিং শেখাই।'

তখন খোঁজ নিয়ে জানা যায়, চার দশক আগে ভদ্রলোক একবার গাড়ি চালানোর লাইসেন্সের জন্যে ড্রাইভিং পরীক্ষায় ফেল করেন। সেই সময় থেকে তিনি আর অন্য কিছু করেননি, ভালো করে ড্রাইভিং শিখতে গিয়ে নিজেই প্রশিক্ষক হয়ে যান।

"এত কবি কেন?"

কবিতার প্রসঙ্গ যখন উঠেইছে এবং দু'এক সপ্তাহ আগে আমার একটি রসনিবন্ধ এই কলামে পাঠ করে আমার কবিত্ব সম্পর্কে সংশয়শীল দু-দশজন যারা ভ্রূ কুঁচকেছেন, এ সপ্তাহের এই পাণ্ডিত্যপূর্ণ রচনা তাঁদের জন্য নয়। দয়া করে এই পর্যন্ত চোখ বুলিয়েই থেমে যাবেন, কারণ এর পরে আমি কবিতা সম্পর্কে জটিল আলোচনায় প্রবেশ করছি। অবশ্য যথাসাধ্য গল্পের মাধ্যমে এগোব।

একদা এক কবি তাঁর জাত নির্ণয় করেছিলেন এ ভাবে, যে, শব্দের সঙ্গে শব্দের বিয়ে যে দেয়, সেই হল কবি। তাঁর বক্তব্য অনুযায়ী শব্দের ঘটকালি করাই কবির কাজ।

কাজটা খুব সোজা নয়। অনেকে সেটা বোঝেন না। ফলে অনেক অযোগ্য ব্যক্তি

কিছুটা প্রচার ও খ্যাতির লোভে 'কবি' হয়ে যান। খারাপ শব্দের সঙ্গে আরও খারাপ শব্দের বিয়ে হয়। হাজার হাজার বাজে কবিতার জন্ম হয়।

এই তো সেদিনই শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের কথা বলেছি। তিনি বলেছিলেন, "এত কবি কেন?" তারও অনেকদিন আগে জীবনানন্দ দাশের সেই বিখ্যাত মন্তব্য, "সকলেই কবি নয়, কেউ কেউ কবি।"

কবিতার ব্যাপারে এই সেদিন পর্যন্ত প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন রাজা-রাজড়ারা। রাজদরবারে কবিদের সমাদর ছিল। এরকম একটি রাজকাহিনি এবার কবিতা আলোচনায় আমাদের অবলম্বন।

এক কাব্যরসিক নৃপতি রাজদরবারে বসে কবিতা শুনতেন। ভালো কবিতা শুনে সঙ্গে সঙ্গে নগদ অর্থে কবিকে পুরস্কৃত করতেন। একদিন এক পণ্ডিত কবিসভায় এসে উপস্থিত হলেন। তিনি কেন এসেছেন, জানতে চাওয়ায় পণ্ডিত বললেন, "আমি একটি ভালো কবিতা লিখে এনেছি।"

রাজা কবিকে বিশ্রাম ও জলযোগ করতে বললেন। তারপর কবিকে তাঁর সামনের আসনের উপর বসিয়ে রাজা কবিকে বললেন, "এবার শুনি আপনার কবিতা।"

ব্রাহ্মণ তাঁর ঝুলি থেকে একটি তালপাতা বার করলেন। তাতে একটি মাত্র পঙ্ক্তি লেখা আছে, 'দুগ্ধং পিবতি বিড়ালঃ।"

রাজা ব্যাপারটা বুঝে উঠতে পারলেন না। বললেন, "আপনার কবিতা পড়ুন।"

"এই তো আমার কবিতা।" বলে পণ্ডিত সেই তালপাতা থেকে পাঠ করলেন, "দুগ্ধং পিবতি বিড়ালঃ।"

রাজা অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, "এর পর?"

পণ্ডিত বললেন, "এর পর আর নেই।"

রাজার কৌতূহল বাড়ল। ভাবলেন লোকটা পাগল নাকি। বেড়ালে দুধ খাচ্ছে, এটা কোনো কবিতা হতে পারে? মুখেও সেই প্রশ্নই করলেন, তবে একটু কায়দা করে বললেন, "এটা যদি কবিতা, শাস্ত্রে বিহিত চারচরণ এর মধ্যে নেই কেন?"

পণ্ডিত করজোড়ে বললেন, "কেন থাকবে না মহারাজা? ওই বিড়াল, ওর তো চার চরণ আছে।"

সভাসদেরা হাসতে লাগলেন, কিন্তু রাজা এখনও নিরুদ্যম হলেন না, তিনি পণ্ডিতকে বললেন, "পণ্ডিত আপনি তো জানেন যে কবিতায় রস থাকে, আপনার এই কবিতায় রস কোথায়?"

পণ্ডিত বললেন, "ওই যে দুধ রয়েছে। বিড়াল দুধ খাচ্ছে। ওই দুধের মধ্যেই তো রস রয়েছে। এর চেয়ে বেশি রস আর কোথায় আছে?"

হতবাক রাজা পণ্ডিতকে শেষ প্রশ্ন করলেন, "কিন্তু পণ্ডিতমশায়; কবিতার তো একটা অর্থ থাকে। আপনার কবিতার অর্থ কোথায়?"

এইবার পণ্ডিতমশাই উঠে দাঁড়িয়ে করজোড়ে রাজাকে বললেন, "আমি দরিদ্র

পণ্ডিত, আমি অর্থ পাব কোথায়? আপনার কাছে অর্থের জন্য এসেছি। আপনি অর্থ দিন।"

রাজা পণ্ডিতের কাব্যপ্রতিভায় যতটা না হোক, রসবোধে খুব খুশি হয়েছিলেন এবং পণ্ডিতকে যথাসাধ্য উপঢৌকন ও অর্থাদি দিয়ে বিদায় করেছিলেন।

কবি অথবা না-কবি

একদিন আমি কবি ছিলাম। কবে যে আমি কী করে কবি হয়ে গিয়েছিলাম সে রহস্য এখনো বুঝতে পারিনি।

এ দেশে কেউ দু'চার লাইন কবিতা বা পদ্য লিখলেই তাকে কেউ কেউ কবি বলে সম্বোধন করে। আমার বন্ধু শক্তি চট্টোপাধ্যায় অবশ্য কবি বা কবিতা এই দুই এরই বিরোধী ছিলেন। তিনিই তো প্রশ্ন করেছিলেন, 'এত কবি কেন'? আমার কবিতা নিয়েও তাঁর মনোভাব প্রসন্ন ছিল না। কবিতা মাত্রকে, এমনকী তাঁর নিজের কবিতাকেও তিনি বলতেন 'পদ্য'।

তখন আমি কবিতা লেখালিখি পুরোদমে শুরু করেছি। কবিতার ব্যাকরণ বুঝি না। ছন্দের জ্ঞান নেই। বানান-টানানও আমার ঠিক নয়। কিন্তু কবিতা লিখে যাচ্ছি। যেখানে যে কাগজের ঠিকানা পাই, ধর্মীয় পত্রিকা থেকে যৌন পত্রিকা, হাসির কাগজে, রাজনীতির কাগজ, জনপ্রিয় সাহিত্য পত্রিকা তো বটেই, সর্বত্র গাদা গাদা কবিতা পাঠাই। প্রায় সবই ফেরত আসে কিংবা ছাপা হয় না। কখনও কখনও দু একটি কাটাকুটি করে ছাপা হয়। কিন্তু আমি তখন অদম্য, অকুতোভয়।

মাসের প্রথমে দেড় টাকার ডাকে খাম কিনে আনি। দেড় টাকায় ষোলোটা। একটা পুরোনো ছ'পয়সা বা দেড় আনা করে, এখন যার দাম পাঁচটাকা। এইভাবে কবি হওয়ার অসম্ভব চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিলাম।

হঠাৎ এই সময় একটি বড় পত্রিকার সম্পাদকীয় দফতর থেকে একটি চিঠি এল। পুজোয় একটি কবিতা চাই। ঠিকানায় লেখা আছে 'কবি তারাপদ রায়'। নামের আগে কবি শব্দটি দেখে শরীরটা কেমন রিমঝিম করে উঠল। আমার নামের আগে কবি যুক্ত হবে এ আমি কোনোদিন ভাবিনি।

চিঠির খামটা আমার হাত থেকে মাটিতে পড়ে গেল। উত্তেজনায় আমি থম মেরে গেলাম। আমার এই সম্মান প্রাপ্তির কথা, যেটা আমার কাছে পদ্মশ্রী, অনারারি ডি.লিট এমনকী বিলিতি 'সার' উপাধিও চেয়েও মহার্ঘ। কাউকে জানাতে পারলাম না।

এর পর আমার নামে চিঠিপত্র এলে খেয়াল রাখতাম কবি তারাপদ রায় ঠিকানায়

লেখা হয়েছে কি না। আজকাল আর এই বিষয়ে কোনো উৎসাহ নেই। তবু দেখতে পাই বহু চিঠির সম্বোধনে কবি তারাপদ রায় লেখা আছে। তবে আমার এই কবি-জীবনে গ্লানিও কিছু কম নয়। দু-একটা ঘটনার কথা আগে বলেছি, তারই একটি আর একবার বলা চলে।

তখন কলকাতায় কবি সম্মেলনের রমরমা। হঠাৎ করে কবি সম্মেলন খুব জনপ্রিয় হয়ে গিয়েছিল। একদিকে সেনেট হলে নীহাররঞ্জন, সুধীন্দ্রনাথের যুগ্ম উদ্যোগে রথী-মহারথীদের কবিতা পাঠ, অন্যদিকে অরুণকুমার সরকার, গৌরকিশোর ঘোষ এঁদের রাস্তায় রাস্তায় মিছিল ও স্লোগান, 'আরো কবিতা পড়ুন'।

সেই সময় স্কুলে, কলেজে, পাড়ায় পাড়ায়, সঙ্ঘ সমিতিতে কবিতা পড়ার হুল্লোড় পড়ে গিয়েছে। আবার দু'চারটে বাছাই কবি সম্মেলনও হচ্ছে।

একদিন খবর পেয়েছিলাম, কলেজ স্কোয়ারে একটা বই-এর দোকানে দুপুরবেলায় কবি বাছাই হবে। শুনেছিলাম, আমার নামও থাকতে পারে।

কৌতূহলভরে সেখানে গিয়ে দেখলাম সত্যিই কবি বাছাই চলছে। সে এক এলাহি ব্যাপার। কয়েকশো কবির নামের তালিকা নিয়ে এক ঘুমন্ত ভদ্রলোকের পাশে জনৈক তরুণ কবি বসে রয়েছেন। আর ভদ্রলোকের বাঁ পাশে রয়েছেন আর একজন তরুণ কবি। সাদা কাগজ ও কলম নিয়ে।

ডানপাশের কবি একটা একটা করে নাম পড়ে যাচ্ছেন, আর সেটা শুনে ঘুমের মধ্যেই প্রবীণ ভদ্রলোক মনে মনে কী একটা বিচার করে ঘোষণা করছেন 'কবি, অথবা, না ও কবি না'।

যদি 'কবি না' বলছেন তবে বাঁ পাশের কোনো কাজ নেই। কিন্তু কবি বললে বাঁ পাশের যুবকটি নামটি লিখে নিচ্ছেন।

আমি অভিভূত হয়ে ঘণ্টাখানেক দাঁড়িয়ে থাকার পর আমারও নাম এল। ঘুমন্ত বিচারক বিন্দুমাত্র কালক্ষেপ না করে ঘোষণা করলেন, 'ও কবি না।'

এবার সাগরে

রসসাগর বিদ্যাসাগরে প্রবেশ করতে যাচ্ছি। প্রথমে সেই বিখ্যাত আখ্যানটি। এই গল্পটি একদা প্রায় সকলেই জানতেন। বোধহয় অনেকদিন আগে একবার প্রবেশিকা পরীক্ষায় কোনো এক প্রশ্ন ছিল। ছিন্ন বস্ত্র, কৃশকায় এক ব্রাহ্মণ বিদ্যাসাগরের কৃপাপ্রার্থী হয়েছিলেন। সেই হতশ্রী ব্যক্তিটি বিদ্যাসাগরকে বলেছিলেন, "আপনি গরিবের মা-বাপ। আমি এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ। আমার বড়ই দুরাবস্থা।"

'দুরাবস্থা' শব্দটি কিন্তু ব্যাকরণগতভাবে ভুল, দুঃ+অবস্থা=দুরবস্থা। পরিস্কার বিসর্গ সন্ধি। এখানে কোনো আকার নেই। ব্রাহ্মণের 'দুরাবস্থা'র কথা শুনে ব্যাকরণবিদ, সুরসিক পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বলেছিলেন, "সে আপনার আকার দেখেই বুঝেছি।"

যাবতীয় সুরসিক ব্যক্তির মতো বিদ্যাসাগর ভোজনরসিক ছিলেন। শুধু ভোজন-রসিক নয়, তিনি রন্ধনরসিকও ছিলেন। শৌরীন্দ্রকুমার ঘোষের 'সাহিত্যিক কৌতুকী' গ্রন্থে রয়েছে বিদ্যাসাগরের স্বহস্ত রন্ধনে আতিথেয়তার কাহিনি।

একদিন বিদ্যাসাগরের বাড়িতে বন্ধুদের ভোজনের ব্যবস্থা ছিল। বিদ্যাসাগর স্বহস্তে রেঁধেছিলেন। খাদ্য তালিকায় ছিল ভাত, মাংস ও আমাদা দিয়ে পাঁঠার মেটুলির অম্বল।

বিদ্যাসাগর নিজে পরিবেশন করছেন। বঙ্কিমচন্দ্র খেতে খেতে বললেন, "এমন সুস্বাদু অম্বল কখনো খাইনি।"

সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বললেন, "হবে না কেন? রান্না কার জানো তো, বিদ্যাসাগরের।"

বিদ্যাসাগর শুধু নিজের হাতে রান্না করে খাওয়াতে ভালোবাসতেন তা নয়, পরিবেশন করাতেও তাঁর প্রবল উৎসাহ ছিল।

পরিবেশন করার সময় বলতেন,

"হুঁ হুঁ দেয়ং হাঁ হাঁ দেয়ং দেয়ঞ্চ করকম্পনে।

শিরসি চালনে দেয়ং ন দেয়ং ব্যাঘ্রঝম্পনে।।"

অর্থাৎ হুঁ হুঁ করলে দেবে, হাঁ হাঁ করলে দেবে, হাত নাড়লে দেবে, মাথা নাড়লে দেবে, কিন্তু বাঘের ঝাঁপের মতো হাত পাতায় রাখলে দেবে না।

একদিন রামকৃষ্ণদেব বিদ্যাসাগরের কাছে এসেছেন। এসে বললেন, "খাল বিল পার হয়ে এবার সাগরে এসে পড়লুম।"

রামকৃষ্ণকে বসিয়ে প্রত্যুত্তরে বিদ্যাসাগর বললেন, "এসে পড়েছেন, আর তো উপায় নেই, দু-এক ঘটি নোনা জল তুলে নিয়ে যান। এই সাগরে নোনাজল ছাড়া তো আর কিছুই পাবেন না।" পরমহংস বললেন, "সাগর তো কেবল লবণ নয়, ক্ষীর সমুদ্র, দধি সমুদ্র, মধু সমুদ্র প্রভৃতি আরো অনেক সমুদ্র আছে! আপনি তো অবিদ্যার সাগর নন, বিদ্যার সাগর, আপনাতেই রত্নলাভ হয়ে থাকে, যখন এসেছি তখন রত্ন নিয়ে যাব। লোনাজল কেন নিয়ে যাব?"

আর্শিতে মুখ

রসিকতার ভাঁড়ারে একটু টান পড়েছে। এদিকে আমার জোগানদার গঙ্গারামও বেপাত্তা।

উপায়ান্তর না দেখে কয়েকদিন আগে আধুনিক বাঙালির মহাগুরু পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের শরণাপন্ন হয়েছিলাম। কেউ অবশ্যই ভাবতে পারেন, কী দুঃসাহস! রস ও রসিকতার জন্য বিদ্যাসাগর! কিন্তু অতঃপর-এর পাঠক-পাঠিকারা জানেন বিদ্যাসাগর আমাকে ডোবাননি।

সেই অভিজ্ঞতা নির্ভর করে এবার দত্তকুলোদ্ভব কবি শ্রীমধুসূদনের কথায় আসছি।

মধুসূদন শুধু মেঘনাদবধ কাব্যের কবি ছিলেন না। অমিত্রাক্ষর ছন্দ কিংবা কৃষ্ণকুমারী নাটক নয়, তিনি 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ', 'একেই কি বলে সভ্যতা' এরকম প্রহসনেরও রচনাকার।

যা-ই হোক, অতিরিক্ত ভনিতা না করে মধুসূদনের দুই একটি কৌতুকসম স্মৃতির কথা বলি। তার আগে একটি ঋণ স্বীকার করতে হয়। এই কৌতুক কাহিনির অনেক-গুলির জন্য আমাকে নির্ভর করতে হয়েছে শৌরীন্দ্রকুমার ঘোষের 'সাহিত্যিক কৌতুকী' নামে একটি পুরোনো বইয়ের উপর।

এবার মধুসূদনে ফিরে আসি—অফিসের কাজের ছুটির পর মধুসূদন প্রায়ই পাইকপাড়া রাজবাড়িতে যেতেন। একদিন অপরাহ্নে কিছু লিখতে লিখতে রাজা ঈশ্বরচন্দ্রকে উদ্দেশ্য করে মধুসূদন বললেন—"আমার সন্ধ্যা-আহ্নিকের সময় হল, আমার সন্ধ্যা-আহ্নিকের ব্যবস্থা করুন।"

রাজা ভাবলেন—এ আবার কী? খ্রিস্টানের আবার সন্ধ্যা-আহ্নিক কী? জিজ্ঞাসা করলেন—"ব্যাপার কী?"

মাইকেল হাসিমুখে বললেন—"গেলাসরূপ কোষায় দু-আউন্স পেগরূপ গঙ্গা-জলে আচমন কার্য সমাধানে আহ্নিককৃত্য অনুষ্ঠান করতে হবে।"

রাজা ঈশ্বরচন্দ্র মধুর হাস্যে মধুসূদনের অপরূপ সন্ধ্যা আহ্নিকের ব্যবস্থা করলেন।

মাইকেল মধুসূদন নিজেকে খুব ভালো জানতেন। তাঁকে একবার ঢাকা যেতে হয়েছিল। সেখানকার জনাকয়েক যুবক সভা করে অভিনন্দন দেন। তখন একজন বক্তৃতাকালীন বলেন, "আপনার বিদ্যা-বুদ্ধি ক্ষমতা ইত্যাদি দ্বারা আমরা যেমন· মহাগৌরবান্বিত হই, তেমনি আপনি ইংরাজ হইয়া গিয়াছেন শুনিয়া আমরা ভারী দুঃখিত হই, কিন্তু আপনার সঙ্গে আলাপ ব্যবহার করিয়া আমাদের সে ভ্রম গেল।"

মাইকেল উত্তর বলেন—"আমার সম্বন্ধে আপনাদের আর যে কোনো ভ্রমই হউক,

আমি সাহেব হইয়াছি এ ভ্রমটি হওয়া ভারী অন্যায়। আমার সাহেব হইবার পথ বিধাতা রোধ করিয়া রাখিয়াছেন। আমি আমার বসিবার ও শয়ন করিবার ঘরে এক-একখানি আর্শি রাখিয়া দিয়াছি। এবং আমার মনে সাহেব হইবার ইচ্ছা যখন বলবৎ হয় অমনি আর্শিতে মুখ দেখি। আরও, আমি শুদ্ধ বাঙ্গালি নহি, আমি বাঙ্গাল আমার বাটি যশোহর।"

মধুসূদনের সম্পর্কে এই কাহিনিটি এইসূত্রে স্মরণীয় :

মাদ্রাজের এক হিমস্নিগ্ধ জলে স্নান করে মধুসূদনের মধুময় কণ্ঠস্বর চিরদিনের জন্য ভগ্ন ও বিকৃত হয়ে যায়। মাইকেল দেখতে কালো, তদুপরি হল গলাটা ভাঙা। কোনো এক সুদর্শন লোক মাইকেলের চেহারা আর গলার আওয়াজ নিয়ে কটাক্ষ করে। তাই শুনে মাইকেল হেসে বলেন—

"তবুও আমি গলা ভাঙা কোকিল।
সাদা হাঁসের মতো করি না ত প্যাঁক প্যাঁক প্যাঁক।"

"আমার লেজ কী হল"

জীবজন্তু, সাপ-মাছ সকলের লেজ আছে। আরশোলা, কচ্ছপ ব্যাঙ ইত্যাদি গোলমেলে প্রজাতির জীবের মতো মানুষেরও লেজ নেই। অথচ মানুষের ঘনিষ্ঠ প্রজাতি বানর, হনুমান, ওরাংওটাং এদের ভালোই লেজ আছে।

মানুষের যে লেজ সবসময় থাকে না তা নয়। একটি বালককে তার পিতৃদেব চিত্রাঙ্কনে প্রচণ্ড উৎসাহ দিতেন। বলা বাহুল্য, সেই উৎসাহ আস্কারার পর্যায়ে চলে গিয়েছিল।

একদিন ছেলে বসে বসে না-জন্তু না-মানুষ একটি জীবের ছবি আঁকছিল। বালকের পিতা জনৈক সমঝদার বন্ধুকে নিয়ে ছেলের ছবি আঁকা দেখাতে এলেন। ছেলের আঁকা অদ্ভুত জীবটি চমৎকৃত হয়ে দেখতে দেখতে ভদ্রলোক বন্ধুকে বললেন, "দ্যাখো, কেমন সুন্দর বানরের ছবি আঁকছে।"

সঙ্গে সঙ্গে ছেলেটির সপ্রতিভ উত্তর পাওয়া গেল, "না বাবা, এটা বানরের ছবি নয়, এটা তোমার ছবি।"

এই কথা শুনে কান লাল হয়ে গেল বাবার। তার পর বন্ধুকে নিয়ে তিনি তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। বেশ কিছুক্ষণ পরে বন্ধুকে বিদায় করে রাগে গজগজ করতে করতে পিতৃদেব পুত্রের অঙ্কনশালায় প্রবেশ করলেন। এসেই প্রগলভ পুত্রের কাছে জবাবদিহি চাইলেন, "তুমি কী করে বললে যে এটা আমার ছবি?"

ছেলেটি অঙ্কিত ছবির মুখাবয়ব ভালোভাবে নিরীক্ষণ করে ছবিটিতে আঁকা জীবটির লেজ আরও মোটা করতে করতে বলল, "বাবা, এই ছবিটা সম্পূর্ণ তোমার মতো দেখতে হয়েছে।"

রাগে পিতৃদেব কোনোরকমে নিজেকে সামলে নিয়ে বললেন, 'আমার ছবিই যদি হবে তবে ল্যাজ এল কোত্থেকে?"

ছেলেটি চট করে তুলি জল দিয়ে লেজটা মুছতে মুছতে বাবাকে বলল, "ঠিক আছে, এত মোটা লেজ দিলাম তোমাকে, তাও তোমার পছন্দ হল না। মুছে দিচ্ছি।"

লেজ কারই বা পছন্দ, তবে বাংলা উচ্চারণে ইংরেজি এই নামে সম্প্রতি একরকম বত্রিশভাজা বেরিয়েছে। সে-আলোচনা এখানে হচ্ছে না। আমরা বরং লেজ প্রসঙ্গে কাজি নজরুল ইসলামকে একবার স্মরণ করি।

অসামান্য একটি উক্তি করেছিলেন নজরুল। এক নজরুল বিরোধী নজরুলের রসবোধ সহ্য করতে না পেরে সে বিষয়ে কয়েকটা মোটা দাগের মন্তব্য করেছিলেন।

সেই সমালোচক যে বেরসিক এটা জানতে নজরুল লেজের কথা বলেছিলেন, "তোমার যদি লেজ থাকে, তবে তুমি লেজ বার করে দেখতে পারো। লেজ না থাকলে তুমি কী করে লেজ বার করে দেখাবে?"

হিমানীশ গোস্বামী একবার একটা লেজের গল্প লিখেছিলেন।

এক ভদ্রলোক কাটা মাছের দোকানে একটা ভালো দেখে লেজ (যাকে বাজারে 'ল্যাজা' বলে) বেছে রেখে অন্যান্য বাজার করতে গিয়েছিলেন।

বাজার সেরে ফিরে এসে দেখেন লেজটি নেই। ছোটোবড় বেশ কয়েকটা লেজ ও মুড়ো পড়ে রয়েছে, কিন্তু অনেক কষ্টে পরিশ্রম করে তিনি যে লেজের খণ্ডটি বেছেছিলেন, দোকানদার ভুল করে সেটি অন্য কাউকে বেচে দিয়েছেন।

ভদ্রলোক ক্ষেপে গিয়ে চ্যাঁচাতে লাগলেন, "আমার লেজ কী হল?" বাজার সুদ্ধ লোক প্রশ্ন শুনে তার পিছন দিকে তাকাতে লাগল।

বলা বাহুল্য, রসিক চূড়ামণি হিমানীশ গোস্বামীর পক্ষেই এরকম লেখা সম্ভব।

রসসাগর

চিরকালই মাস্টারমশায়রা একটু কবি স্বভাবের হন। একটু-আধটু কবিতা লেখেন।

ঈশ্বরচন্দ্রের এক সহকর্মী পণ্ডিতমশায়, তিনিও কবিতা লিখতেন। একগুচ্ছ কবিতা লিখে কবি-পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্রকে দেখতে দিয়েছিলেন। কবিতাগুলি পাঠ করার পরে ঈশ্বরচন্দ্র মুখে কিছু না বলে লিখিত মন্তব্য করেছিলেন কবিতাতেই :

জেনো জেনো এ জগতে
সকলেই গোরু।
যে যারে ঠকাতে পারে
সেই তার গুরু॥

এই সুভাষিত বচনের অর্থ একটু ধোঁয়াটে। একটু হেঁয়ালির ব্যাপার আছে এবং পণ্ডিত কবি এটা পড়ে সুখী হয়েছিলেন না কি দুঃখিত হয়েছিলেন সে-খবর জানা নেই।

এই সুভাষিতে বলা হয়েছে, "যে যাকে ঠকাতে পারে, সেই তার গুরু।" সামাজিক ও ব্যক্তিগত সম্পর্ক নিয়ে এ-জাতীয় সরস মন্তব্য ঈশ্বরচন্দ্র অনেক করেছেন। এখনও সেগুলি লোকের মুখে মুখে ফেরে।

এক ভদ্রলোক বিদ্যাসাগরের নামে বেশ কিছু নিন্দেমন্দ করেছিলেন, সে কথা বিদ্যাসাগরের কানে উঠতে বিদ্যাসাগর বলেছিলেন, "ওঁর তো আমি কখনো কোনো উপকার করিনি, উনি শুধু শুধু আমার কেন নিন্দে করতে যাবেন।"

এই জাতীয় আর একটি কথা, সেটিও শত্রু-বন্ধু জড়িত, যতদূর জানি সে-ও বিদ্যাসাগরের উক্তি। কোনো এক ব্যক্তি, সামাজিকভাবে বিপর্যস্ত, আক্ষেপ করেছিলেন, "আমার এত বন্ধু, আমার তো কোনো শত্রু নেই, আমার এ রকম অবস্থা হল কেন?"

এই প্রশ্নের বিদ্যাসাগরীয় উত্তর, "আপনার যা সব বন্ধু আছে, আপনার আর শত্রুর দরকার কী?"

(মনে পড়ছে সাতের দশকে ইমার্জেন্সির সময় সাংবাদিক গৌরকিশোর ঘোষ গ্রেফতারের প্রাক্কালে এই কথা বলেছিলেন)।

পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (শর্মা, দেবশর্মা, দেবশর্মন) তাঁর সমকালে বিখ্যাত ছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর নামে। পরবর্তীকালে মধুসূদনই সম্ভবত তাঁকে প্রথম দয়ার সাগর বলেন, এ কথা মেনে নিয়ে যে 'বিদ্যার সাগর তুমি বিদিত ভুবনে'। বিদ্যাসাগরের বিখ্যাত জীবনীগ্রন্থ 'করুণা সাগর বিদ্যাসাগর' চল্লিশ বছর আগে ইন্দ্রমিত্র ছদ্মনামে কবি অরবিন্দ গুহ লিখেছিলেন।

বিদ্যাসাগরের জীবনী সন্তর্পণে পাঠ করলে এবং তাঁর প্রসঙ্গে বিবিধ স্মৃতিকথা ও আলোচনা দেখলে একটি নাতিবৃহৎ গন্থ্ বচনা করা যেতে পারে 'ঈশ্বরচন্দ্র রসসাগর' কিংবা 'বিদ্যাসাগর রসসাগর'।

বিদ্যাসাগরের রসিকতার মাত্র দু'টি উদাহরণ আপাতত দেখা যেতে পারে।

বিদ্যাসাগর মশায়ের পিতৃদেব ঠাকুরদাস তাঁর ছোটো পুত্র ঈশানচন্দ্রকে এবং বড় নাতি, ঈশ্বরচন্দ্রের পুত্র নারায়ণকে অত্যধিক স্নেহ করতেন।

একটু বেশি স্নেহ সেই সঙ্গে কোনো রকম শাসন নয়, ছেলে দু'টি ধীরে ধীরে বখে যাচ্ছিল। বাড়ির কেউ তাদের শাসন করার সাহস পেত না। কলকাতায় ঈশ্বরচন্দ্রের কাছে এই খবর পৌছোল।

ঈশ্বরচন্দ্র বাধ্য হয়ে গ্রামে এলেন। গ্রামে এসে বাবার কাছে গিয়ে বললেন, "বাবা,

আপনি না নিরামিষাশী। আপনাকে কে নিরামিষাশী বলে? আপনি দু'বেলা ঈশান ও নারায়ণের মাথা খাচ্ছেন, তবুও আপনি নিরামিষাশী?" জানি না, ঠাকুরদাস এর পরে নিজেকে সংশোধন করে, বালকদ্বয়ের কত শাসনের ব্যবস্থা করেছিলেন।

দ্বিতীয় কাহিনিটি মারাত্মক।

রামতনু লাহিড়ী ব্রাহ্ম হয়ে কাশীতে গিয়ে পইতে ফেলে আসেন। বাপের সঙ্গে তর্ক করে আলাদা বাড়িতে গিয়ে বাস করতে থাকেন।

একদিন রামতনু বিদ্যাসাগরকে বললেন, "আমাকে একটা রাঁধুনি বামুন জোগাড় করে দিতে পারো?"

বিদ্যাসাগর বললেন, "কেন হে? তোমার আবার বামুনের দরকার কী? বাবুর্চি-খানসামা হলেও তো চলবে।"

রামতনু বললেন, "আমার চলবে। কিন্তু বাড়ির মধ্যে বামুন ছাড়া হবে না, গৃহিণী ঢুকতে দেবে না।"

এবার বিদ্যাসাগর হেসে ফেললেন, তার পর বললেন, "বাপের কথায় পইতে গাছিটা পর্যন্ত রাখতে পারলে না. এখন পরিবারের কথায় বামুন খুঁজতে বেরিয়েছ!"

গিনিপিগরাই আসল

এক ভদ্রমহিলা তার পতিদেবতার পরনারী ঘটিত আচরণে খুবই ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন। এবং স্বামীকে নির্দেশ দিয়েছিলেন, "এখন থেকে তুমি আমাকে খুব ভালোবাসবে।"

লম্পটেরা সাধারণত সরল প্রকৃতির লোক হয়। তিনি স্ত্রীর এই আদেশের মানে বুঝতে পারলেন না। জিজ্ঞাসা করলেন, "হঠাৎ আমি তোমাকে এখন থেকে ভালোবাসতে যাব কেন?'

স্ত্রী বললেন, "কারণ আমি তোমাকে এখন থেকে ঘৃণা করতে শুরু করেছি এবং বাইবেলে আছে, যে তোমাকে ঘৃণা করে তুমি তাকে ভালোবাসবে।"

বলা বাহুল্য, এই গল্পটি এক খ্রিস্টান দম্পতির ঘৃণা ও ভালোবাসার গল্প। এই ধরনের অন্য একটি গল্প দেখা যাক।

এই সাধারণ দম্পতির কথা আমি তো আগেই বলেছি। বিস্তারিত বলার প্রয়োজন নেই। শুধু এদের একটি গুরুত্বপূর্ণ কথোপকথন স্মরণ করছি।

একদিন ঝগড়াঝাটি, কান্নাকাটির পর কিঞ্চিৎ শান্ত হয়ে স্ত্রী চোখ মুছতে মুছতে স্বামীকে জিজ্ঞাসা করলেন, "তুমি আমাকে ভালোবাস?"

আপ্লুত কণ্ঠে স্বামী বললেন, "খুব ভালোবাসি।"

কিছুক্ষণ থমকে থাকার পর স্ত্রী একটা সাংঘাতিক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করলেন, "আমি মারা গেলে তুমি কাঁদবে?"

স্বামী সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিলেন, "কাঁদব। খুব কাঁদব। নিশ্চয়ই কাঁদব।"

এবার স্ত্রী একটি ভুল কাজ করলেন। নিজের চোখ মোছা থামিয়ে স্বামীকে বললেন, "একটু কেঁদে দেখাও না।"

স্বামীর মোক্ষম জবাব, "একটু মরে দেখাও না।"

এরই কাছাকাছি আর একটি গল্পের কথা মনে পড়ছে।

আগের রাতেই বিষম বিবাদ বেধেছিল স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে। পরদিন সকালেও সেটা গড়াল। শুধু গড়ালই না, একটু বেশিই গড়াল। ফলে স্বামী বেচারা স্নান-খাওয়া না করে অফিস চলে গেল। পুরুষ মানুষের রাগ বেশিক্ষণ থাকে না। দুপুরের দিকে স্বামীর রাগ পড়ে এল, বিকেলের দিকে মাথা বেশ ঠান্ডা। তখন সে সাবধানে বাড়িতে স্ত্রীকে ফোন করল।

ফোন বাজতে পরিচিত কণ্ঠে স্ত্রীর 'হ্যালো' শুনে পুলকিত স্বামী বলল, "হ্যালো, আমি বলছি। আজ বিকেলে সকাল সকাল বাড়ি ফিরব। আজ সন্ধেবেলা কী রান্না করছ?"

স্বামীর বোধহয় এত কথা একবারে বলা উচিত হল না। ওপাশ থেকে স্ত্রী বিষাক্ত কণ্ঠ শোনা গেল। তার রাগ এখনো পড়েনি। সে দাঁত কিড়মিড়িয়ে বলল, "বিষ।"

স্বামী একটু হতচকিত হয়ে গিয়ে স্ত্রীকে বলল, "বিষ। খুব ভালো জিনিস। তুমি একাই খেয়ে নিয়ো। আমি রাতে বাইরে খাব।"

ঝগড়াঝাটির কথা থাক। তবে যারা ভাবেন ভালোবাসার কোনো পরিপূরক হয় না, তারা ভুল ভাবেন।

দুটি শিশুর গল্প মারফত একটা উদাহরণ দিই।

পাশাপাশি দুটি বাড়িতে দুটি বালক-বালিকা থাকত। তাদের দুজনের মধ্যে গভীর ভালোবাসা। এ ওকে ছেড়ে দশ মিনিটও থাকতে পারে না। কিন্তু একদিন দেখা গেল মেয়েটি যতই কাছে আসুক, ছেলেটি আর তাকে পাত্তা দেয় না। এড়িয়ে এড়িয়ে চলে। একজন প্রতিবেশী হিসাবে ব্যাপারটা কী আমি বুঝতে চেয়েছিলাম। ছেলেটির বাবাকে জিজ্ঞাসা করাতে সে বলেছিল, "ওর মা ওকে একটা গিনিপিগ কিনে দিয়েছে, সেই নিয়েই ও এখন মত্ত।"

জীবনে সব ভালোবাসাই প্রায় এই রকম। গিনিপিগরা আসল ভালোবাসা কেড়ে নেয়।

পুনশ্চ : মহামতি চেস্টারটন বলেছিলেন, বাইবেল আমাদের বলেছে প্রতিবেশীদেব ভালোবাসতে। আবার ওই বাইবেলেই আছে শত্রুদের ভালোবাসো।

তার মানে বাইবেলের মোদ্দা কথাটা হল এই যে, প্রতিবেশী আর শত্রু এই দুই জাতের লোকই এক। অর্থাৎ, প্রতিবেশী মানেই শত্রু। প্রতিবেশীকে ভালোবাসলেই শত্রুকে ভালোবাসা হবে, তা হলেই বাইবেল মান্য করা হবে।

টেলিভিশন সেটকে বিয়ে

গোপাল ভাঁড়ের গল্পে আছে, এক প্রবীণা মহিলা একবার বলেছিলেন, "এ বছর আমাদের পাড়ায় শুধু মেয়েদেরই বিয়ে হল।" তিনি পাড়ায় মেয়েদের দেখে এরকম উক্তি করেছিলেন। শুধু মেয়েদের তো বিয়ে হতে পারে না। পুরুষ বর তো লাগবেই। হয়তো সে অন্য পাড়া বা অন্য জায়গা থেকে এসেছে, কিন্তু তারও একই সঙ্গে বিয়ে হয়েছে।

এক মহিলা একদা আদালতের কাঠগোড়ায় সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন। সেখানে প্রশ্নে প্রশ্নে তাকে নাজেহাল করা হয়। তারপর সেই মামলার আসামি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়।

—"এই মামলার আসামি আপনার বন্ধু?"

—"হ্যাঁ।"

—"সে বিয়ে করেছে?"

—"হ্যাঁ।"

—"সে কাকে বিয়ে করেছে?"

—"একটি মহিলাকে।"

এই জবাবে প্রশ্নকারী উকিলমশাই অত্যন্ত খেপে গেলেন। বললেন—মানুষ মেয়েকেই বিয়ে করে। আপনি কাউকে জানেন যে, কেউ ছেলে বিয়ে করেছে?

সাক্ষী চটপট উত্তর, "হ্যাঁ জানি। আমার দিদিই তো ছেলে বিয়ে করেছে।"

বাকচাতুর্যের মধ্যে না গিয়ে একথা সরাসরি বলা যায়, বিয়ে ব্যাপারটা পুরোপুরি মেয়েদের ব্যাপার। হলুদ কোটা, স্ত্রী-আচার, বাসরঘর। এগুলোর গুরুত্ব আজকাল হয়তো কিছু কমেছে, কিন্তু শাড়ি-গয়নার ব্যাপারটা এমনভাবে বেড়েছে যে, কোনো খবরের কাগজের, টিভি সিরিয়ালের যে কোনো দিনের বিজ্ঞাপন দেখলেই বোঝা যায়। এত শাড়ির সম্ভার, এত গয়নার বৈচিত্র সবই বিয়ের কনেকে ঘিরে। বর বেচারাকেও একটা ধুতি পরতে হয় বিয়ের সময়। সেটাই আমাদের লোকাচার। কিন্তু কোনোদিন কোথাও কেউ বিয়ের ধুতির বিজ্ঞাপন দেখেছেন?

আজকাল তো ছেলেরাও অলঙ্কার পরছে। গলায় আর হাতে তো বটেই, নাকে এবং কানেও। কিন্তু কোনো বিয়ের অলঙ্কারের বিজ্ঞাপনে ছেলের গয়নার কোনও উল্লেখ নেই। তাই বলে ছেলেরা যে নিতান্ত উদাসীন, তারা ভালো কিছু চায় না, তা তো নয়। বিবাহোত্তর আত্মহত্যার শতকরা নিরানব্বইটি করে থাকেন মেয়েরা। অসহায় স্ত্রীর কাছ থেকে নিজের শখ মেটানোর রসদের জন্যে চাপ দেয় ছেলেরা। এই রসদ আসবে

শ্বশুরালয় থেকে। বিদেশ ভ্রমণ, মোটর গাড়ি, নতুন ফ্ল্যাট, ব্যবসার জন্যে টাকা, সামাজিক ও আর্থিক স্তর অনুযায়ী একেবারে হাতঘড়ি, সাইকেল পর্যন্ত চাপ সৃষ্টি হয়।

মেয়ের বাড়ির দিক থেকে এ-টাকা সংগ্রহ করা সম্ভব হয় না এবং তারা বুঝে কিংবা না বুঝে স্নেহের কন্যাটিকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেয়। আর সে যে কী সাংঘাতিক মৃত্যু, কখনও পিটিয়ে, কখনো পুড়িয়ে, কখনো বিষ দিয়ে কখনও গলা টিপে এবং মুখে বালিশ চাপা দিয়ে একটি নিরীহ তরুণীকে পৃথিবী থেকে সরাবার কত রকমফের।

আজকাল কেমন যেন হয়। হাসির কথা লিখতে লিখতে কেমন খেই হারিয়ে যায়।

হাসির কলমের সম্মান রাখতে অবশেষে একটা হাসির গল্পে ফিরে যাই। এ-গল্প অবশ্য মেয়ের নয় ছেলের। এক পাণিপ্রার্থী যুবকের।

তার আর মেয়ে পছন্দ হয় না, বিয়ে ঠিক হয় না, অবশেষে তার ঠাকুমা তাকে কোলের কাছে বসিয়ে শিশুর মতো মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে বললেন, "হ্যাঁরে, তুই কীরকম মেয়ে চাস বল দেখি?"

নাতির সঙ্গে ঠাকুমার আবাল্য প্রণয়। প্রণয়িনীকে প্রাণের কথা বলতে তার দ্বিধা হল না। সে বলল, "আমার স্ত্রী হবে খুব স্মার্ট, আধুনিক, ঝকমকে, গান গাইতে পারবে, সুন্দর নাচতে পারবে, চৌকস বক্তৃতা করতে পারবে, যে কোনো সময়ে যে কোনো লোকের সঙ্গে যে কোনো বিষয়ে কথা বলতে পারবে।"

এই পর্যন্ত শুনে ঠাকুমা খিলখিল করে হেসে উঠলেন। বললেন, "ওরে তুই যা চাইছিস সে কোনো একটা মেয়ের মধ্যে পাওয়া যাবে না। আসলে তুই একটা টেলিভিসন সেটকে বিয়ে করতে চাইছিস।"

মাথায় নকল চাঁদ

আর-এক দফা সিনেমা নিয়ে লিখব ভাবছিলাম। যথারীতি গঙ্গারামের আবির্ভাব। কয়েক সপ্তাহ তাকে দেখিনি। কী ব্যাপার? জিজ্ঞাসা করাতে সে বলল, দিদি-জামাইবাবু দু'জনই স্কুলশিক্ষক। তাদের গরমের ছুটি ছিল। অনেকদিন যাওয়া হয়নি। তাই সেখানে ঘুরে এলাম।

আমি বললাম, "সেখানটা কোথায়?"

সে বলল, "মেদিনীপুরের অভ্যন্তরে ঘাটালের কাছাকাছি। তারপর বলল, "আপনার এই সিনেমা-সিনেমা নয়। আমার দিদি-জামাইবাবুদের ওখানে যাত্রার রমরমা। এক-একটা শো-তে দশ-বিশ হাজার লোক হয়। আরম্ভ হয় রাত দশটা-এগারোটায়, শেষ হতে হতে প্রায় ভোররাত হয়ে যায়।"

না শুনে উপায় নেই, সুতরাং আমি মন দিয়ে গঙ্গারামের কথা শুনতে লাগলাম। গঙ্গারাম বলল, "আমার জামাইবাবু এক কট্টর নীতিবাগীশ লোক। সিনেমা-থিয়েটার, যাত্রা-নাটক-নভেল তার দু'চক্ষের বিষ। এদিকে আমার ভাগনেটি হয়েছে যাত্রা-থিয়েটারের পোকা। আশপাশের দু-পাঁচ মাইলের মধ্যে কোথাও যাত্রা কিংবা নাটক হলে সে দেখতে যাবেই।"

গঙ্গারামের নতুন বদ অভ্যেস হয়েছে নস্যি নেওয়া। পকেট থেকে একটা নস্যির কৌটো বের করে একটিপ নস্যি নিয়ে বিচিত্র কায়দায় হাতের তালু উলটিয়ে, আঙুল বেঁকিয়ে নস্যি ঝেড়ে ফেলে আমাকে বলল, "তা, যেদিন দিদির ওখানে গিয়েছি, ভাগনের দেখা নেই। ভাগনের বয়স চোদ্দো বছর। সামনের বছর মাধ্যমিক দেবে। বাড়ির বাইরে এত রাত করলে পড়বে কখন?" দিদি বলল, "আমি কিছু জানি না। কোথায় থিয়েটার-টিয়েটার দেখতে গিয়েছে। তোর জামাইবাবু কীভাবে গোলমাল করে দেখিস।" ঠিক তা-ই হল। জামাইবাবু রাত ন'টা নাগাদ বাড়ি ফিরে ছেলেকে না দেখতে পেয়ে প্রচুর হম্বিতম্বি করলেন। তারপর বললেন, "কখন বাড়ি ফেরে আমি দেখব। ও না আসা পর্যন্ত আজ জেগে থাকব।"

জামাইবাবু শোয়ার ঘরে গিয়ে বিছানায় হেলান দিয়ে জেগে রইলেন। আমি আর দিদি কী করব, আমরাও জাগলাম। একটু তাড়াতাড়িই বলা যায়, রাত একটা নাগাদ শ্রীমান এল। এসে মাকে বলল, "জানো মা, আজ এক দারুণ পালা দেখে এলাম।"

দিদি ছেলেকে বললেন, "কী পালা?"

ছেলে বলল, "মায়ের আশীর্বাদ।"

দিদি এবার বলল, "ভিতরের ঘরে তোমার বাবা তোমার জন্যে জেগে রয়েছেন। এবার তুমি ভিতরে যাও। 'বাবার রাগ' পালাটা দ্যাখো।"

এই পর্যন্ত বলে গঙ্গারাম চুপ করে রইল। আমি বললাম, "তারপর?"

গঙ্গারাম বলল, "তারপর আবার কী। এটা তো নাটকের গল্প নয়, এটা জীবন।"

পুনশ্চ গঙ্গারাম ঘুলিয়ে দিল। সিনেমা নিয়ে তেমনভাবে কথা হল না। তবু একটা ঘটনা বলি।

বহুদিন পরে একটি বহুপ্রচারিত সিনেমা দেখতে গিয়েছিলাম।

এক নবদম্পতি আমার সামনের সিটে বসে কথা বলছিল, কথা বলছিল, শুধু কথা বলেই যাচ্ছিল। আমি একবার একটু বাধা দিয়ে বললাম, "আমি কিচ্ছু শুনতে পাচ্ছি না। আপনাদের কথায় অসুবিধে হচ্ছে।"

শুনে বরটি কী বলতে যাচ্ছিল। মেয়েটি ফস করে বলল, "আপনার শোনার জন্যে আমরা কথা বলছি না। আপনি বুড়ো মানুষ, আমাদের কথা শুনতে যাবেন কেন?"

চন্দ্রাহত শব্দটির অর্থ পাগল বা উন্মাদ। কিন্তু প্রকৃত অর্থে চন্দ্রাহত এক প্রাচীন চিত্রতারকাকে আমি চিনতাম। তিনি বহুদিন বিগত হয়েছেন। তাঁকে কারো কারো আজো মনে থাকতে পারে। ভদ্রমহিলার কপালে একটি কাটা দাগ ছিল। ওই কাটা দাগটি

হয়েছিল চাঁদের আঘাতে। সে ছিল চলচ্চিত্রের আদি যুগ। একালের মতো উন্নতমানের কলাকৌশল, সেট, এ সব কিছুই ছিল না। একটা ছবিতে ছিল, মরূদ্যানে খেজুর গাছের আড়ালে চাঁদ উঠছে, আর খেজুর গাছের নিচে বিরহিনী নায়িকা বীণা বাজিয়ে খুবই দুঃখের গান গাইছেন। আলকাতরা দিয়ে কালো করা বড় বাঁশের মাথায় গোল চাঁদ। উজ্জ্বল হলুদ রঙের। কয়েক লরি বালি ফেলা হয়েছে। স্টুডিয়োর উঠোনে। কাছাকাছি গ্রাম থেকে গোটা তিন-চারেক খেজুর গাছ কেটে আনা হয়েছে। সেগুলো ওই বালির মধ্যে পুঁতে দেওয়া হয়েছে। পিছনে ঘন নীল পর্দা। সেটা হল আকাশ।

বিরহিনী নায়িকা করুণ সুরে গাইছেন। এমন সময় 'সাইলেন্স'! চাঁদ উঠছে। আস্তে আস্তে কালো বাঁশের গায়ে হলুদ চাঁদ খেজুর বনে প্রবেশ করল।

সিনেমায় পর্দায় দেখে কারো বোঝার উপায় নেই যে, পুরো জিনিসটা ভুয়ো। নকল মরূদ্যানে নকল আকাশের নিচে নকল চাঁদ। মিস্ত্রি কীরকম যেন ভুল করেছিল। নায়িকা চোখের জলে কপোল ভাসিয়ে করুণ কণ্ঠে গান গেয়ে যাচ্ছেন, এমন সময় 'ক্যাঁচ', 'ক্যাঁচ', 'কোঁচ'—অন্তরীক্ষ থেকে, মানে বাঁশের ডগা থেকে কাঠের চাঁদটি নায়িকার কপালে এসে পড়ল।

নায়িকা অজ্ঞান। এখনকার মতো খবরের কাগজ, টিভির যুগ ছিল না সেটা। তা হলে কি বিপুল হইচই হত। এখন আর তা কল্পনা করা যাবে না। তবে প্রৌঢ় বয়সে সেই অতীত দিনের নায়িকাকে আমি দেখেছি। তাঁর কপালে কোনাকুনিভাবে কাটার দাগটা তখনও ছিল, আমৃত্যু ছিল।

•

খাদ্যাখাদ্য

প্রাচীন নীতিকাহিনিতে আছে ব্যাং ও বালকের গল্প। বালকেরা পুকুরের জলে ঢিল ছুঁড়ে খেলা করছিল। পুকুরের জলে অনেক ব্যাং। এই ঢিল তাদের গায়ে লাগায় কোনো কোনো ব্যাং মারা পড়ায় একটি ব্যাং সাহসভরে জল থেকে মাথা তুলে বালকদের বলেছিল, 'তোমরা ঢিল ছোঁড়া বন্ধ করো।' বালকেরা বলেছিল, 'আমরা তো খেলছি।' তখন ব্যাংটি বলেছিল, 'এ তো মারাত্মক খেলা। তোমাদের যা খেলা, আমাদের তাই মৃত্যু।'

খাদ্যাখাদ্য নামে একটি রসরচনায় যদি ব্যাংয়ের প্রসঙ্গ দেখে কেউ ভাবেন আমি প্রথমে ব্যাং খাওয়ার প্রসঙ্গে যাচ্ছি, মানুষে তো সাপ-ব্যাং কত কিছুই খায়, সুতরাং খাদ্যাখাদ্য নিবন্ধে ব্যাংয়ের কথা হয়তো অস্বাভাবিক নয়।

না। আমরা এই নিবন্ধে ব্যাঙের স্বাদগুণ, খাদ্যমূল্য নিয়ে লোভনীয় কিছু লিখতে

যাচ্ছি না। আমাদের বক্তব্য হল, একজনের পক্ষে যা খেলা অন্যের পক্ষে তাই মৃত্যু। একজনের কাছে যা খাদ্য অন্যের কাছে তাই অখাদ্য।

আমাদের চারপাশে কতজনকেই তো দেখি খাওয়া নিয়ে কত রকম ফ্যাসাদ। একজনের মাছ-মাংস-ডিম-কোর্মা-কোফতা ছাড়া মুখে রোচে না; অন্যজন পরম তৃপ্তির সঙ্গে চাল-কলা নৈবেদ্য খান। উনি যদি তিন গ্লাস হুইস্কি খান ইনি চার গ্লাস সত্যনারায়ণের সিন্নি আনন্দের সঙ্গে পান করেন।

খাদ্য + অখাদ্য = খাদ্যাখাদ্য। পরিষ্কার দ্বন্দ্ব সমাস, খাদ্য ও অখাদ্য—খাদ্যাখাদ্য।

হাতের গুণে যে কোনো অখাদ্য খাদ্য হতে পারে। আবার যে কোনো খাদ্য অখাদ্য হতে পারে। যথারীতি গঙ্গারাম আমার লেখার সময় আমার পাশেই একটা বেতের মোড়া টেনে বসে পরিদর্শকের কাজ করছিল। তদারকি করার সুবিধার জন্যে কয়েকদিন আগে সে নিজেই মোড়াটি কিনে এনেছে। তাকে বাধা দেওয়ার উপায় নেই। খাদ্যাখাদ্যের ব্যাপারে সে অভিমত জানাল, 'যা খাদ্য তাই অখাদ্য।'

আমি বললাম, 'আমি তো সেই কথাই বোঝাতে চাইছি।'

গঙ্গারাম বলল, 'তাহলে ধানাইপানাই না করে সেই গল্পটা বলুন না।'

আমার বুঝতে অসুবিধে হল না। আমি বললাম, 'সেই রসগোল্লার গল্প?'

গঙ্গারাম বলল, 'ঠিকই ধরেছেন।'

আমি বললাম, 'সেই পচা রসগোল্লার পচা গল্প তুমি নিজেই তো জনে জনে হাজার বার বলেছ। আর আমিও তো কয়েকবার লিখলাম। পাঠক কি আর খাবে?'

গঙ্গারাম বলল, 'অবাক করলেন আপনি! পাঠক রসগোল্লা খাবে না?'

মুখে আমি বললাম বটে, 'তাই বলে পচা রসগোল্লা?' কিন্তু পুরোনো গল্পটা আবার বলছি।

গঙ্গারামের মামা বউবাজারের এক মিষ্টির দোকানে রসগোল্লা খেয়ে মোহিত হয়ে গিয়েছিলেন। ওরকম সুস্বাদু রসগোল্লা সবসময় পাওয়া যায় না। দিন সাতেক পরে তিনি ওই বউবাজার পাড়ায় আবার কী একটা কাজে গিয়েছিলেন। লোভে পড়ে সেই আগের দোকানে রসগোল্লা খেতে গেলেন। এবার রসগোল্লা মুখে দিতে পারলেন না। পচা, দুর্গন্ধ বেরুচ্ছে। কাছেই কাউন্টারে দোকানের মালিক বসেছিলেন। তিনি তাঁর কাছে গিয়ে অভিযোগ জানালেন, 'দেখুন, গত সপ্তাহে আপনাদের দোকানে বড় ভালো রসগোল্লা খেয়েছিলাম। আর আজকের রসগোল্লা একেবারে পচা।'

দোকানদার নিজে উঠে গিয়ে কর্মচারীদের কাছ থেকে খোঁজ নিয়ে এসে বললেন, 'কিন্তু স্যার, আপনাকে তো আমরা সেই গত সপ্তাহের রসগোল্লাই দিয়েছি।'

যে কোনো সুখাদ্যই পচে গেলে অখাদ্য হতে পারে কিন্তু মানুষের রুচিভেদে একজনের কাছে যা লোভনীয় খাদ্য আরেকজন সেটাই চূড়ান্ত অখাদ্য মনে করেন। আবার স্বাস্থ্যের কারণও আছে, যার অনেকটাই কাল্পনিক। একজনের ভাত খেলে শরীরে রসবাত হয়, তার স্ত্রীর রুটি খেলে অম্বল হয়।

পৃথিবীতে বহু লোক সাপ-ব্যাং-কুকুর খায়। কোরিয়ার সিওল বন্দর দিয়ে কখনো কখনো যাতায়াত করেছি। সুন্দর সুন্দর খাবারের দোকান। কিন্তু কুকুরের মাংসের ভয়ে কিছু খেতে পারিনি।

আবার অনেক সময় ভুল ধারণাও থাকে। আমার ছেলে আমাকে বিখ্যাত জাপানি 'সুসি' অর্থাৎ মশলা দেওয়া কাঁচা মাছ জোর করে খাইয়েছিল। প্রথমে আপত্তি করেছিলাম। কিন্তু খেয়ে দেখেছি অতি সুস্বাদু। আসলে ব্যাপারটা আমাদের ভাপা ইলিশ বা ভেটকি পাতুরির মতো।

তবে ধর্মতলা অঞ্চলে একবার একটি খাদ্যের সম্মুখীন হয়েছিলাম যা আপামর নির্বিশেষে সকলেরই অখাদ্য। সেটা ছিল একটা মাটন চপ। কতদিনের বাসি কে জানে, বহুদিন ভর্জিত এবং পুনঃভর্জিত গোলগাল চপটি একটু ঝাঁকি সহকারে টেবিলের ওপর রাখতে সেটি পিংপং বলের মতো লাফাতে লাগল। আমি তার লাফ থামানোর জন্য কাঁটা দিয়ে সেটি চেপে ধরতেই সেটা ভুসভুস শব্দ করে বালির প্রাসাদের মতো ধসে পড়ল।

আমি বেয়ারাকে ডেকে চপটা দেখিয়ে বললাম, 'এটা কী করে খাব? ম্যানেজার-বাবুকে ডাকো।'

বেয়ারা ঘাড় চুলকে বলল, 'ম্যানেজারবাবুও এই চপ খেতে পারবে না।'

ডাক্তার

দাঁত নিয়ে কোনো আলোচনাই আমি সম্পূর্ণ করতে পারব না গোবরা হাসপাতালের গল্পটি না বলে। গল্পটি পুরোনো। আগেও বোধহয় একবার লিখেছি। গল্পের যা মেজাজ, তাতে আর-একবার লিখতে বাধা নেই।

গত শতাব্দীর পাঁচের দশকের কাছাকাছি সময়। এখন যেখানে ন্যাশনাল মেডিক্যাল কলেজ কিংবা চিত্তরঞ্জন হাসপাতাল, তারই কাছাকাছি কোথাও ছিল মানসিক হাসপাতাল। সেই হাসপাতালে এক চিকিৎসক যুদ্ধফেরত মেজরসাহেব শুধু যে পাগল বা মানসিক রোগীর চিকিৎসা করতেন তা নয় তিনি জ্বর-টাইফয়েড-নিউমোনিয়া এমন কী কলেরা, বসন্ত পর্যন্ত চিকিৎসা করতেন। নাক-কানের তখন খুব বেশি আলাদা ডাক্তার ছিল না। সে সব তো দেখতেন, তা ছাড়া দাঁতের চিকিৎসা করতেন। সর্বোপরি মানসিক রোগ তো তাঁকে দেখতেই হত। আমরা তখন নিতান্ত বালক মাত্র। আমাদের বর্তমানের বৃদ্ধ খুল্লতাত, ছোটবেলা থেকে দেখছি, আমাদের ওই কাকা নানারকম উল্টোপাল্টা রোগে ভোগেন। কখনো ঘাড় শক্ত হয়ে যায়, ব্যথায় ঘাড় নাড়াতে পারেন না, কখনো কান কটকট করে, কখনো পা ফুলে যায়। আর দাঁতের ব্যথা তো আছেই। সারাজীবন ধরে ভদ্রলোক দাঁতের ব্যথায় কষ্ট পেয়ে আসছেন।

সে যা হোক, সে এক রবিবারের দুপুর। বাড়িতে ভালো ভালো রান্না হয়েছে। মাসের প্রথম রবিবার পোলাও-মাংস হত। খাদ্যের সুগন্ধে সারা বাড়ি ঝিমঝিম করছে। খাওয়ার সময় হয়ে এসেছে। আমরা স্নান-টান করতে যাচ্ছি, এমন সময় কাকা আর্তনাদ করতে লাগলেন। সকাল বেলা থেকে ব্যথা হচ্ছিল। বছরকারের মধ্যে তিন-চারবার দাঁতের ডাক্তার দেখিয়েছেন। কিন্তু আজ রবিবার, কোনো ডাক্তার পাওয়া যাবে না। দাদা চেষ্টা করছিলেন আজকের দিনটা কোনোরকমে সামলে দেওয়ার। কিন্তু বেলা বারোটা নাগাদ আর্তনাদ শুরু হল। কাকা কাটা পাঁঠার মতো ছটফট করতে লাগলেন। পাশের বাড়ির বাহাদুরবাবু কাকার এই অবস্থা দেখে বললেন, "প্রভাসকে গোবরা হাসপাতালে নিয়ে যাও। সেখানে মেজর ধন্বন্তরী বসেন। তিনি যে কোনো চিকিৎসা করেন, দাঁতের চিকিৎসা তাঁর কাছে ছেলেখেলা।"

কাকাকে নিয়ে আমি আর দাদা বেরিয়ে পড়লাম। গোবরায় পৌঁছে সরাসরি ধন্বন্তরী ডাক্তারের কাছে গেলাম। ধন্বন্তরী ডাক্তারের চেম্বারে খুব ভিড় নেই, বাইরে একটা ছোটোখাটো জটলা। আমরা গিয়ে দাঁতের ব্যথার কথা জানাতে ধন্বন্তরী বললেন, "একটু বসুন, আগে পাগলটাকে দেখে নিই। পাগল মানে বাইরের ময়লা ধুতি-পাঞ্জাবি পরা নির্বিকার মুখে এক মধ্যবয়স্ক ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে। তাকে ঘিরে আট-দশজন বিভিন্ন বয়সি আত্মীয়স্বজন। এক মহিলা এক প্রান্তে হাপুস নয়নে কাঁদছেন। তিনি বোধহয় তাঁর স্ত্রী। আর বাকিরা সব আকুল মিনতি করছে। কেউ বলছে, "কাকা কথা বলো", কেউ বলছে "মামা কথা বলো", কেউ ধমক দিচ্ছে, "এই ভোম্বল কথা বলবি কিনা বল।"

জানা গেল এই ভদ্রলোক গত চারদিন ধরে কথা বলছেন না একেবারে। কারণ কিন্তু জানা নেই। খাওয়া-দাওয়া নিত্যনৈমিত্তিক কাজকর্ম সব করে যাচ্ছেন কিন্তু। একেবারে স্পিকটি-নট। কিছুক্ষণ পরে ধন্বন্তরী ডাক্তার এলেন। এসে শুনলেন কী হয়েছে। তার পর বললেন, "এর চিকিৎসা আমি জানি।" তিনি রোগীকে হাত ধরে নিয়ে চেম্বারে চেয়ারে বসালেন। তার পর চেয়ারের নিচ থেকে একটা মোটা হাতুড়ি নিয়ে রোগীকে জিজ্ঞাসাবাদ করলেন, "আপনার নাম বলুন।" রোগী চুপ। মুখে একটা দৃঢ় প্রতিজ্ঞার ভাব। ধন্বন্তরী ডাক্তার অবশেষে হাতুড়ি তুললেন। বললেন, "যদি কথা না বলিস হাতুড়ি মেরে তোর চোয়াল ভেঙে দেব।" বলিষ্ঠ লোমশ হাতে ওই ভারী হাতুড়ি দেখে অসহায় লোকটি বিড়বিড় করে নাম বলল। ধন্বন্তরী রোগীর সঙ্গীদের বললেন, "যান এবার নিয়ে যান।" তারা বলল, "আবার যদি কথা বন্ধ করে?" ডাক্তার হাতুড়িটা উঁচিয়ে রোগীর দিকে তাকিয়ে গর্বের সঙ্গে বললেন, "মেজর ধন্বন্তরীর এই হাতুড়ি যে দেখেছে সে সারাজীবন কথা বলবে।" আমরা স্তম্ভিত হয়ে এই দৃশ্য দেখছিলাম। মেজর এবার কাকাকে নিয়ে চেয়ারে বসালেন। কাকা কী হয়েছে ভালো করে বুঝিয়ে বলার আগে মেজর তাকে মুখ খুলতে বললেন এবং মুখ খোলা মাত্র পাশের একটা টেবিল থেকে একটা সাঁড়াশি নিয়ে কেউ কিছু বোঝার আগে পরপর দুটো দাঁত তুলে মেঝেতে ফেলে দিলেন। আমরা তো হতভম্ব। মেজর বললেন,

"এক ফোঁটা রক্ত নেই এ তো অ্যানিমিয়া দেখছি।" তখন কাকা চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়িয়ে মেঝে থেকে দাঁতগুলো তুলে নিয়ে ডাক্তারকে বললেন, "এগুলো আমার বাঁধানো দাঁত। পাগল ডাক্তার, খুব রক্ত দেখার সাধ হয়েছে না?"

সাদা চিঠি

চিঠির কথা বলছিলাম। রবীন্দ্রনাথ থেকে সুকান্ত ভট্টাচার্য, অক্ষরজ্ঞানহীন শিশু থেকে দুর্বোধ্য হাতের লেখার শিক্ষিত মানুষ সকলের চিঠির কথাই অল্প করে বলেছি।

এবার প্রথমে একটা ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা বলি।

অনেককাল আগের কথা। কালীঘাট পোস্টাপিসের কাউন্টারে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমি একটা চিঠি লিখছিলাম আমার এক বান্ধবীকে। লিখতে লিখতে অনুভব করলাম আমার পিছনে কেউ দাঁড়িয়ে ঘাড়ে ও কাঁধের ফাঁকে উঁকি দিয়ে আমি কী লিখছি দেখছে। তার উষ্ণ নিশ্বাস আমার কাঁধে পড়ছে। আর তার মুখে কী দুর্গন্ধ! বাবা!

যা হোক, কোনোক্রমে ক্রোধ সংবরণ করে আমি চিঠিতে ব্র্যাকেটের মধ্যে লিখলাম, "একটা বদমাশ লোক আমার পিছনে দাঁড়িয়ে মন দিয়ে পড়ছে।"

এই পর্যন্ত লেখার পরেই দেখি সেই লোকটা রাগে গর্জন করছে আর আমাকে ধাক্কা দিচ্ছে। আমি ঘুরে দাঁড়াতে সে দাঁত খিঁচিয়ে বলল, "যতসব মিথ্যে কথা। আমি মোটেই আপনার চিঠি পড়ছিলাম না।"

বাজারে চিঠি লেখার হাজার রকম বই পাওয়া যায়। তাতে দলিল-দস্তাবেজ, ব্যবসায়িক পত্র এ-সব থেকে শুরু করে পারিবারিক চিঠি, প্রেমপত্র, নিমন্ত্রণপত্র, এমনকী শেষ কয়েক পৃষ্ঠায় ইসলামি রীতির চিঠির বেশ কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া হয়।

এসব বই বহুকাল ধরে চলে আসছে। বোধহয় প্রথম পত্রলিখন গ্রন্থটি শতাধিক বৎসর আগে প্রকাশিত হয়েছিল, কিংবা তারও আগে হবে। ইংরেজিতে 'লেটার রাইটিং' জাতীয় বই আমাদের দেশে অগুনতি পাওয়া যায়। কিন্তু খোদ ইংরেজদের দেশে কিংবা আমেরিকায় এ-জাতীয় বই কখনো চোখে পড়েনি।

আসল কথা হল, যে যার মতো চিঠি লিখবে, তাতে তাব মনের ভাব ব্যক্ত হবে, সে-কি আর ছাপানো বই থেকে টুকে লেখা সম্ভব?

তবে পৃথিবীর সব ভাষাতেই পত্রসাহিত্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পত্রসাহিত্য শুধু সাহিত্য নয়, ইতিহাস, রাজনীতি, ব্যক্তিগত জীবন, আত্মস্মৃতি—এগুলির আকর গ্রন্থ।

মহাত্মা গান্ধির চিঠিপত্র, রবীন্দ্রনাথের চিঠিপত্র মন দিয়ে বারবার পড়লে নিজেদের বিদ্যাবুদ্ধির উপকার হয়।

আর নয়। এবার একটি সাদা চিঠির কথায় যাই।

গঙ্গারাম একবার একটা তার নাম-ঠিকানা লেখা খাম এনে আমাকে দেখাল। খামের মধ্যে একটুকরো সাদা কাগজ।

গঙ্গারাম বলল, "আমার স্ত্রী বাপের বাড়ি গিয়েছে। সেখান থেকে চিঠি পাঠিয়েছে।"

আমি বললাম, "এ আবার কীরকম চিঠি?"

গঙ্গারাম বলল, "আমাদের মধ্যে এখন ঝগড়া চলছে যে, তাই কথাবার্তা বন্ধ। সাদা চিঠি।"

পুনশ্চ : অন্যের চিঠি পড়তে আমার খুব ভালো লাগে।

কেন?

ওগুলোর উত্তর দিতে হয় না তো, তাই।

চিঠি দিচ্ছি

'কত চিঠি লেখে লোকে
কত সুখে দুখে...'

সুকান্ত ভট্টাচার্যের 'রানার' কবিতাটি, যেটি সলিল চৌধুরি সুর দিয়ে গান করেছিলেন, পঞ্চাশের দশকে প্রবল জনপ্রিয় হয়েছিল। কলেজ সোশ্যালে হেমন্ত-ধনঞ্জয়ের গানের সঙ্গে বাঁধা ছিল শম্ভু ভট্টাচার্যের 'রানার রানার' নৃত্য। নাচের শেষে কী প্রচণ্ড হাততালি পড়ত একালের ষাট-সত্তর বছর বয়সিরা স্মরণ করতে পারেন কি।

একালে চিঠি লেখা, চিঠি পাওয়া প্রায় দুর্লভ হয়ে উঠেছে। বাইরের ডাকবাক্সে যত চিঠি পড়ে থাকে তার সবই মুদ্রিত বিজ্ঞাপন, বিপণন সাহিত্য।

এর বাইরে আছে ই-মেল, এস এম এস। সেই সঙ্গে টেলিফোন, লোকাল, আই এস ডি, এস টি ডি। তবে কাকে বলে এস এম এস, আর কাকে বলে আই এস ডি এ বিষয়ে আমার সম্যক ধারণা নেই। তবে এটুকু বলতে পারি, এরা সংবাদ, তথ্য বা বার্তা বহন করে কিন্তু মোটেই চিঠির পরিপূরক নয়।

নিজের চিঠিটি স্বহস্ত লিখিত না হলে তার মূল্য থাকবে কি?

"প্রিয় গঙ্গারাম,

কঠোর গ্রীষ্মে জীবন অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছে। চারিদিকে রসকষ কোথাও কিছু নাই। কয়েকটি তালশাঁস কিনিয়াছিলাম, টেবিলের ওপরে প্লেটে ছিল। বিকালে দেখি সেগুলি শুষ্কপত্রের মতো উড়িয়া গিয়াছে।

চারিদিক শুষ্ক। শুধু অগ্রেই শুষ্ক নয়, পশ্চাতেও শুষ্ক; বামে-দক্ষিণে উভয়দিকেই শুষ্ক, শুষ্কং কাষ্ঠং।

এই দুর্দিনে তোমার সরসতার প্রতীক্ষায় আছি। এই পত্র টেলিগ্রাম মনে করিয়া চলিয়া আসিবে।

ইতি—"

প্রায় সত্তর বৎসর পূর্বে রবীন্দ্রনাথ বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ প্রেমপত্র লিখতে গিয়ে সংশয়ে পড়েছিলেন; 'লেফাফার পরে কার নাম দিতে হবে।' অবশ্য এই চিঠির শুরুতেই তিনি তাঁর দ্বিধা ব্যক্ত করেছিলেন এই বলে যে, 'এ কালের দিনের বুঝি শুধু লেখে নাম থাক সে কথায় লিখি বিনা নাম দিয়ে।'

চিঠি লেখার ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথের ক্লান্তি ছিল না। যেমন ক্লান্তি নেই সেই শিশুটির যে বাবার একটা পুরোনো ডায়েরি খাতা নিয়ে একটার পর একটা পাতা ছিঁড়ে স্বভাবত হিজিবিজি লিখে যাচ্ছিল। তাকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, 'খোকা, তুমি কী লিখছ?' খোকা গম্ভীর হয়ে বলেছিল, 'দেখছ না চিঠি লিখছি?'

তাকে ধমক দিয়ে বলা হল, 'কী চিঠি লিখছ তুমি? তুমি তো লেখাপড়াই জানো না।'

সে হাসিমুখে বলল, 'তাতে কী? আমি যাকে চিঠি দিচ্ছি, সেও লেখাপড়া জানে না।'

এ চিঠির পাঠোদ্ধার কীভাবে হবে তা নিয়ে সঙ্গত কারণেই আমাদের কোনো চিন্তার প্রয়োজন নেই। তবে খারাপ হাতের লেখার লোকেদের চিঠি পাঠ করে অর্থ উদ্ধার করা প্রায়ই অসম্ভব হয়ে পড়ে।

এক গ্রাম্য ভদ্রলোকের লেখাপড়া মোটামুটি ছিল। কিন্তু হাতের লেখা ছিল যাচ্ছেতাই, দুষ্পাঠ্য। তিনিও সেটা জানতেন।

একবার আমগাছ থেকে আম পাড়তে গিয়ে মাটিতে পড়ে তাঁর পা ভেঙে যায়। সেই সময় গ্রাম সম্পর্কে ঠাকুমা, এমন একজন বৃদ্ধা তাকে দিয়ে চিঠি লেখাতে আসেন।

তিনি যখন চিঠি লিখতে আপত্তি জানান, সেই বৃদ্ধা তাকে বলেন, 'তুমি তো লিখবে হাত দিয়ে। তোমার পা ভেঙেছে তাতে কী হয়েছে?'

পত্রলেখক তখন বলেছিলেন, "লিখব অবশ্যই হাত দিয়ে, কিন্তু চিঠি পড়ে দেবে কে? সে তো আমাকেই গিয়ে পড়ে দিয়ে আসতে হয়। ভাঙা পা নিয়ে তো হাঁটাচলা করতে পারব না।"

গঙ্গারামের রসিকতা

অবিশ্বাস্য!

গঙ্গারাম তার কথা রেখেছে। আমাকে বড় একটা খামে ভর্তি করে ছোটোখাটো, টুকরো টুকরো কাগজ বেশ কিছু দিয়ে গিয়েছে। যেখানে যেমন রসিকতা শুনেছে তাই টুকে এনেছে। সব গ্রহণযোগ্য নয়। বেশ কয়েকটি মুদ্রণযোগ্য নয়, একটু মোটা দাগের। দু'একটি তো চরম অশ্লীল। গঙ্গারাম কী করে আমাকে দিল, অবাক লাগছে। তবে গঙ্গারাম সাদা মনের মানুষ। তার সাদা মনে ভালো খারাপ, শ্লীল-অশ্লীল এগুলির খুব ব্যবধান নেই। বেছে বেছে প্রথম যে রসিকতাটি গঙ্গারামের কাগজের টুকরোয় পেলাম সেটি আমি যে আমি, আজ পর্যন্ত কোথাও শুনিনি।

ব্যাংকের নবনিযুক্ত ম্যানেজারবাবু ক্রমে ক্রমে টের পাচ্ছেন ব্যাংকের এই শাখায় তাঁকে কেউই বিশেষ পছন্দ করে না। তাই একদিন কথায় কথায় ব্যাংকের ইউনিয়নের সচিবকে বললেন, "দেখুন আপনারা যে আমাকে খুব অপছন্দ করেন, সেটা আমি জানি। কিন্তু আপনাদের এখানে কেন যে আমার বনলো না।"

ইউনিয়নের সচিব কী আর জবাব দেবেন। চুপ করে বসে রইলেন।

ম্যানেজারবাবু বললেন, "অথচ আমি আগে যেখানে ছিলাম, এই তো আসবার সময়, সবাই মিলে চাঁদা করে, আমাকে চিনেমাটির দামি ডিনার সেট উপহার দিলেন।"

ইউনিয়নের সচিব বললেন, "স্যার, সেটা আমি শুনেছি। এবং সেইজন্য আপনাকে বলতে এসেছি।"

ম্যানেজারবাবু আগ্রহের সঙ্গে বললেন, "কী বলবেন বলুন।"

ইউনিয়নের সচিব বললেন, "স্যার এখানে কর্মচারীরা বলছে যে আপনি যদি চলে যান, তা হলে ওরা চাঁদা করে রুপোর ডিনারসেট কিনে দেবে।"

ব্যাপারটি ভালো। কিন্তু গঙ্গারাম শ্বশুরালয়ের শহর থেকে দু'একটা চটজলদি রসিকতার প্রশ্ন আমাদের জন্য নিয়ে এসেছে।

এক ভদ্রলোক খুব গর্বিত যে একদা তিনি সিনেমার সংলাপ লিখতেন। তাঁকে নাকি জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, "আপনি কী ধরনের ছবিতে সংলাপ লিখতেন?"

তিনি বলেছিলেন, "নির্বাক ছবিতে।"

আর একটা গঙ্গারামপুরের পুরোনো গল্প।

এক ভদ্রলোক এক ভিখারিকে একটা টাকা দিয়েছিলেন। মিনিট পাঁচেক পরে ভিখারিটি ফিরে আসে।

ভদ্রলোক বলেন, "এইমাত্র তো এক টাকা দিলাম!"

ভিখারি বলল, 'সে টাকা দিয়ে দুটো বিস্কুট কিনে খেয়েছি। এবারে টাকা পেলে চা খাব।'

হাতের বুড়ো আঙুলে 'আংটি' পরার নিয়ম নেই কেন?

এই নিয়ে গঙ্গারামপুরবাসীরা নানারকম আলাপ আলোচনা করার পর এই সিদ্ধান্তে আসে বুড়োদের আর কে সাজাতে চায়, সেই জন্যেই লোকে বুড়ো আঙুলে আংটি পরে না।

পুনশ্চ : এবারের শ্রেষ্ঠ গঙ্গারাম।

মহিলাদের বয়স নিয়ে নানারকম রসিকতা আছে। গঙ্গারামের ঝুলিতে যেটি পেলাম, সে চমৎকার। দুই যমজ ভাইবোনের নাক-চোখ-মুখ-গায়ের রং চালচলন সবে খুব মিল। কিন্তু একটা জায়গায় খুব অমিল। বোনের বয়স আটাশ, আর ভাইয়ের বয়স পঁয়ত্রিশ।

একটা হাঁসের মজুরি

প্রখর গ্রীষ্মে সকলেরই মাথা খারাপ হওয়ার অবস্থা। রাস্তায় এক ভিখারিকে দেখা গেল, সে যাকে পাচ্ছে তারই হাতে পয়সা গুঁজে দেওয়ার চেষ্টা করছে। প্রতিবেশী শিশু পৌত্রটি সকাল থেকে তাদের খোলা বারান্দায় দাঁড়িয়ে, মাঝে মধ্যে শূন্যে লাফ দিচ্ছে আর চেঁচিয়ে উঠছে তোমার দেখা পাই না। সহকার শাখায় উদভ্রান্ত কোকিল সারারাত ধরে গেয়ে যাচ্ছে, তোমার দেখা পাই না, তোমার দেখা পাই না।

কিন্তু আবার গঙ্গারামের দেখা পেলাম। আজকাল গরম পড়ামাত্র গঙ্গারাম একটা ভালো দেখে নতুন গামছা কেনে। খাল, বিল, পুকুর, নদী কোনো জলাশয় সামনাসামনি পেলে জামাকাপড় খুলে গামছা পরে একটা ডুব দিয়ে নেয়। আর, কী শান্তি!

তবে জলে নামার পর খুব সচেতন থাকতে হয়। জামাকাপড়গুলো আর কেউ নিয়ে চলে না যায়। অবশ্য গঙ্গারামের জিনিস নিয়ে কারো পালানো অসম্ভব।

যা হোক, প্রায় তিন সপ্তাহ পরে গঙ্গারাম হঠাৎ গতকাল এসে উপস্থিত। পাশের বাড়ির নাতি গঙ্গারামকে দেখে খুশি হয়ে রাস্তা দিয়ে ঘুরে আমাদের বাড়িতে চলে এল। তারপর গঙ্গারামকে দেখে সে ধেইধেই করে নাচতে লাগল এবং গাইতে লাগল আরও উচ্চ কণ্ঠে, 'তোমার দেখা নাই', 'তোমার দেখা নাই'।

উত্তেজনা একটু কমলে আমি গঙ্গারামকে জিজ্ঞাসা করলাম, "তুমি আজকাল কোথায় থাকো বলো তো?"

গঙ্গারাম বলল, "কয়েকদিনের জন্য শ্বশুরবাড়ি গিয়েছিলাম, বালুরঘাটে।"

আমি বললাম, "তোমার শ্বশুরবাড়ি তো বালুরঘাটে নয়।" তখন গঙ্গারাম হেসে

বলল, মিথ্যে বলল কিনা জানি না, "বালুরঘাটে নয়, বালুরঘাটের কাছেই একটা ছোটো শহরে।"

আমার সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ল, গঙ্গারামপুর। গঙ্গারামপুরে ওর শ্বশুরবাড়ি। আমি বললাম, "তোমার গঙ্গারামপুরে শ্বশুরবাড়ি।

গঙ্গারাম বলল, "আমার নাম গঙ্গারাম। আর শ্বশুরবাড়িব নাম যদি হয় গঙ্গারামপুর, ব্যাপারটা একটু হাস্যকর হয়ে যায় না!"

আমি বললাম, "এই গরমে গঙ্গারামপুরে কী করলে।"

গঙ্গারাম বিচক্ষণের মতো বলল, "আপনার জন্যেই আমাকে যেতে হয়েছিল।"

আমি অবাক, "আমার জন্যে তোমাকে গঙ্গারামপুরে যেতে হয়েছিল? সেখানে থাকতে হয়েছিল? আমি কিছু বুঝতে পারছি না।"

গঙ্গারাম গম্ভীর হয়ে বলল, "আসলে বলতে দুঃখ হচ্ছে, কিন্তু সকলেই তো বলাবলি করছে।"

আমি অবাক হয়ে বললাম "কী বলাবলি করছে?"

গঙ্গারাম বলল, "আপনার লেখা তো একদম ঝুলে গিয়েছে। সবাই বলে উনি আর লেখেন কেন?"

আমি জিজ্ঞাসা করি, "তুমি তার কী করবে?" গঙ্গারাম বলল, "গঙ্গারামপুরের লোকেরা খুব সুরসিক তো, তাই তাদের কাছ থেকে দু'চারটে রসকথা আপনার জন্যে আনতে গিয়েছিলাম।"

আমি বললাম, "এনেছ?"

গঙ্গারাম বলল, "বেশ অনেকগুলো।"

আমি বললাম, "অনেক দরকার নেই। আপাতত একটা বলো।"

গঙ্গারাম বলল, "শ্বশুরবাড়িতে একদিন মাছ কিনে দেব ভেবেছিলাম। বাজারে যা মাছের দাম। মাছের বাজারের পাশে দেখি দুটো বড় বড় ডিমের দোকান। ভালো, বড় আকারের হাঁসের ডিম রয়েছে। ভাবলাম এই ডিম দশ-বারোটা শ্বশুরবাড়িতে নিয়ে যাই। জিজ্ঞাসা করলাম, ডিমের কী দর? ডিমওলা বলল, "তিন টাকা। আমি শুনে চমকে গেলাম। বললাম, বলেন কী! দোকানদার বলল, কী আর বলব? শুধু একটা কথা ভেবে দেখবেন স্যার, একটা ডিম একটা হাঁসের এক দিনের মজুরি।"

নায়ককে পিঁড়ি দেওয়া হত

"কাঁঠাল কাঠের পিঁড়ি,/কাঁসার গেলাসে জল,/দু একটা বাতাসা—/কবে ছলছল/তুমি শেষ এসেছিলে/আমাদের পুরোনো বাসায়।"

কবে?

কতকাল আগে?

পঞ্চাশ-ষাট বছর না হয়ে যায় না। বাঙালির গৃহস্থ-জীবন থেকে পিঁড়ির পাট কবে উঠে গিয়েছে।

একদিন ছিল, যখন ঘরে ঘরে চেয়ার ছিল না। তখন লোকজন এলে পিঁড়ি পেতে বসতে দেওয়া হত। দু বেলা খাওয়াদাওয়া, চা-জলখাবার থেকে নৈশাহার, সবই লোকে পিঁড়িতে বসে সারত।

একদা বাংলা ছড়ায় নায়ককে পিঁড়ি পেতে বসতে দেওয়া হত। আজকাল উত্তর কলকাতার দু একটা প্রাচীন সংসার আর গ্রাম-মফস্‌সলের কিছু বাড়ি ছাড়া অন্য কোথাও পিঁড়ির ব্যবহার দেখা যায় না। সরি, বিয়ে বাড়িতে এখনো, বিশেষ করে হিন্দু বিয়েতে পিঁড়ির ব্যবহার আছে। বরকনের জন্য রঙিন ফুলপাতা আঁকা আলপনা শোভিত বরকনের আসন, কনেকে পিঁড়িতে বসিয়ে বরের চারপাশে ঘোরানো। কোথাও কোথাও পিঁড়ির উপর বসা পরিণীতাকে দিয়ে দণ্ডায়মান বরের গলায় মালা দেওয়া এবং সেই মালা বদল এবং / অথবা ওড়নার অভ্যন্তরে চারচক্ষুর দৃষ্টি বিনিময়।

এটা এখনো চলে আসছে। এখনও ম্যারেজ রেজিস্ট্রারের অফিসের বাইরে বাঙালির সামাজিক বিয়েতে বর-কনে চেয়ারে বসে বিয়ে করে না। পিঁড়ি লাগবেই। অন্তত তিনটে পিঁড়ি চাই। একটি বরের, একটি কনের, আর-একটি পুরুতঠাকুরের। তবে কন্যা সম্প্রদানের সময় পুরুতঠাকুর তাঁর নিজের পিঁড়িটি ছেড়ে দেন কনের বাবা-জ্যাঠা-গুরুজন স্থানীয় সম্প্রদানকারীর জন্য। আর ঠাকুরমশাই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মন্ত্র পড়েন।

অবশ্য আমি এ-ব্যাপারে 'অথরিটি' নই। জীবনে একবারের বেশি বিয়ে করার সুযোগ পাইনি। করার সাহস পাইনি। স্থানভেদে, কালভেদে এসব রীতিনীতির অনেক ব্যত্যয় হয়ে থাকে; সে যা হোক, আসল প্রশ্নটা হল পিঁড়ি জিনিসটা কী? অভিধানগত ভাবে পিঁড়ি মানে 'বসিবার জন্যে কাষ্ঠাসন।' নতুন প্রজন্মের যারা জীবনে পিঁড়ি চোখে দেখেনি তাদের এটুকু বললে সবটা বোঝানো যাবে না।

পিঁড়ি একটি আয়তক্ষেত্র আকারের চৌকো, প্রায় এক হাত পাশে এবং, দেড় হাত লম্বা, যা ব্যবহারকারীর বয়স, শরীরের আয়তন এবং পারিবারিক গুরুত্ব হিসাবে কিছু ছোটো-বড় হয়ে থাকে। প্রায় এক ইঞ্চি পুরু সমতল কাঠের পিঁড়ির নিচে ঠিক পায়ার

মতো চারপাশে একটা ঘেরা দেওয়া থাকে। ফলে জমি থেকে একটু উঁচুতে থাকে পিঁড়ি। হায়দরাবাদে নবাবের বাড়ির নিমন্ত্রণে পিঁড়ির অভিজাত সংস্করণ দেখেছি। সেটা একটু উঁচু, রেলিং দেওয়া।

আমাদের বাল্য ও কৈশোরে প্রত্যেকের আলাদা আলাদা পিঁড়ি ছিল। রান্নাঘরের একপাশে কিংবা রান্নাঘরের বারান্দায় সেগুলো কাত করে রাখা হত। খাওয়ার সময় যে যার পিঁড়ি নিয়ে বসত। কোন্‌টা কার পিঁড়ি, তা নিয়ে বেশ গোলমালও হত। সম্প্রতি একটি স্মৃতিকাহিনিতে পড়লাম সবচেয়ে ছোটো যে দু ভাই, তারা যখন একা একা খেতে বসার মতো বড় হল, তখন তাদের পিঁড়ি হয়নি। তারা পিঁড়ি নেই বলে খুব কান্নাকাটি করায় তাদের মা রান্নাঘরের মাটির মেঝেতে দুটি ছোটো ছোটো আয়তক্ষেত্র খুন্তি দিয়ে দাগ কেটে এঁকে দিয়েছিলেন। তাতে দুজনের নাম লিখে দিয়েছিলেন। বুঝিয়ে ছিলেন 'এগুলি তোমাদের পিঁড়ি।' সেই অঙ্কিত পিঁড়ির উপর বসে তারা সানন্দে খেত। খাওয়ার টেবিলে যদি চেয়ার না থাকে একালের শিশুদের একে বসার জায়গা করে দেওয়া যাবে না।

পিঁড়ির মধ্যে সবচেয়ে উত্তম মানের ছিল কাঁঠাল কাঠের পিঁড়ি। মসৃণ, সমতল, ভাঙত না, বেঁকত না। কোনো কোনো পুরোনো সংসারে এমন পিঁড়ি ছিল, যে পিঁড়ি সে-বাড়ির প্রবীণ গৃহকর্তা জন্মকাল থেকে দেখে আসছেন। তার ক্ষয়ক্ষতি, ধ্বংস নেই।

একটা নির্মম গল্প আছে। এক বৃদ্ধকে মৃত্যুকালে খুব সেবা-শুশ্রূষা করেছিলেন তাঁর এক পুরাতন ভৃত্য। সেই ভৃত্যকে বৃদ্ধ লোভ দেখিয়েছিলেন, "তোকে আমি এমন একটা জিনিস দিয়ে যাব যার উপরে তিনপুরুষ বসে খেতে পারবি।" স্বভাবতই ভৃত্যটি খুবই আশা করে ছিল। কিন্তু বৃদ্ধের মৃত্যুর পরে তার উইল পাঠ করে জানা গেল তিনি তাঁর বশংবদ ভৃত্যকে একটি কাঁঠাল কাঠের পিঁড়ি দিয়ে গিয়েছেন।

'তোমার ফুতুরি ডার্ক'

আমাদের কৈশোরে পরীক্ষা এরকম ছিল না। পরীক্ষার মাসে পাড়ায় পাড়ায় সন্ধেবেলার ও শেষ রাতের আলো-আঁধারি মাখা বাতাসে ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হত পরীক্ষার্থীদের ব্যাকুল মুখস্থ চর্চা। চিৎকার করে পড়া মুখস্থ করার একটা বড় সুবিধে এই, অভিভাবকদের জানান দেওয়া হয়, আমি পড়ছি। কিন্তু আসল সুবিধেটা হল অন্যরকম।

আশপাশের বাড়ি কিংবা রাস্তা দিয়ে চলমান লেখাপড়া জানা মানুষরা ছেলেমেয়েদের মুখস্থ পাঠ শুনে শুধরে দিতে পারতেন যদি কোনো ভুল তাঁদের কানে আসে।

একটি ছেলে, ইস্কুলে যখন ফিউচার টেন্‌স পড়ানো হয়, অনুপস্থিত ছিল। ফিউচার

শব্দটির সঙ্গেও পরিচয় ছিল না। সে ফিউচারকে উচ্চারণ করত 'এফ ড্যাশ ইউ ফু টি ড্যাশ ইউ তু আর ই ড্যাশ রি' অর্থাৎ 'ফুতুরি'।

রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে এক ভদ্রলোক এই 'ফুতুরি' শুনে ছেলেটিকে জানলা দিয়ে ডেকে সংশোধন করে 'ফিউচার' করে দিয়ে যান।

কয়েকদিন পরে তিনি সেই পথ দিয়ে যেতে যেতে শুনলেন ছেলেটি তখনও 'ফুতুরি' বলছে।

তিনি এবার জানলা দিয়ে ছেলেটিকে ডেকে আর সংশোধন করার চেষ্টা করলেন না, বরং বলে গেলেন, "তোমার ফুতুরি ডার্ক" অর্থাৎ "তোমার ভবিষ্যৎ অন্ধকার"।

এখন এই ভবিষ্যৎ অন্ধকার ব্যাপারটা সর্বজনীন হয়ে গিয়েছে। তিন-চারজন ভাগ্যবান-ভাগ্যবতী বালক-বালিকা ছাড়া প্রায় সকলেরই ভবিষ্যৎ অন্ধকার। পাশ করে কী কাজ পাবে, কোথায় কাজ পাবে—কোনো উজ্জ্বল সম্ভাবনা নেই। সবই ভাগ্য এবং রাজনীতির দয়ার উপর নির্ভরশীল।

পরীক্ষা, ভবিষ্যৎ—এ সব নিয়ে খুব বেশি বলার অধিকার আমার নেই। আমিই তো সেই ছাত্র, যাকে অঙ্কে জিরো পাওয়ার অপরাধে পিতার নিপীড়নের সম্মুখীন হতে হয়েছিল। সবাই জানেন, নিপীড়নের হাত থেকে উদ্ধার করেছিলেন আমার পিসিমা এবং বাবাকে বলেছিলেন, "খোকন যে একেবারে কিছু পায়নি তা তো নয়, আর কিছু না হোক অন্তত জিরো পেয়েছে।"

সেই নাবালক বয়সে নিপীড়নের হাত থেকে রক্ষা পেয়ে প্রথম জেনেছিলাম, জীবনে জিরো পাওয়াটাও একটা পাওয়া। জীবনের প্রায় প্রতিটি প্রাঙ্গণে সবাই হিরো, আর আমি জিরো। কিন্তু তবুও তো প্রাপ্তি কিছু কম হল না।

সেই কবে পরীক্ষার খাতায় লিখেছিলাম, "রামবাবু অকাল কুষ্মাণ্ড খাইয়া পরলোক গমন করিয়াছেন" এবং "তিল হইতে তাল করিতে অন্তত এক কেজি তিল লাগিবে"।

তা ছাড়া এও তো লিখেছিলাম, "হাতিবাগান বাজারে সুখের পায়রা শস্তায় কিনিতে পাওয়া যায়।"

আমার এইসব বাক্যরচনা পাঠ করে আমার পরম শ্রদ্ধেয় মাস্টারমশাইরা আমাকে মোটেই গঞ্জনা দেননি, লাঞ্ছনাও নয়, তাঁরা অনাবিল হাস্যরস খুঁজে পেয়েছেন।

একবার আমার বাংলা দ্বিতীয় পত্রের উত্তরের খাতা নিয়ে আমাদের সেকেন্ড মাস্টার প্রমথ স্যার সারা শহরে জনে জনে লোককে খাতা খুলে দেখিয়েছিলেন, "তুলসী বনের বাঘ হরিলুটের বাতাসা খাইয়া জীবনধারণ করে", "ডুমুরের ফুলের গন্ধে চতুর্দিক ছাইয়া গিয়াছে"।

আজ মনে হয় প্রথম স্যার দূরদর্শী মানুষ ছিলেন। তিনি আমাকে বলেছিলেন, "ভগবান তোমাকে লোক হাসাবার অপার ক্ষমতা দিয়েছেন, তুমি লিখে যাও। লোকে তোমার লেখা পড়ে হাস্য সম্বরণ করতে পারবে না।"

কারখানা হাসতে হাসতে তুলে দিয়েছি

রাজনীতি নিয়ে রসিকতা করার সাহস আমার নেই, রাজনীতিকদের নিয়েও নয়। কিন্তু এমন একটা গল্প শুনলাম যা না লিখলে পাঠক-পাঠিকাদের প্রতি অন্যায় করা হবে। এ কথা মনে রাখা ভালো, যে-কোনো সফল রাজনীতিকের প্রধান গুণগুলির একটা হল রসবোধ। কিংবা রসবোধের অভিনয়। অনেক অন্যায়-অপমানের মধ্যে, অনেক কাদা ছোড়াছুড়ির মধ্যে তাঁকে ঠোঁটের হাসিটি ধরে রাখতে হয়। সুরসিক রাজনীতিকদের সংখ্যা কম নয়। একরোখা রগচটা মানুষের পক্ষে রাজনীতি করে বেশিদূর ওঠা যায় না। আবার শিবরাম চক্রবর্তী কিংবা হিমানীশ গোস্বামীর মতো সদা-সরস হলে রাজনীতিতে পাত্তা পাওয়া একটু কঠিন। রাজনীতিবিদদের একটু ড্রাই-হিউমার কিংবা শুকনো রসিকতার দিকে প্রবণতা। শুষ্ক এবং ঠেস-দেওয়া রসিকতার চূড়ান্ত উদাহরণ আমাদের মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধি।

মহাত্মা গান্ধি বিলেতে গিয়েছেন পরাধীন ভারতের ভাগ্য নির্ধারক আলোচনায়। ইংল্যান্ডেশ্বর সম্রাট পঞ্চম জর্জ তাঁকে বাকিংহাম প্রাসাদে ডেকে পাঠিয়েছেন। ইংল্যান্ডের প্রবল শীতে গান্ধিজি প্রাসাদে এলেন খালি গা, খালি পা, শরীরের অধমাংশে সেই নেংটি বা খাটো ধুতি। গান্ধিজিকে অভ্যর্থনা জানিয়ে সম্রাট বললেন, "এই প্রচণ্ড শীতে আপনার জামা-কাপড় এত কম কেন?"

মহাত্মা গান্ধি আচকান-চাপকান, জামা-জোব্বা, কয়েক প্রস্থ পশম বস্ত্র পরিহিত সম্রাটের দিকে তাকিয়ে বলেছিলেন, "সম্রাট বাহাদুর, আপনি একা যা পোশাক পরেছেন, তা আমাদের দু'জনের পক্ষে যথেষ্ট।" এই প্রসঙ্গে আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে একটা ঘটনা বলি।

আমি তখন রাইটার্স বিল্ডিংসে এমন একটি দপ্তরে কাজ করি, যাদের দায়িত্ব হল বিভিন্ন সরকারি সভা, আলোচনা, সেমিনারে চা ইত্যাদি পরিবেশন করা। রাইটার্স বিল্ডিংসের মন্ত্রী ও সচিবদের ঘরে আমার দপ্তর থেকেই চায়ের জোগান যেত। বলা বাহুল্য, সেটা 'ডু-ইট-নাউ'-এর যুগ ছিল না। পরিবেশন ব্যবস্থাও খুব ঢিলেঢালা ছিল। সব সময়ই দেরি হয়ে যেত (আজকাল নিশ্চয়ই এমন হয় না)।

সে যা হোক, মুখ্যমন্ত্রীর ঘরে চা পরিবেশনেও যথাযথ দেরি হত।

তখন মাননীয় জ্যোতি বসু মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন। একদিন তাঁর ঘরে খবরের কাগজের লোকেরা এসেছে। তারা এসে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলার আগেই চা পরিবেশিত হল। সাংবাদিকরা রীতিমতো অবাক। এ কী অসম্ভব কাণ্ড! তাঁরা মুখ্যমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানালেন, আসামাত্র চা পাওয়ার জন্য।

ঠান্ডা গলায় মুখ্যমন্ত্রী বললেন, "এ আপনাদের চা নয়। একটু আগে যারা এখানে মিটিং করে গেল, তাদের চা। পেয়েছেন, খেয়ে ফেলুন।"

এই দুটি গল্পের পরে নতুন গল্পটি যোগ করি—

স্থান হাওড়া স্টেশন। এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক একটা বিরাট ট্রাংক নিয়ে ট্রেনে ওঠার চেষ্টা করছেন। কিন্তু অসম্ভব। একজন কুলি নিয়েছেন। তার পরে আরও একজন। সবসুদ্ধ দুজন কুলি।

কিন্তু তারাও ভারি ট্রাংকটাকে তুলে কামরার মধ্যে ঢোকাতে পারছে না।

এমন সময় এক রোগা লিকলিকে ময়লা ধুতি-পাঞ্জাবি পরা, চোখে হাই পাওয়ারের চশমা, চুল এলোমেলো প্রৌঢ় ভদ্রলোক এগিয়ে এলেন। এসে বললেন, "আপনাবা ছাড়ুন দেখি। ট্রাংকটা আমি তুলে দিচ্ছি।"

এবং সত্যিই আশ্চর্য! ভদ্রলোক অবলীলাক্রমে ট্রাংকটি কামরায় তুলে দিলেন।

ট্রাংকের মালিক অবাক। তিনি প্রৌঢ় ভদ্রলোককে অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, "তাজ্জব ব্যাপার! এটা কী করে সম্ভব করলেন?"

প্রৌঢ় ধুতির খুঁট দিয়ে চশমার কাচ মুছতে মুছতে বললেন, "দেখুন, আমি ট্রেড ইউনিয়নের লিডার। কত বড় বড় কলকারখানা, ফ্যাক্টরি হাসতে হাসতে তুলে দিয়েছি, আর এ তো সামান্য একটা ট্রাংক।"

দর্শকরাই ফ্লপ করছে

শীতকাল। থিয়েটারের মরশুম চলছে। চারদিকে নাট্য-উৎসব। মফস্‌সল থেকে থিয়েটারের দল আসছে। অন্যান্য রাজ্য থেকে আসছে। বাংলাদেশ থেকে আসবে। নান্দীকার উৎসব করছে। অ্যাকাডেমি, রবীন্দ্রসদন, গিরিশ মঞ্চ, মধুসূদন মঞ্চ জমজমাট। এই তো সময় থিয়েটারের মজার গল্প বলার, উপভোগ করার।

কিন্তু আমার ঝুলিতে গল্প আর কই?

একদা সেই যে এক নায়কের কথা লিখেছিলাম, যে নাটকের ম্যানেজারকে বলেছিল, "ম্যানেজার সাহেব, আপনি যদি নাটকের যে দৃশ্যে আমার মদ খাওয়ার কথা, সেখানে রঙিন সরবত না দিয়ে যদি মদ দেন তা হলে অভিনয়টা জমিয়ে দেব।"

প্রবীণ বিচক্ষণ ম্যানেজার সাহেব একটু ঘাড় চুলকে বললেন, "তোমার প্রস্তাবটায় রাজি হতে পারি এক শর্তে।"

নায়ক কিঞ্চিৎ আশান্বিত হয়ে বললেন, "শর্তটা কী?"

ম্যানেজার সাহেব চাপা হাসি হেসে বলেছিলেন "মদ খাওয়ার দৃশ্যে খাঁটি মদ দিতে পারি কিন্তু শেষ দৃশ্যে তোমার আত্মহত্যার সময় যখন বিষপান করবে তখন নকল বিষ নয়, তোমাকে আসল বিষ খেতে হবে।"

সেই নায়িকার কথাও মনে পড়ছে। বিরহবিধুর রমণীর ভূমিকায় মহিলা অভিনয় করছিলেন। প্রত্যেকদিন চলনসই অভিনয় করেন, কিন্তু একদিন সাংঘাতিক ব্যাপার। মারামারি-ফাটাফাটি ব্যাপার।

বিরহিনী স্টেজে নিজে কাঁদলেন। প্রেক্ষাগৃহের দর্শকদেরও অশ্রুভারাক্রান্ত করলেন। অভিনয় শেষে মঞ্চের মালিক স্বয়ং এসে অভিনেত্রীতে অভিনন্দন জানালেন। বললেন, "আজ এমন অভিনয় করলেন যে কল্পনা করা যায় না।"

অভিনেত্রী ম্লান হেসে বললেন, "অভিনয় কি আমি করেছি? আমার পায়ের চপ্পলের পেরেকটা উঠে গিয়েছে। প্রচণ্ড যন্ত্রণা হচ্ছিল গোড়ালিতে। এই দেখুন, রক্ত শুকিয়ে আছে। এই যন্ত্রণার জন্যেই তো এত কান্না কান্না অভিনয় হল।"

দুঁদে মালিক সঙ্গে সঙ্গে বললেন, "তা হলে তো ঠিক আছে। আপনি এখন থেকে পেরেক ওঠা ওই চপ্পল পরে অভিনয় করবেন। চপ্পলজোড়া উইংসে রেখে যান। আর অন্য সময় ব্যবহারের জন্য আপনাকে ম্যানেজারবাবু একজোড়া নতুন চপ্পল কিনে এনে দেবেন।"

যত পুরোনোই হোক এসব গল্প কখনও মাঠে মারা যায় না। যেমন এর পরের গল্পটির আবেদনও কখনও কমবে না।

গল্পটি কিন্তু সামান্য।

এক অভিনেতা বহু চেষ্টা করে একটি নাটকে মৃত সৈনিকের ভূমিকা পেয়েছিলেন। কিন্তু সেখানেও পরিচালক তাঁর অভিনয়ে দোষ ধরেন। তিনি মৃতের মতো মেঝেতে পড়ে ছিলেন। পরিচালক নাকি ধমকেছিলেন, "ওরকম শক্ত, কাঠ হয়ে পড়ে থাকবেন না। মৃত্যুর মধ্যে লাইফ আনুন।"

অভিনয়ে লাইফ আনা, বিশেষ করে মৃতের অভিনয়ে, সে যে কি সাংঘাতিক ব্যাপার সবাই বুঝতে পারবে না।

অবশেষে দুটো বিদেশি গল্প বলি।

একটি গল্প অসকার ওয়াইল্ড-জড়িত। অসকার সাহেব তাঁর একটি নাটকের প্রথম দিনের অভিনয়ে আমন্ত্রিত হয়ে উপস্থিত ছিলেন। নাটকটি ফ্লপ করেছিল।

অভিনয় শেষে সাংবাদিকরা যখন তাঁকে ঘিরে ধরে, প্রশ্ন করে, "নাটকটা শুনলাম ফ্লপ করেছে!"

অসকার ওয়াইল্ড বলেছিলেন, "নাটকটা ফ্লপ করেনি, বরং অসামান্য হয়েছে। তবে দর্শকরা একজোটে ফ্লপ করেছে।"

এবারও অসকার ওয়াইল্ড। তিনি একদিন একটি নাটক দেখতে গিয়েছিলেন। দেখা

হয়ে গেলে নাটকের পরিচালককে বললেন, "অনেকদিন আগে আমি এরকম একটা নাটক লিখেছিলাম।"

পরিচালক বললেন, "বলেন কী স্যার? এ তো আপনারই নাটক অভিনয় করছি আমরা।"

শব্দের কাজ

যদি আপনি কোনো মহিলার শ্লীলতাহানি করে থাকেন, আপনি তাঁকে বেইজ্জত করেছেন, তা যদি সেই মহিলার কোনো লজ্জা বা শরম না থাকে, তিনি বেশরম, আর এ-সব ব্যাপারে যদি আপনি পরোয়া না করেন আপনি বেপরোয়া।

কিন্তু এসব সত্ত্বেও যদি আপনার কোনোই গুণ না থাকে, আপনি কিন্তু বেগুন নন, আপনি নির্গুণ, খাঁটি তৎসম নির্গুণ।

অভিধানকার বলেছেন, 'বেগুন' শব্দটির অর্থ এক রকম তরকারি, ব্যঞ্জন রাঁধিয়া খাইবার ফল বিশেষ। তবে বেগুন শব্দ অশুদ্ধ প্রয়োগ।

আসল শব্দটি হল বার্তাকু। পঞ্জিকা খুললে এখনও দেখা যায় কোনো কোনো দিন বার্তাকু ভক্ষণ নিষেধ। সে সব নিষেধ আজকাল কেউ মানে না।

কিন্তু 'বার্তাকু' শব্দটা কোথা থেকে কীভাবে এল? আসল সংস্কৃত শব্দটি বাতিঙ্গন। শব্দটি পশ্চিম বাংলায় বেগুন, পূর্ব বাংলায় বাঙ্গাল ভাষায় কোথাও কোথাও বাইগন। বলা বাহুল্য, বাঙ্গাল শব্দটি (বাতিঙ্গন থেকে বাইগন) সংস্কৃতের অনেক কাছাকাছি।

'বাইগন' নিয়ে সৈয়দ মুজতবা আলির গল্পটি স্মরণীয়। এক বাঙ্গাল ভদ্রলোক বেগুনকে যথারীতি বাইগন বলেন। তাঁকে একজন বলেন, "বাইগন না বলে বেগুন বলতে পারেন, বেগুন কত ভালো শোনায়।" এর জবাবে সেই ভদ্রলোক বলেছিলেন, "ভালোই যদি শোনাবে, তা হলে বেগুন বলারই বা দরকার কী, বেগুনকে প্রাণনাথ বলতে পারেন।"

ছোটো করে বলতে গিয়ে মুজতবার প্রসিদ্ধ গল্পটি একটু অন্যরকম হয়ে গেল। অন্য একটা ছড়া মনে পড়ছে,

ঢাকা হইতে সাইগন,
বেগুন হইতে বাইগন
আলু এবং পটল
কিন্তু অটল।

আমার দাদার একটু মাথা খারাপ ছিল। খুব বেগুন খেতে ভালোবাসত, বেগুন

পোড়া, বেগুন সেদ্ধ, বেগুন ভাজা। কিন্তু অন্য তরকারির সঙ্গে জিয়ল মাছের ঝোলে বেগুন দিলেই খেপে যেত, বলত, 'Let bygones be bygones' বাইগনেরা বাইগনই থাকুক।

এখন, যেখান থেকে এই লেখা লিখেছি, সেখানে অবশ্য বেগুন-বাইগনের সমস্যা নেই, এখানে বেগুন হল এগপ্ল্যান্ট। আমরা কিন্তু ছোটোবেলায় ওয়ার্ডবুক দেখে শিখেছিলাম বেগুন হল ব্রিঞ্জল।

অবশেষে বেগুন খেতে যাই।

পথের পাশে একটা বেগুন খেতের ধারে এক প্রৌঢ় গৃহস্থ বসে রয়েছেন, তিনিই খেতের মালিক। তাঁর সব চিন্তা আপাতত বেগুনখেত নিয়ে। তিনি আবার কানে একটু খাটো। রাস্তা ধারে যেতে যেতে এক ব্যক্তি ওই গৃহস্থকে প্রশ্ন করলেন, "কর্তামশায় কেমন আছেন?" কর্তামশায় বললেন, "ভালোই।" পথিক বললেন, 'ছেলেপিলেদের খবর কী?" গৃহস্থের চিন্তা বেগুনখেতে নিবদ্ধ। তিনি ভাবলেন, বেগুনের কথা জিজ্ঞাসা করছেন, বললেন, "এই আর কি, বেশি নয়, কোনো সপ্তাহে পাঁচ-সাতটা হয়, কোনো সপ্তাহে বিশ-পঁচিশটা।" শুনে পথিক অবাক, "এত ছেলে-পিলে দিয়ে কী করেন?" গৃহস্থ বললেন, "দুয়েকটা ভেজে খাই, দুয়েকটা পুড়িয়ে, কয়েকটা সেদ্ধ। আরও বেশি হলে বিলিয়ে দিই। বেচে দিই।"

হাঁটা শেখাতে পাঁচ টাকা

কলকাতায় তেমন হাঁটবার রাস্তা নেই। গঙ্গার ধারে এপাশ-ওপাশ মিলিয়ে কয়েক কিলোমিটার ছিল, সেও ভবঘুরে আর ভিখিরির কবলে। সাধারণ পার্কগুলির অধিকাংশেই ভোরবেলা কিংবা সন্ধ্যায় ছিনতাই-এর ভয়। ছিনতাই শুধু নয়, 'ইভ-টিজিং' যাকে বলে মহিলাদের বিব্রত করা, অনেক সময়ই সেটা চূড়ান্ত অশালীন হয়। ফলে নিরীহ জনসাধারণ পার্কগুলি এড়িয়ে চলেন।

কলকাতায় দুটি জায়গা ছিল মোটামুটি নিরাপদ: এক, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের বাগান এবং দুই, ইডেন উদ্যান। দুটিরই নানারকম আকর্ষণ আছে। ঐতিহাসিক পরিচয় আছে। সাধারণ গৃহস্থ ভদ্রলোক বড়দিনের দুপুরে কিম্বা গ্রীষ্মের অপরাহ্নে সপরিবারে ভ্রমণে আসেন। উল্লেখযোগ্য এই যে, ইডেন বা ভিক্টোরিয়ার কাছাকাছি তেমন কোনো জনবসতি বা পাড়া নেই যেখান থেকে লোকজন পায়ে হেঁটে নিয়মিত এখানে আসবে। তবুও পায়ে হেঁটে না হোক, অন্তত গাড়ি করে ভিক্টোরিয়ায় বা ইডেনে দুবেলাই যথেষ্ট জনসমাগম হয়।

দুঃখের বিষয়, দু'টি উদ্যানেই প্রবেশমূল্য ধার্য হয়েছে। অল্প কিছুদিনের মধ্যেই দু টাকা বা পাঁচ টাকার টিকিট কেটে এসব জায়গায় প্রবেশ করা যাবে।

লক্ষণ ভালো নয়। আর কিছুদিন পরে হয়তো যে কোনো পার্কে এমনকী গড়ের মাঠে ময়দানে টিকিট না কেটে হাঁটা চলা করা যাবে না।

মোটরগাড়ি চালনার শিক্ষানবিশরা যেমন গাড়ির সামনে একটা 'এল' লেখা প্লেট লাগিয়ে দেয় (এল মানে 'লারনার'), তেমনি আমি স্বচক্ষে দেখেছি গলায় 'এল' লেখা প্ল্যাকার্ড, দশ বারো মাসের দামাল শিশু থপথপ করে হাঁটা শিখছে ময়দানের ঘাসের উপরে।

দৈনিক পাঁচ টাকা করে দিয়ে ওই শিশুটিকে এবং সঙ্গে তার অভিভাবকের পাঁচ টাকা মোট দশ টাকা ব্যয়ে প্রতিদিন একটি শিশুকে হাঁটা শেখানো বেশ কঠিন কাজ। চারশো-পাঁচশো স্কোয়ারফুটের ফ্ল্যাটে কিংবা একান্নবর্তী বাড়ির উঠোনে হাঁটার জায়গা নেই। এরপর শিশুগুলি কোথায় হাঁটবে?

তা ছাড়া পার্কের বেঞ্চিতে বসে প্রেম-বন্ধুত্ব-বিশ্রম্ভালাপ, এমনকী ছোটোখাটো ব্যবসা কতলোক যে চালায়। ইডেন উদ্যান বোধহয় সরকারি বনবিভাগের আওতায়। সেখানে যে-কোনো একুশে আইনের প্রয়োগ হতে পারে। কিন্তু ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল সম্পর্কে আমার মনে একটা প্রশ্ন আছে।

ড. ফ্রাংক টেলার নামে ব্রিটিশ কাউন্সিলের এক প্রাক্তন কর্তা একসময় আমার বিশেষ বন্ধু ছিলেন। ব্রিটিশ কাউন্সিল থেকে অবসর গ্রহণের পর তিনি বিলেতে রাজকীয় ট্রাস্টের দায়িত্বে যান। কয়েকবছর আগেও তিনি ভারতে এসেছেন ব্রিটিশ রাজের অন্থিভুক্ত বিভিন্ন সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণ দেখতে। তিনি কলকাতায় আসতেন, সেই সূত্রে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালে। সেই সময় আমার সঙ্গে দেখা হত। অবশ্য গত দুবছর আসেননি।

সে যা হোক, আমার ধারণা, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালে সরকার কিংবা কোনো স্থানীয় সংস্থার সরাসরি অধিকার নেই প্রবেশ নিয়ন্ত্রণ কিংবা প্রবেশ মূল্য সংগ্রহ করার। এতদ্‌সত্ত্বেও পাঁচ টাকা করে প্রবেশমূল্য ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের জন্য ইতিমধ্যে ধার্য হয়ে গিয়েছে।

পুনশ্চ : এসব কথা এই সপ্তাহ শেষের তরল কথিকামালায় অবশ্যই বলার নয়। আমি বলি-ও না।

কিন্তু আমাকে কিঞ্চিৎ বিচলিত করেছে সংবাদ প্রতিদিনের ২৮ ডিসেম্বর, মঙ্গলবার প্রকাশিত একটি মর্মস্পর্শী আলোকচিত্র এবং প্রতিবেদন।

লন্ডন-প্রবাসী সম্প্রতি বিবাহ-বিচ্ছিন্না এক চিকিৎসক দম্পতি, অবশ্যই বাঙালি, ভিক্টোরিয়ার অঙ্গনে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে, সঙ্গে তাদের শিশুকন্যাটি। মেয়ে এখন মায়ের কাছে এদেশে থাকে। বাবা বিলেতে। আদালত নির্দেশ দিয়েছে মা মেয়েকে এক সপ্তাহ ধরে প্রতিদিন বাবার কাছে নিয়ে আসবে।

আলোকচিত্রে দেখা যাচ্ছে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের অঙ্গনে বাবা মেয়েটিকে কাছে আসার জন্য করুণ অনুরোধ জানাচ্ছেন। মেয়েটি আসবে না। মাকে জড়িয়ে ধরেছে।

এরকম ঘটনা নিশ্চয়ই হামেশাই হয় না। কিন্তু ছবি ও প্রতিবেদন দেখে আমার কী মনে হল জানেন? স্বামী-স্ত্রী ও কন্যার পুনর্মিলনের এই ঐকান্তিক প্রয়াস, এখন থেকে তার জন্য তিন-পাঁচ-এ পনেরো টাকা ব্যয় করে টিকিট কাটতে হবে। স্বামী-স্ত্রী ও কন্যা তাদের তিনজনের ভিক্টোরিয়ায় প্রবেশমূল্য পনেরো টাকা। প্রবাসী চিকিৎসকের জন্য টাকাটা তেমন কিছু নয়, কিন্তু ব্যাপারটা প্রতীকী।

পাগলামি

পৃথিবীর সব দেশেই পাগল আছে। পাগলামি মানুষের জন্মগত অধিকার। পাগলামিতে অনেকেরই সহজাত প্রতিভা থাকে। আমাদের কলকাতা শহরে কিংবা বাঙালিদের মধ্যে মোটেই পাগলের অভাব নেই। আগে যেমন ছিল ঘরে-ঘরে পাগল, এখন আর তেমন একটা দেখা যায় না। তবে এখনও প্রত্যেক পাড়ায়, প্রত্যেক অফিসে, প্রত্যেক বাজারে, কাছারিতে অন্তত একটা করে পাগল আছে। কিন্তু এই এতদূরে এসে প্রশান্ত মহাসাগরের অপর প্রান্তে মার্কিন দেশের পশ্চিম উপকূলের ছোটো শহরের প্রত্যন্ত পার্কের মধ্যে বাঙালি পাগলের দেখা পাব, এরকম আশা করিনি।

একদিন বিকেলে বাসার কাছাকাছি একটা পার্কের প্রান্তে একটা বেঞ্চে বসে আছি। এখানে পার্ক মানে উদ্যান নয় বা ফুলবাগান নয়, গাছ-গাছালি ভরা রীতিমতো বন-জঙ্গল। এখানে বলে 'ফল'। হেমন্ত। গ্রীষ্ম শেষ। শীত আসছে। গাছের পাতার রং বদলাচ্ছে, পাতা ঝরা শুরু হয়ে গিয়েছে। কেমন মন খারাপ করা অপরাহ্ন। এমন সময় একটা চেনা গানের সুরে অবাক হয়ে গেলাম। রবীন্দ্রনাথের গান, 'ঝরা পাতা গো আমি তোমারই দলে', গানের সঙ্গে বনের মধ্যে একটা গাছেব আড়াল থেকে বেরিয়ে এলেন এক ভদ্রলোক। মাথার চুল উশকোখুশকো, চোখের মধ্যে একটা ঘোলাটে ভাব। পরনের কোট-প্যান্ট বেশ ময়লা, সর্বোপরি কলকাতার সেই পেটেন্ট হাওয়াই চটি। এ দেশে লোকে নানারকম উল্টোপাল্টা সাজপোশাক পরে। এর মধ্যেও ইনি বেশ বেমানান। ভদ্রলোক এসে বেঞ্চে আমার পাশে বসলেন। প্রশ্নটা আমি তাঁকে করতে যাচ্ছিলাম, ঠিক সেই প্রশ্নটাই তিনি আমাকে করলেন, "আপনি বাঙালি?"

আমি বললাম, "অবশ্যই।"

'রবীন্দ্রসঙ্গীত শুনে আপনার বিচলিত মুখভাব দেখেই বুঝতে পেরেছিলাম।" তিনি বললেন, "আপনার নাম?"

আমি নাম বলতে তিনি মৃদু হেসে ফেললেন, "আপনার নামটা আমার চেনা।" এ সব ক্ষেত্রে আমার একটা পুরোনো চালাকি আছে, আমি বললাম, "তা হতে পারে, আমি অনেক দিন রাঁচি পাগলাগারদের সুপার ছিলাম।" তিনি হেসে বললেন, "বাজে কথা ছাড়ুন, আপনার কাণ্ডজ্ঞান আমি পড়েছি। আমার কাছে বইটা আছে। কিন্তু এখন তার মধ্যে কোনো মজা নেই।" আমি অবাক হয়ে বললাম, "কেন?" তিনি বললেন, 'যে কোনো মজার বই, হাসির বই আমি আমার দু'হাতে পাঁচ মিনিট ধরে রাখব, তারপর তার মধ্যে আর কোনো মজা থাকবে না, উবে যাবে। সে বইয়ের রসিকতার গল্প পড়ে লোকের চোখে জল আসবে।"

ভদ্রলোক উচ্চমানের পাগল। আমি পাগলের বংশের সন্তান, পাগল দেখলে তার ঘরানা বুঝতে পারি। শেকসপিয়র বলেছিলেন, "লোকটার পাগলামির মেথড আছে।" আমার পরিচিত কবি-শিল্পীদের মধ্যে অনেক সেয়ানা পাগল আছেন। আসলে এটা একটা 'মেথড'। বিখ্যাত হাওয়ার মেথড। শিবরাম চক্রবর্তী বলেছিলেন, "পাগলামির জন্য বিখ্যাত হয়ে লাভ কী?" কিন্তু অনেকেই জ্ঞানত পাগলামি করে বিখ্যাত হতে চায়। সদ্য পরিচিত ভদ্রলোকটি সেই পন্থা অবলম্বন করেছেন কিনা তখন বুঝিনি, পরে জেনেছি, ইনি এমনিতেই বৈজ্ঞানিক হিসেবে বিখ্যাত, পাগলামি এঁর সহজাত ব্যাপার, প্রতিভার বিকাশ।

প্রীতিভাজনেষু, এবারের মতো প্রবাসের দিন প্রায় শেষ। এই কিস্তি ছাপা হতে-হতে কলকাতায় ফিরছি।

প্রবাস থেকে তোমাকে আমার এই প্রথম চিঠি। সেটা হয়ে গেল পাগল নিয়ে। কার জন্য এমন হল? তোমার জন্য, না আমার জন্য?'

বই যদি না উতরোয়

বইমেলা সমাগত।

বইমেলার কর্মকর্তারা প্রত্যেক বছরই মেলার জন্য এমন একটা সময় বেছে নেন, যখন শীত যাই-যাই করে অবশেষে সত্যিই যাচ্ছে। বসন্তের নবীন সবুজ পাতা নতুন বইয়ের ঝকঝকে পৃষ্ঠার মতোই উন্মোচিত হয়েছে। আমের বোলের গন্ধে মফস্সলের আর শহরতলির রাস্তাঘাট রিমঝিম করছে, বিশেষ করে শেষ রাতের কুয়াশায় মাখামাখি হয়ে।

তরুণ কবি ও সম্পাদকেরা বইমেলার উত্তেজনায় অস্থির হয়ে পড়েছেন। এমন অনেক পত্রিকা আছে, যা বৎসরে এই একবারই প্রকাশিত হয়। এমন অনেক কবি

আছেন, যাঁর প্রথম কবিতার বই এই মেলাতেই প্রকাশিত হচ্ছে। বড় বড় গ্রন্থালয়ের প্রকাশিত নতুন বইয়ের তালিকা পাওয়া যায়, কিন্তু এই সব ছোটো ছোটো পত্রিকা ও কবিতার বইয়ের সংখ্যার কোনো হিসাব নেই। থাকা সম্ভবও নয়। বইমেলার প্রথম দিন থেকে শুরু করে একেবারে শেষদিন অপরাহ্ন পর্যন্ত বই প্রকাশিত হয়। এর অধিকাংশই নতুন কবিতার চটি বই। এইসব কবির ভিড়ে দু একজন আগামী দিনের শক্তি চট্টোপাধ্যায় কিংবা জয় গোস্বামীও যে রয়েছেন, থাকতে পারেন, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

ছোটো ছোটো কয়েক বর্গফুট স্টলে হইচই, ভিড়, উত্তেজনা। এরই ফাঁকে-ফাঁকে এপাশে-ওপাশে নানা মঞ্চে বই প্রকাশের অনুষ্ঠান। আগে বই প্রকাশ নিয়ে তেমন কোনো অনুষ্ঠান হত না। শুধু বৃহৎ প্রকাশকের ঘর থেকে কোনো মূল্যবান বা গুরুত্বপূর্ণ বই প্রকাশিত হলে এরকম অনুষ্ঠান কালেভদ্রে আয়োজন করা হত। এখন তো বই প্রকাশের অনুষ্ঠানের ছড়াছড়ি। অবশ্য এ ব্যাপারটা নেহাতই সাম্প্রতিক। হয়তো বেশিদিন টেঁকসই হবে না। বই ভালো না হলে বইয়ের প্রকাশ অনুষ্ঠান ভালো করে করলেও খুব একটা সুবিধে হওয়ার কথা নয়।

বই বিক্রির নানা কায়দা আছে। তার মধ্যে বিজ্ঞাপন একটা কায়দা। বড় পত্রিকায় ভালো সমালোচনা, তাতেও সুবিধে হয়। কোনো সাহিত্য পুরস্কার পেলে সেটাও বইয়ের প্রচার ও বিক্রিতে খুব সহায়ক হয়।

তবু এও দেখা গিয়েছে, বিজ্ঞাপন, প্রশংসা ও পুরস্কার, বেস্ট-সেলার লিস্টে বইয়ের নাম কিছুতেই শেষ পর্যন্ত খুব সুবিধে হয় না, বই যদি না উতরোয়।

বহুদিন আগে 'অচলপত্র' পত্রিকায় দীপ্তেন সান্যাল একটি কাল্পনিক বিজ্ঞাপন উপহার দিয়েছিলেন। তাতে লেখা ছিল---

"প্রথমেই পঞ্চম সংস্করণ।"

আমি নিজে একটা বিজ্ঞাপনের খসড়া করেছিলাম। গত বছর কিংবা তার আগের বছর বইমেলার সময় সেটা কোথাও লিখেছিলাম। বিজ্ঞাপনটি বইয়ের নয়। বিয়ের বিজ্ঞাপন, খবরের কাগজের পাত্র-পাত্রী কলমের জন্য। বিজ্ঞাপনটি এই রকম :

"পাত্রী চাই। ঘনশ্যাম মৈত্রের 'হলুদ বনে সবুজ মেয়ে' উপন্যাসের নায়িকার মতো দেখতে-শুনতে পাত্রী চাই। পাত্র সুন্দর, স্বাস্থ্যবান, সদ্বংশ, বিদ্বান ও ধনী।"

জানি না, আমার এই পরামর্শ অনুযায়ী কেউ কোনো বই বিজ্ঞাপন দিয়েছিলেন কি না, তবে হলফ করে বলতে পারি, শুধু এই বিজ্ঞাপনের জোরেই কয়েকশো বই বিক্রি হয়ে যেতে পারে।

আবার আর এক রকম বই আছে, যে বই দুর্লভ, দুষ্প্রাপ্য। যেমন 'প্রাচীন ভারতে কি ছারপোকা ছিল?' অথবা 'সাদা ফুল শীতকালে ফোটে না কেন?'

ঠিক এই রকম একটি বই গত শতকের গোড়ার দিকে প্রকাশিত 'বন্য মহিষ পোষ মানাইবার সহজ পদ্ধতি।' বইটি দেখেছিলাম বইমেলাতেই দুর্লভ, দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থের বিক্রির

একটি বিখ্যাত দোকানে। দোকানের মালিক নিজেও বিখ্যাত। আমাকে খুব স্নেহ করেন। তিনি কয়েকটা বইয়ের সঙ্গে এই বইটিও দেখিয়ে বলেছিলেন, "দাম অন্তত পাঁচ হাজার পাব। এই বইটার একটাই কপি আছে।"

আমি বলেছিলাম, "তা হলে আপনি ছাপিয়ে বেচছেন না কেন? অনেক টাকা হত।"

তিনি বললেন, "নতুন ছাপালে এ বই এক টাকা দিয়েও কেউ কিনবে না। এক কপিও বিক্রি হবে না।"

ভাগ করে স্বপ্ন দেখা

এই এত দূরে এসেও রক্ষা নেই।

প্রশান্ত মহাসাগরের শেষপ্রান্তে পাহাড় এবং খাঁড়িতে ঘেরা এই মায়াবি শহরে শীত-শীত দিনরাত। খাইদাই, ঘুমোই, না ঘুমোলে শুয়ে থাকি, বই পড়ি কিংবা 'পর্চ'-এ রোদ পোহাই।

কলকাতায় পুজোর লেখা শেষ করে গরমের দীর্ঘ দিনগুলি এক লাফে ডিঙিয়ে আজ কিছু কাল হল ভ্যাপসা ভাদ্রের আগেই কয়েক মাসের জন্য বার্কলে নামক সুখ্যাত বিদ্যানগরীতে ছেলের কাছে চলে আসি। ফিরতে ফিরতে কার্তিকের হিমেল দিন শুরু হয়ে যায় কলকাতায়।

এখানে চুপচাপ কয়েকদিন বসে থাকার পরে ধীরে ধীরে কলকাতার ব্যস্ততা, সপ্তাহান্তিক কলামে, খুচরো রচনা সব কেমন দূরে চলে যায়, শুধু সমুখে নয় চারপাশেই শান্তি পারাবার।

ভালোই চলছিলাম। হঠাৎ কাল রাতে স্বপ্নের মধ্যে গঙ্গারাম এসে হাজির। স্বপ্নের মধ্যেই তার সে কী হম্বিতম্বি, "এখানে গা ঢাকা দিয়ে আছেন! আপনার নামে কি হুলিয়া বেরিয়েছিল? কলকাতায় ফিরে গেলে মজা বুঝবেন।"

স্বপ্নের মধ্যেই আমি ভয়ে বলি, "কিসের মজা?"

গঙ্গারাম বলল, "আপনার পাঠকেরা লাঠি নিয়ে, পাঠিকারা ঝাঁটা নিয়ে আপনাকে খুঁজছেন। আপনি তাঁদের ফাঁকি দিয়ে চলে এসেছেন।"

আমি বললাম, "তাই বলে কি আমার কোনো ছুটি নেই, ছুটি থাকতে পারে না। তা ছাড়া সম্পাদক মশায়কে তো বলে এসেছি।"

গঙ্গারাম বলল, "সম্পাদক আর পাঠক কি এক কথা হল? ফিরে আসুন দেখবেন মজা।"

ফিরে গিয়ে মজা দেখতে চাই না। আমার কলাম ওই সুদূর প্রবাস থেকে আবার

শুরু করছি। এই ব্যঞ্জনে যদি বিদেশি মশলা একটু বেশি থাকে, পাঠক-পাঠিকা নিজগুণে ক্ষমা করবেন।

'স্বপ্ন' দিয়েই প্রবাসী আরম্ভ করি।

স্বপ্ন অবশ্য কবিতার বিষয়। 'দূরে বহু দূরে স্বপ্নলোকে উজ্জয়িনীপুরে' রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'পূর্ব জনমের প্রথমা প্রিয়ারে' খুঁজতে গিয়েছিলেন। পূর্ব জনমের প্রথমা প্রিয়া বিষয়ে আমার কোনো ধারণাই নেই, আমার স্বপ্নে নিতান্ত কাঠখোট্টা গঙ্গারাম।

দুটো পুরোনো স্বপ্নের গল্প বলে আপাতত কাঠখোট্টাকে খুশি করি।

বুদ্ধদেব বসু বলেছিলেন, "শুধু তাই পবিত্র, যা ব্যক্তিগত।" সে দিক থেকে স্বপ্ন হল সবচেয়ে পবিত্র, ব্যক্তিগত ব্যাপার। স্ত্রী-পুত্র, আত্মীয় বান্ধব কারও সঙ্গে ভাগ করে স্বপ্ন দেখা যায় না। একা একা দেখতে হয়।

এইরকম একটা স্বপ্ন একা-একা দেখতে দেখতে এক ভদ্রলোক ঘুমের মধ্যে 'মলি, মলি' বলে চ্যাঁচাচ্ছিলেন। পাশেই শুয়ে থাকা তাঁর স্ত্রী তাঁর ঘুম ভাঙিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, "মলি মেয়েটা কে?" "ও কিছু নয়, ও একটা রেসের ঘোড়ার নাম।" ভদ্রলোক মাঝে-মধ্যে রেসে যান, তাই তখনকাব মতো পার পেয়ে গেলেন। কিন্তু বিপদ হল পরের দিন সকালে। ভদ্রলোক বাথরুমে স্নান করছেন, তখন তাঁর স্ত্রী এসে দরজায় করাঘাত করে জানালেন, "কালকের সেই রেসের ঘোড়াটা তোমাকে ফোনে ডাকছে।"

এর পরের গল্পটিও দাম্পত্য স্বপ্নের। বড় দুঃখের গল্প।

এক সন্দেহবাতিক স্ত্রী মধ্যরাতে ঘুম ভেঙে উঠে হঠাৎ স্বামীর বুকে-পিঠে দুমদাম ঘুষি মারতে লাগলেন। ভদ্রলোক চমকে উঠে বললেন, "কী হল? কী হয়েছে? মারছ কেন?" স্ত্রী বললেন, "আমি যদি আর কখনও স্বপ্নে দেখি তুমি আর কোনো মেয়েকে ভালোবাসছ, আমি বিষ খেয়ে মরব।"

থিয়েটারের অনুরাগী

অল্প কিছুকাল আগে থিয়েটারের ব্যাপার-স্যাপার নিয়ে অল্প কিছু লিখেছিলাম। পুরোনো সব মজার কথা।

আমাদের সময় আমরা যেমন থিয়েটারের অনুরাগী ছিলাম আজকাল আর তেমন নয়। এখনকার মূল ঝোঁকটা টিভির দিকে। ছেলেমেয়েরা অনেকেই টিভির সঙ্গে যুক্ত। কেউ কেউ অভিনয়ে নিজেদের সুপ্রতিষ্ঠিত করেছে। তা ছাড়া প্রযোজনা, পরিচালনার সঙ্গে যুক্ত। অনেক লেখকই চিত্রনাট্যকার। কেউ কেউ খুবই যোগ্য।

সম্প্রতি সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় এক জায়গায় বলেছেন, "আমি যদি লেখক না হতাম তা হলে অন্তত দ্বিতীয় শ্রেণির একজন অভিনেতা হতাম।" সারাজীবনে নানা ধরনের অভিনয় তিনি করেছেন। টিভির অভিনয়েও তাঁকে দেখা যাবে।

কবি দীপক মজুমদার ছিলেন নাটক-অন্ত প্রাণ। গলা খুলে গান গাইতে পারতেন। আমাদের সময়কার কবি মোহিত চট্টোপাধ্যায় পুরোপুরি নাটকের পথে চলে গেলেন। তিনি বর্তমান বাংলা নাটকের প্রাণপুরুষদের একজন।

সত্যি কথা বলতে কি, আমি এবং শক্তি চট্টোপাধ্যায় ছাড়া নাটক কৃত্তিবাসের কবিরা প্রায় সকলেই করেছেন। আমার কণ্ঠস্বর শুনে অনেকেই ভাবত আমি নাটক করতে গেলে ফাটাফাটি কাণ্ড হয়ে যাবে। আমি অবশ্য নাটক করতে যাইনি, তার প্রধান কারণ হল সেই সেকালে মঞ্চে উঠলেই আমার পা থরথর করে কাঁপত। বোধহয় 'নটী নবনীতা'র একটি রচনায় এ-বিষয়ে নবনীতা মজা করে অল্প কিছু লিখেছিল।

আজ থেকে প্রায় সিকি শতাব্দী আগে বুধসন্ধ্যার প্রথম যুগে যখন আমাদের সবাই দল বেঁধে নেমেছিল, বুদ্ধদেব গুহ, সমরেশ বসু থেকে পূর্ণেন্দু পত্রী, নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, সাগরময় ঘোষ, সকলেই অভিনয়ে নেমেছিলেন, মায় আমার স্ত্রী মিনতি পর্যন্ত। আমি কিন্তু অভিনয় করতে যাইনি। এ-ব্যাপারে একটা মজার ঘটনা আছে।

যখন জোর কদমে রিহার্সাল চলছিল, আমার ছেলে তাতাই একদিন নবনীতাদের বাড়িতে গেলে নবনীতার মা রাধারানিদেবী তাতাইকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, "তোমার বাবা অভিনয় করছে না?"

তাতাই বলেছিল, "না।"

রাধারানিদেবী প্রশ্ন করলেন, "কেন?"

তাতাই বলেছিল, "বাবা বলেছে, স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়।"

এ-কথা শুনে রাধারানিদেবী নাকি খুব হেসেছিলেন।

এ-সব যা হোক, আত্মকথা এখানে প্রচার করে লাভ নেই। সে আমি ধীরে ধীরে আমার স্মৃতিকথায় লিখছি। এবার ওই থিয়েটারের গল্পই এখন একটা বলা যেতে পারে। এ-গল্প সেই সময়কার যখন হাতিবাগান পাড়ার থিয়েটার হলগুলিতে বছরের বিশেষ বিশেষ দিনে হোল নাইট শো হত। জন্মাষ্টমী, মহালয়া, দোল, রথযাত্রা ইত্যাদি দিনে সন্ধ্যার একটু পর থেকে শো আরম্ভ হয়ে পর পর তিনটি শো হয়ে শেষ রাতে যখন প্রথম ট্রাম ছাড়ত, সেই সময় শো ভাঙত। সাধারণত তিনটে তিনরকম নাটক হত। একটি পৌরাণিক, যেমন 'গঙ্গাবতরণ' বা 'সাবিত্রী সত্যবান' আর এক ঐতিহাসিক, যেমন 'সিরাজদৌল্লা' কিংবা 'বঙ্গে বর্গী'। আর অন্যটি সামাজিক নাটক 'ষোড়শী' বা 'দেবদাস'। বলা বাহুল্য, তিনটি নাটকেরই নায়ক-নায়িকা, গায়ক-গায়িকা, নর্তক-নর্তকী সব প্রায় একই হত। যিনি সন্ধ্যেবেলা শকুন্তলা নাটকে উর্বশীর পার্ট করতেন, তিনিই মধ্যরাতে সিরাজদৌল্লায় আলেয়া এবং অবশেষে শেষ রাতে দেবদাসে চন্দ্রমুখী।

অবশ্য সবদিন পালাগুলি একইভাবে সাজানো হত না। অনেকদিন হয়তো পৌরাণিক

পালা 'শকুন্তলা' প্রথমে এল আর পিছনে চলে গেল সামাজিক দেবদাস।

এইরকম একটি অনুষ্ঠানে তিনটি পালারই নায়ক যিনি ছিলেন তিনি অভিনেতা হিসাবে খুবই বিখ্যাত ছিলেন। কিন্তু মদ্যপানের প্রতি ছিল প্রবল আসক্তি। সেইজন্য তিনটি পালার শেষ পালায় জীবানন্দ বা দেবদাসের মতো মদ্যপ নায়ক চরিত্র রাখা হত যাতে অভিনেতা মাতাল হয়ে গেলেও মানিয়ে যেত।

কিন্তু নতুন ম্যানেজার এসে অনুষ্ঠানে বৈচিত্র্য আনার জন্য পালাগুলি আগে-পিছে করে দিলেন।

থিয়েটার আরম্ভ হওয়ার অল্প কিছুক্ষণ আগে মালিক এসে এইরকম ব্যবস্থা শুনে ম্যানেজারকে খুব ধমকালেন। তিনি বললেন, "এটা কী করেছ? দেবদাস শেষে হবে। না হলে প্রথম পালাতেই মাতাল হয়ে তোমার হিরো পরের নাটকগুলি ডোবাবে। মাতলামি করে গড়াগড়ি খাবে। যত রাত বাড়বে তত মাতলামি বাড়বে।"

ইতিমধ্যে যা সর্বনাশ হওয়ার তা হয়ে গিয়েছে। নায়ক মহোদয় পরবর্তী ব্যবস্থা না জানায়, প্রথমেই দেবদাস হবে এটা জেনে মদে চুরচুর হয়ে এসেছেন। এসে শুনলেন না, প্রথমে দেবদাস নয়, প্রথমে 'শকুন্তলা'।

প্রথম অঙ্ক, প্রথম দৃশ্য। রাজা দুষ্মন্তের ধনুর্বাণ হাতে তপোবনে প্রবেশ। কিন্তু নায়ক তখনই টলছেন। স্খলিত চরণে এক হাতে তীর, এক হাতে ধনুক সামাল দিতে দিতে তিনি মঞ্চে হরিণশিশু খুঁজতে গিয়ে দু'বার মুখ থুবড়ে পড়ে গেলেন।

সেকালের শ্রোতারা কিন্তু ছি ছি করেননি। অবস্থা বুঝে প্রবল হাততালি দিয়ে নায়ককে উৎসাহিত করেছেন।

টলটলায়মান মাতাল দুষ্মন্ত সেদিন মহাকবির বিখ্যাত চরিত্রটিকে একটি নতুন মাত্রা দিয়েছিলেন।

আমি কি ফেল করতে পারতাম না

পরীক্ষার মরশুম শুরু হয়েছে। মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক, জয়েন্ট এন্ট্রান্স—লাইন দিয়ে সব পরীক্ষার দিনগুলি দাঁড়িয়ে আছে। সমস্ত পশ্চিমবঙ্গে এরকম পরীক্ষার্থীর সংখ্যা অন্তত দশলাখ।

এরা সবাই প্রায় টিন-এজার। মোটামুটি ১৫ থেকে ১৯ বছরের মধ্যে বয়স। প্রতি পাড়ায়, বিশেষ করে শহরাঞ্চলে দশ-বিশজন করে পরীক্ষার প্রার্থী, এক-একটি সাধারণ গ্রামেও পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ওইরকম কিংবা তারও বেশি। এলাকার সকলের দৃষ্টি তাদের দিকে। কে ভালো ছাত্র, কে গতবার র‍্যাঙ্ক পেয়েছিল, কে ফেল করেছিল কিংবা আর,

এ. পেয়ে কলঙ্কিত হয়েছিল, ছাত্রছাত্রীরা কিংবা তাদের বাড়ির লোকেরা কিছু বলুক বা না বলুক, সকলেই সব জানে। কিছুই গোপন করার নেই, গোপন করার উপায় নেই।

১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পর এন্ট্রান্স পরীক্ষা চালু হয়। এই এন্ট্রান্সই বিশ শতকের গোড়ায় এসে ম্যাট্রিকুলেশন হয়। এন্ট্রান্স কিন্তু এখনকার জয়েন্ট এন্ট্রান্স নয়, সেটা ছিল শিক্ষাভুবনে প্রবেশের সেকালের প্রবেশিকা পরীক্ষা। অনেক স্বচ্ছ। একালের জয়েন্ট এন্ট্রান্সের মতো কালিমালিপ্ত নয়।

একবার যখন উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা হচ্ছে তখন মার্কশিট দেখে বিজ্ঞান, কারিগরি বা ডাক্তারি বিদ্যার কিংবা অন্য কোনো পেশাগত শিক্ষার প্রার্থী নির্বাচন হতে পারে। ক্ষুদ্র রাজনীতি, ব্যক্তিগত আধিপত্য এবং গোষ্ঠীগত মনোনয়ন এ-ধরনের পরীক্ষায় প্রশ্রয় পায়, পেয়েছে, পাচ্ছে।

ঘাড় গুঁজে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা শেষ করে শ্বাস নেওয়ার আগেই ঘাড়ের উপর এসে পড়ে জয়েন্ট এন্ট্রান্স।

কিছুকাল আগে আমি কোথায় যেন লিখেছিলাম এন্ট্রান্স পাশ মানুষ এখন বোধহয় আর একজনও বেঁচে নেই। লম্বা ঝুলের ফুলশার্ট, মালকোঁচা দিয়ে পরা ধুতি, পায়ে ফিতেওলা অক্সফোর্ড জুতো, ঊনবিংশ শতকের আমাদের সেই নবীন প্রপিতামহ সংসার থেকে কবে নিঃশব্দে নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছেন কেউ খেয়াল করেনি।

আমার ওই লেখাটি বেরোনোর পর দুটি চিঠি পেয়েছিলাম। একটি এসেছিল হাবড়ার অশোকনগর থেকে। সুনীল রায় নামে এক ভদ্রলোক জানিয়েছিলেন, তাঁর বাবার এক পিসেমশাই এখনো বাংলাদেশের ফরিদপুর না মাদাবিপুর কোথায় যেন বেঁচে আছেন। তিনি ১৮৯৯ সালে এন্ট্রান্স পাশ করেছিলেন। তার মানে এই চিঠি যখন পাই, সেই ভদ্রলোকের বয়স একশো পনেরো-বিশ হবে। সেটা খুব অস্বাভাবিক হয়তো নয়।

অশোকনগর আমার পুরোনো চেনা জায়গা। ইচ্ছে হয়েছিল একটু খোঁজখবব নিই। কিন্তু নানা কাজের ভিড়ে সেটা আর হয়ে ওঠেনি।

আর একটি পোস্টকার্ড পেয়েছিলাম। কম্পিত হস্তাক্ষরে লেখা শ্যামবাজারনিবাসী এক বৃদ্ধের। তিনি অবশ্য এন্ট্রান্স পাশ ছিলেন না, তিনি দু'বার এন্ট্রান্স পরীক্ষা দিয়েছিলেন এবং ফেল হয়েছিলেন।

সেকালে এন্ট্রান্স ফেলও গৌরবের বিষয় ছিল। আমাদের দেশের বাড়ির বুড়ো মুহুরিমশাই এন্ট্রান্স ফেল ছিলেন। তিনি অহংকার করতেন, একটা সাবেকি এন্ট্রান্স ফেল একালের তিনটে গ্র্যাজুয়েটের সমান।

সে-রকম কোনও তুলনা নিশ্চয়ই করা যাবে না, কিন্তু এটাও সত্যি যে, তাঁর আইনজ্ঞান ছিল খুবই প্রখর, অনেক তরুণ উকিলকে তাঁর কাছে পরামর্শ নিতে দেখেছি।

পরীক্ষার ব্যাপারে আরও অনেকটা লিখতে হবে। মনের মধ্যে পুরোনো সব গল্প ঘুরে ঘুরে আসছে। এই কিস্তিতে ফেলের গল্পটা বলে রাখি।

পাড়াগাঁয়ের এক ইস্কুলে দুজন শিক্ষক ছিলেন। একজন ইন্টারমিডিয়েট পাশ, অন্যজন বি এ ফেল।

স্কুল কমিটি বাৎসরিক মিটিং-এ প্রথম জনকে দু'টাকা এবং দ্বিতীয় জনকে পাঁচ টাকা বাৎসরিক ইনক্রিমেন্ট দিলেন।

প্রথম ব্যক্তি স্কুল কমিটির সম্পাদককে প্রশ্ন করলেন, "এ-রকম হল কেন"?

সম্পাদক বললেন, "আপনি আই এ পাশ, আর ও বি এ ফেল। তাই ওকে একটু বেশি ইনক্রিমেন্ট দেওয়া হল।"

প্রত্যুত্তরে সেই মাস্টারমশাই একটি যুগান্তকারী প্রশ্ন করেছিলেন, "সেক্রেটারি সাহেব, পরীক্ষা দিলে আমি কি বি এ-টা ফেলও করতে পারতাম না?"

"রুটি নয়, কেক দিন"

"আপনার এ কী হাল হয়েছে? এতকাল দেখলাম গলা-পচা, ফেলে দেওয়া জিনিস কুড়িয়ে আপনি চমৎকার ব্যঞ্জন বানান। আপনিই তো সেই খবরের কাগজের কুচি দিয়ে মৌরলা মাছের শুকনো ঝাল বানানোর গল্প বলেছিলেন। আর সেই সে র‍্যাডিশ উইথ মোলাসেস মানে গুড় দিয়ে মুলো মেখে ডেজার্ট তৈরির কথা বলেছিলেন কাণ্ডজ্ঞানে, সে তো ঘরে ঘরে খাওয়ার টেবিলে না হোক, পড়ার টেবিলে, ক্লাবে, আড্ডায় কয়েক দশক ধরে জনপ্রিয়।

"কিন্তু এ কী হাল হয়েছে আপনার? এখন যে আর কিছুই গোছাতে পারছেন না। কখনো নুন বেশি হচ্ছে আপনার ব্যঞ্জনে, কখনো কাঁচা থেকে যাচ্ছে তরকারি।..."

শান্তিনিকেতন থেকে নীলাঞ্জনা আমাকে এই পত্রটি পাঠিয়েছেন। হাতের সামনে একটা পুরোনো রসিকতা ফিরে এসেছিল। ভেবেছিলাম একে একটু তেল মশলা দিয়ে ব্যঞ্জন তৈরি করি।

গল্পটা মনে মনে খেলাচ্ছিলাম—ছেলে ইস্কুল থেকে বাড়ি ফিরেছে একটা প্রাইজ নিয়ে। প্রাইজটা দেখে বাবা জিজ্ঞাসা করলেন, "প্রাইজ কীসের?"

ছেলে গর্বিতভাবে বলল, "উত্তর ভালো হওয়ায় ক্লাসের মাস্টারমশাই দিয়েছেন।"

বাবা অবাক। ছেলে এমন কী প্রাইজ পাওয়ার মতো উত্তর দিল! ছেলেকে জিজ্ঞেস করলেন, "কী প্রশ্ন করেছিল?"

ছেলে বলল, "মাস্টারমশাই জিজ্ঞাসা করলেন, বকের পা ক'টা?

বাবা বললেন, "তুই কী বললি?"

ছেলে বলল, "একটা।"

বাবা অবাক হয়ে বললেন, "একটা?"

ছেলে বলল, "চিড়িয়াখানায় যে দেখেছি বক এক পায়ে দাঁড়িয়ে থাকে। মাস্টার-মশাই অবশ্য বলে দিয়েছেন যে বকের পা একটা নয় দুটো। সব পাখির মতোই দুটো।"

বাবা এবার জিজ্ঞাসা করলেন, "তা এরকম মারাত্মক ভুল করা সত্ত্বেও মাস্টারমশাই তোকে প্রাইজ দিলেন কী করে?"

ছেলে বলল, "বাহ্, আমি যে সবচেয়ে কম ভুল বললাম। মাত্র একটা কম বলেছি। অন্যেরা তো চারটে পা বলেছে, ছ'টা পা বলেছে, আটটা পা বলেছে। একজন তো বলেছে বকের কোনো পা নেই, যে দুটোকে পা ভাবা হয় সেটা আসলে হাত।"

এ গল্পটা অবশ্যই আর একটু ছড়িয়ে ছিটিয়ে গুছিয়ে লেখা যায়। কিন্তু এই মুহূর্তে একটা পোস্টকার্ডে একটা গল্প পেলাম। শিলিগুড়ি থেকে এসেছে। পাঠিয়েছেন হাবুল বসাক। অবশ্য বাবুল বসাকও হতে পারে। সইটা এনভাবে করেছেন, প্রথম অক্ষরটি 'হ' না 'ব' বোঝা যাচ্ছে না।

যা হোক, গল্পটি ভালো।

সকালবেলা বাড়িতে ভিখিরি এসেছে। গিন্নিমা যথারীতি বাসি রুটি নিয়ে এসেছেন ভিখিরিকে দেওয়ার জন্য। কিন্তু ভিখিরি সেই রুটি প্রত্যাখ্যান করে বলল, "রুটি নয় মা। আজ আমাকে এক টুকরো কেক দিন।"

গিন্নিমা অবাক! রুটিই জোটে না ভিখিরির, সে আবার কেক চাইছে। গিন্নিমার জিজ্ঞাসাকুল মুখশ্রী দেখে ভিখিরি বলল, "আজ আমার জন্মদিন কিনা, তাই এক টুকরো কেক চাইলাম।"

মহিলার নামে কবিতা

ভুলেই গিয়েছিলাম যে একদা আমার একটা ছদ্মনাম ছিল। বস্তুত, আমি আমার হাস্যকর লেখক-জীবনে ধারাবাহিক সরস গদ্য রচনা আরম্ভ করেছিলাম 'নক্ষত্র রায়' ছদ্মনামে।

চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ বছর হয়ে গেল তখন যুগান্তর, অমৃতবাজাব হাউস থেকে 'অমৃত' নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা বেরোত আনন্দবাজারের 'দেশ'-এর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে। ওখানেই সম্পাদনা করতেন কবি মণীন্দ্র রায়। অবশ্য সম্পাদক হিসাবে নাম ছাপা হত প্রবীণ সাংবাদিক তুষারকান্তি ঘোষের। তিনি নিজে কিছু দেখতেন না, তবে মালিকদের একজন ছিলেন। সেই সময় আমি ভাবিনি যে আমি সপ্তাহের পর সপ্তাহ রম্যরচনা লিখে যেতে পারব। এখন তো পড়ন্ত বয়সে পিছনের দিকে তাকিয়ে দেখছি দীর্ঘ সাড়ে চার দশক হতে চলল শুধু সপ্তাহের পর সপ্তাহ নয়, মাসের পর মাস, বছরেব পর

বছর চোখের সামনে দিয়ে চলে গেল। কত লোকের কত কী হল, আমি এখনও সেই হাসির লেখা লিখে যাচ্ছি।

কী কুক্ষণে 'অমৃত' এবং 'দেশ' পত্রিকায় আমি দুটো হাসির গল্প পাঠিয়েছিলাম, সে দুটো ছাপা হয়েছিল; সেই সুবাদে মণীন্দ্র রায় আমাকে দিয়ে প্রায় জোর করেই ধারাবাহিক রসরচনা আরম্ভ করিয়েছিলেন। সেই ধারাবাহিক রসরচনার নাম ছিল 'অদ্বিতীয়'। অদ্বিতীয় যথেষ্ট জনপ্রিয় হয়েছিল, কিন্তু কোনোদিন বই হয়ে বেরোয়নি। সেই সময় প্রকাশকরা হালকা লেখার বই বিক্রি হবে এমন ভরসা করতেন না। এমনকী, গল্পের বই ছাপতে পর্যন্ত দ্বিধা ছিল। আজকাল তো সমস্ত কিছু ওলট-পালট হয়ে গিয়েছে। এখন ক্রেতা হাসির বইয়ের। বইমেলায় তাই নিয়ে ভিড়, হাতাহাতি। আমার সেই অদ্বিতীয় ধারাবাহিক কিন্তু স্বনামে প্রকাশিত হয়নি। সেখানে ছদ্মনাম দেওয়া হয়েছিল 'নক্ষত্র রায়'।

নক্ষত্র রায়কে ভুলেই গিয়েছিলাম। মনে করিয়ে দিলেন অবনী নাগ। তিনি 'বাংলা সাহিত্যে ছদ্মনামের চলন্তিকা' নামে একটি বই লিখেছেন। সেই বইয়ের আরও একশো ছাপান্নটি ছদ্মনামের সঙ্গে নক্ষত্র রায়কেও পেলাম।

রম্য প্রবন্ধকার ইন্দ্রজিৎ তাঁর ছদ্মনাম বিষয়ক নিবন্ধে লিখেছিলেন, "পাতা ঢাকা ফুল এবং ঘোমটা আঁটা মুখের প্রতি যেমন স্বভাবতই কৌতূহলটা বেশি হয়, চাপা দেওয়া নামও তেমনই অতি সহজে মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। কাজেই আপাত দৃষ্টিতে ছদ্মনামটা যদিও আত্মগোপনের চেষ্টা বলে মনে হয়, আসলে ওটা আত্মপ্রকাশের কৌশল।"

আমার ক্ষেত্রে এ-কৌশলে যে খুব কাজ হয়েছিল তা বলতে পারি না, না হলে এক বৎসরের মধ্যে স্বনামে ফিরে আসতাম না। অবশ্য পত্রনবিশ ছদ্মনামে রমাপদ চৌধুরী লিখেছিলেন, 'বিখ্যাত হয়ে ওঠার সবচেয়ে শর্টকাট রাস্তা হল ছদ্মনাম গ্রহণ করা। ছদ্মনাম সম্পর্কে পাঠককুলের স্বাভাবিক ঔৎসুক্য আছে, আর ঔৎসুক্য জাগাতে পারলেই লেখকের থ্রি-কোয়ার্টার সাফল্য।"

শ্রীযুক্ত অবনী নাগকে ধন্যবাদ। দূর বাঁকুড়া শহরে বসে তিনি অত্যন্ত যত্নের সঙ্গে ছদ্মনামের দীর্ঘ তালিকা প্রণয়ন করেছেন এবং ছদ্মনাম বিষয়ে বাংলা সাহিত্যের উল্লেখ-যোগ্য প্রবন্ধগুলি মোটামুটি বিশ্লেষণ করেছেন।

অবশেষে ছদ্মনাম বিষয়ে অচিন্ত্যকুমারের একটি স্বীকারোক্তি স্মরণ করি। তখন অচিন্ত্যকুমার নবীন যুবক। ফার্স্ট ইয়ারের ছাত্র। 'প্রবাসী'তে কবিতা পাঠান আর ফেরত আসে। অবশেষে তিনি একটি সদ্য ফেরত পাওয়া কবিতা নীহারিকাদেবী নামে পাঠাতেই পত্রপাঠ মনোনীত হয়ে গেল।

বউ সিগারেট খায় না

তামাকের বিরুদ্ধে বিশ্বসংসার জেহাদ ঘোষণা করেছে। রাষ্ট্র, রাষ্ট্রপুঞ্জ-সরকারি-বেসরকারি-প্রতিষ্ঠান এমনকী সাধারণ মানুষ তামাককে বিষতুল্য বর্জন করতে ক্রমাগত প্রচার চালিয়ে যাচ্ছে। এই প্রচার যাদের বিরুদ্ধে তারা অনেকেই প্রচারে লিপ্ত।

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যে চিহ্নিত অচিহ্নিত, প্রয়োজনীয়-অপ্রয়োজনীয় প্রায় সর্বত্র ধূমপান নিষিদ্ধ হয়েছে। বাসে, ট্রামে, সিনেমায় সেই কবে ধূমপান নিষিদ্ধ হয়েছিল। এখন তো অফিস-কাছারি মাঠ-ময়দান এমনকী হোটেল রেস্টুরেন্টেও ধূমপান নিষিদ্ধ হতে চলেছে অথচ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী খ্যাতনামা ধূমপায়ী।

প্রশাসনের কর্তাব্যক্তিরা অনেকেই আকৈশোর ধূম্ররসিক, এরা কি সবাই ধূমপান ছেড়ে দিলেন? সেটা কি সম্ভব। সেই ইংরেজি গল্পটা মনে পড়ছে। যেখানে এক ব্যক্তি দম্ভ করে বলছেন, সিগারেট খাওয়া ছাড়া খুব সহজ, তিনি নিজে অন্তত পনেরোবার সিগারেট খাওয়া ছেড়েছেন।

সত্যি প্রচণ্ড মনের জোর না থাকলে যে-কোনো খারাপ অভ্যেসের মতো ধূমপান ছাড়াও খুব কঠিন। কিন্তু প্রচারযন্ত্র এমন একটি বক্তব্য তৈরি করেছে মানুষের মগজের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়েছে যে ধূমপান এডস কিংবা আল কায়েদার মতো ভয়াবহ। একুশ শতকের এই প্রথম দশকে এসে অনাহার ও মহামারি হল মানবসমাজের প্রধান মারণ ব্যাধি।

এর অনেক পরে আসে হৃদরোগ এবং ক্যানসার। অবশ্য ধূমপানের বিরুদ্ধে প্রচারে হৃদরোগ এবং ক্যানসারকে প্রচণ্ড গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

কিন্তু কেন? আমি ব্যক্তিগতভাবে এমন বহু জনকে জানি, বিশেষ করে মহিলা যাঁরা জীবনে কখনও ধূমপান করেননি অথচ হার্টের অসুখে এবং ক্যানসারে ভুগছেন এবং মারা গিয়েছেন। বলাবাহুল্য এ বিষয়ে আমার কোনো জ্ঞান বা শিক্ষা নেই, একজন সাধারণ মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে এই প্রশ্ন ও আলোচনার জন্ম।

মাত্র কয়েক দশক আগেও দেখেছি পক্বকেশ অশীতিপর বৃদ্ধ ইজিচেয়ারে পরম আরামে শুয়ে গড়গড়ার নল টানছেন। সারাবেলা ধরেই টানছেন। অম্বুরি তামাকের সু-মধুর সৌরভে পুরো এলাকা প্লাবিত হয়ে আছে। সেই সৌরভ এতদিন পরে স্মৃতি সৌরভে পরিণত হয়েছে।

সৌরভ শুধু অম্বুরি তামাক কেন, আমার দাদা, যখন প্রথম সিগারেট খেতে শিখল একটা কাঁচি সিগারেট বাড়ির পিছনে ধুতরোর ঝোপে লুকিয়ে টানছিল। দু একটান দেওয়ার পর পুরো পাড়া আমোদিত হয়ে গেল কাঁচি সিগারেটের সুমধুর গন্ধে। পাড়ায়

হইচই পড়ে গেল কে সিগারেট খাচ্ছে। অবিলম্বে দাদা ধরা পড়ল, মার খেল।

সিগারেটের গন্ধ সাংঘাতিক। কিছুতেই মুখ থেকে যায় না। ছোটোবেলায় এর ওর পরামর্শ মতো গুড় দিয়ে দাঁত মেজেছি, পেয়ারা পাতা চিবিয়েছি যাতে শিক্ষক ও অভিভাবকরা মুখের গন্ধ টের না পায়। যাদের টের পাওয়ার ঠিকই পেতেন। স্কুলের টিফিনের পরেই ছিল সংস্কৃত ক্লাস, একবার, সেই প্রথমবার টিফিনে জলপান এবং ধূমপান করার পর পেয়ারা পাতা চিবুতে চিবুতে ক্লাসে ঢুকেছি সেকেন্ড পণ্ডিতমশাই কোনো কিছু জিজ্ঞাসা না করে দুই গালে দুটো চড় দিয়ে পুরো পিরিয়ডটা কান ধরে দরজার চৌকাঠের উপর দাঁড় করিয়ে দিলেন।

তবে মুখে তামাকের গন্ধের একটা জটিল গল্প এই মুহূর্তে মনে পড়ছে—

নতুন বিয়ের পর একদিন গঙ্গারাম এল। তখনও সে আমাকে স্যার বলে, (তারাপদদা হইনি)।

এসে বলল তার একটা মহা সমস্যা দেখা দিয়েছে। আমি বললাম, কী সমস্যা? গঙ্গারাম বলল, আপনাকে কী বলব খুবই লজ্জার কথা। বলে আরও ইতস্তত করতে লাগল—তারপর বলল, বউ-এর ব্যাপার এটা। আমি বললাম, বলে ফ্যালো, মনের মধ্যে প্রশ্ন রেখে দিয়ো না। গঙ্গারাম বলল—এক একদিন বউ-এর মুখে খুব সিগারেটের গন্ধ পাই। আমি বললাম, আজকালকার মেয়েরা অনেকে লুকিয়ে চুরিয়ে সিগারেট খায়। শুনে গঙ্গারাম বলল, আপনার কথা আমিও ভেবেছিলাম, কিন্তু স্যার আমি খোঁজ নিয়ে দেখলাম বউ সিগারেট খায় না।

ট্রাক দেখলে ফিক করে হাসে

বরোদা নামটা কবে ভাদোদরা হয়ে গিয়েছে খেয়াল করিনি। সম্প্রতি ভাদোদরা নিবাসিনী আমার পুরোনো দিনের এক বান্ধবী আমাকে একটা চিঠি পাঠিয়েছে। ওই চিঠির সঙ্গে সে অনেকগুলো ইংরেজি কাটিং পাঠিয়েছে।

আমার যে ঠাট্টা-ইয়ার্কি করে কিছুটা লাভ হয়েছে, আমার যে লেখাপত্র কাগজে কাগজে ছাপা হয়, আমার যে দু'চারটে বই-বাজারে বিক্রি হয়, এ খবর সে রাখে। এবার সে আমার উপকার করতে চায়।

আমাদের নবযৌবনে যখন সবকিছু নিয়েই হাসাহাসি করে কাটাতাম, আমার এই বান্ধবীটি সেই যুগের। কেউ ছিল প্রচণ্ড সুরসিকা। মাসির গোঁফ গজালে কী হবে শিবরাম চক্রবর্তীর এই জটিল প্রশ্নের জবাব বোধহয় তার কাছেই শুনেছিলাম, গোঁফ গজালে মাসি মামা হবে। সেই বান্ধবীটি বিয়ে হয়ে সেই যে গুজরাতে চলে গেল

তারপর দু'চার বছর পর পর দু'চার দিনের জন্যে কলকাতায় এসেছে, তবে কদাচিৎ আমার সঙ্গে দেখা হয়েছে। বৎসরান্তে বড়দিনের শুভেচ্ছা কিম্বা বিজয়ার ভালোবাসা জানিয়ে এখনও সে চিঠি লেখে, কিন্তু এবারে যে চিঠিটা সে লিখেছে সেটা মামুলি গ্রিটিংস নয়। বেশ মোটা এবং উপকারী চিঠি।

কয়েক দশক আগে বরোদা (ভাদোদরা) থেকে গুজরাতি ভাষায় একটি হালকা হাসির কাগজ বেরোত। সমস্ত হাসির কাগজের যা পরিণতি হয়, এই কাগজটিরও তাই হয়েছিল, নিঃশব্দে উঠে গিয়েছিল।

কাগজটির নাম ছিল বোধহয় 'হাসিখুশি সারা মাস'। কাগজটির দু'চারটি বোদ্ধা পাঠক ছিল। কিন্তু তাতে কাগজ চলে না। কিছু বিজ্ঞাপন চাই, কিছু বিক্রি চাই। ছাপাখানা, কাগজওলা, লেখক সবাইকে টাকা দিতে হবে, দু-চার বছর টেনে চালাতে পারলে কিছু হতে পারে না হলে কিছু নয়।

সে যাই হোক, এতদিন পরে গুজরাতি পাঠকদের সেই কাগজটার জন্যে একটু মায়া হয়েছে। কাগজটির কিছু কিছু বাছাই অংশ ইংরেজি ভাষায় অনুবাদিত হয়ে একটি সংকলনও প্রকাশিত হয়েছে। সেই সংকলন থেকেই বাছাই কিছু অংশ আমার উপকারের জন্য অর্থাৎ চুরি করে ব্যবহার করার জন্য প্রিয় বান্ধবী পাঠিয়েছেন। সবচেয়ে মজা লাগল এই কাগজটির দু'একটি প্রচ্ছদের নমুনা দেখে। একটি প্রচ্ছদে বড় বড় করে লেখা ছিল :

"যদি কেউ আপনাকে ফোন করে আপনার ফোন নম্বর জানতে চান তাকে আমাদের কাগজের গ্রাহক হতে বলুন।"

বলাবাহুল্য এই পরামর্শটি সুদূরপ্রসারী। অনুরূপ আরেকটি প্রচ্ছদ নির্দেশ, "যদি কোথাও কাউকে দেখেন জলে ডুবিয়ে তাজা মাছ মারার চেষ্টা করছে তাকে অবশ্যই আমাদের কাগজের গ্রাহক করে দেবেন।" (এখানে আমার বান্ধবী একটি মন্তব্য যোগ করেছেন। তিনি লিখেছেন, স্বয়ং মহাত্মা গান্ধি নাকি এই প্রচ্ছদ-নির্দেশটি পাঠ করে পুলকিত হয়েছিলেন।)

এই কাগজেই একটি আশ্চর্য কার্টুন ছিল। এক পরীক্ষার হলের বাইরে দুই পরীক্ষার্থীর কথোপকথন। প্রথম পরীক্ষার্থী : কীরে, কেমন পরীক্ষা দিলি?

দ্বিতীয় পরীক্ষার্থী : আর পরীক্ষা! সাদা খাতা জমা দিয়েছি।

প্রথম পরীক্ষার্থী : আমিও তো সাদা খাতা জমা দিলাম।

দ্বিতীয় পরীক্ষার্থী : সর্বনাশ! এবার আমাদের দুজনকেই টুকবার দায়ে ধরবে।

এরপরে একটি ক্ষৌরকারের কাহিনি।

এক খদ্দেরের দাড়ি কামিয়ে সে রক্তারক্তি করে দিয়েছে।

খদ্দের বলছেন, "আমি বললাম তোমাকে দাড়ি কামাতে, তুমি আমার গালের মাংস কেটে রক্তারক্তি করে দিয়েছ।"

ক্ষৌরকারের নির্লিপ্ত উত্তর, "ঠিক আছে, আপনাকে মাংসের দাম দিতে হবে না. শুধু দাড়ি কামানোর পয়সা দিন।"

পুনশ্চ : বাঙালিরা অনেক সময় ফিক করে হাসে। গুজরাতিরাও কি তাই? কি জানি। এই চিঠিতেই একটি উদ্ধৃতাংশ পেলাম, যেখানে লেখা আছে, 'ট্রাক দেখলেই যে ফিক করে হাসে, সে হল ট্রাফিক পুলিশ।'

বিয়ে হয় নিজেদের মধ্যে

মধ্য কলকাতার এক খানদানি শরাবখানার সামনে সেদিন এক বিখ্যাত মাতালকে দেখা গিয়েছিল ফুটপাতে শুয়ে পার্শ্বশায়িতা এক গাভির লেজ ধরে অনুযোগ করছিলেন, "ও চাঁদুর মা, তুমি প্রতিদিন রাত্রে শোওয়ার সময় দুটো বেণি কর, আজ এক বিনুনি করেছ কেন?"

তেজস্বিনী গাভি চাঁদুর বাবার এই মাতলামি বেশিক্ষণ সহ্য করতে পারেনি। সে নিঃশব্দে ফুটপাত ছেড়ে উঠে চলে যায়।

মদ, মাতাল ও মাতলামি নিয়ে কত গল্পই যে লিখেছি, পড়েছি, শুনেছি এবং বলেছি তার হিসেব হবে না। কয়েক বছর আগে মাতালদের উপর একটা বই-ই লিখে ফেলেছিলাম, কিন্তু তার পরেও আরও কত মাতাল যে এল গেল কলমে তার ইয়ত্তা নেই।

সবরকম গল্পেরই একটা পৌনঃপুনিকতা আছে, একঘেয়েমি আছে, কিন্তু মাতালের ভালো গল্প সে কখনো অচল হয় না। তার আকর্ষণ আলাদা। ক্লাবের টেবিলে দেখেছি অত্যন্ত সুধী ও পণ্ডিতজনেরা একই মাতালের গান নিয়ে জমে রয়েছেন দিনের পর দিন। যদি কেউ ভুল করে ওই টেবিলে বসে পড়ে তা হলে তাকে শুনতে হয় সেই একই গল্প, "জানেন তো, হরেন উকিল রাত্রে ক্লাব থেকে বাড়ি ফেরার সময় সিঁড়ি ভেবে বাড়ির সামনের ল্যাম্পপোস্ট বেয়ে উঠে গিয়েছিলেন।"

এসব গল্প নয়। সম্প্রতি মদের বাজারে কয়েকটি নতুন গল্প চালু হয়েছে।

শিয়ালদহ-বারাসত লাইনের দুজন নিত্যযাত্রী শিয়ালদহ স্টেশনের সামনে এক গোপন পানশালায় নিয়মিত মদ্যপান করেন। তার পর ঠিক সময়ে উঠে ছুটতে ছুটতে গিয়ে ট্রেন ধরেন।

সেদিন হয়েছে কী, দুজনেই এক পাত্র করে বেশি খেয়ে ফেলেছেন। তার পরে ছুট দিয়েছেন স্টেশনের দিকে।

সাড়ে ন'টার ট্রেন। প্রথমজন নিজের ঘড়িতে দেখলেন নটা পঁচিশ হয়ে গিয়েছে। তিনি প্রায় দৌড় শুরু করেছেন।

দ্বিতীয়জন জিজ্ঞাসা করল, "এত তাড়াহুড়ো কিসের?"

প্রথমজন বলল, "ঘড়িতে দেখছি সাড়ে নটা হতে আর চার পাঁচ মিনিট বাকি।"

এবার দ্বিতীয়জন নিজের ঘড়ি দেখে বলল, "তা হলে আপনি ছুটুন। আমার ঘড়িতে সোয়া নটা, আমি আস্তে আস্তে আসছি।"

সবচেয়ে বড় সমস্যা অনেক সময় মাতালেরা রচনা করে।

সেদিন এক ডাক্তারবাবু আমাকে বললেন, তার এক মাতাল রোগিণী তাঁর কাছে অভিযোগ নিয়ে এসেছেন, "আমি মাঝে মধ্যেই অন্য লোকের কথা শুনতে পাই। কিন্তু তাদের দেখতে পাই না।"

ডাক্তারবাবু বললেন, "সে কী! কখন এরকম হয়?"

রোগিণীর হাতব্যাগের মধ্যে ছোটো মদের পাঁইট ছিল। সেটা থেকে এক চুমুক খেয়ে খুব গম্ভীরভাবে বললেন, "সব সময়ই কী আর হয়, শুধু যখন ফোনে কথা বলি তখন।"

আর একটি মাতালের কথা বলতে হবে। তার প্রেমিকা জিজ্ঞাসা করেছে, 'তুমি আমাকে বিয়ে করবে কি না?"

প্রেমে এবং নেশায় গদগদ মাতাল বলল, "দ্যাখো, আমাদের বাড়িতে সব নিজেদের মধ্যে বিয়ে, ঠাকুরদার সঙ্গে ঠাকুমার, বাবার সঙ্গে মার, কাকার সঙ্গে কাকিমার, আমি তোমাকে কী করে বিয়ে করি বলো তো?"

কলকাতা ছাড়তে হচ্ছে না

'মানিকবাবু আবার একটি সিগারেট ধরালেন। ধোঁয়া ছেড়ে বললেন, "আলমারিতে আমার সব বই বোধহয় নেই। কিছুটা হয়তো আছে। আমি জানি বেশিরভাগ বই-ই ফেলে দিতে হবে। পয়সার জন্যে অনেক লেখাই আমাকে লিখতে হয়েছে। সে সবের কোনো মূল্য নেই। কিন্তু উপরের তাকটার দিকে তাকিয়ে দেখুন—সেখানে এমন কিছু বই আছে যা দিয়ে আপনার বউদি তাঁর ছেলে-মেয়েদের মানুষ করতে পারবেন।" এটুকু বলে মানিকবাবু চুপ করলেন।'

অবিশ্বাস্য!

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো আত্মাভিমানী লেখকের মুখে এরকম কথা যেন শোভা পায় না। চির অশান্ত, বেপরোয়া ও অসংসারী মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মুখে এরকম উক্তি কেমন বেমানান।

কিন্তু আমরা এও তো জানি, কখনো কখনো বিরল ব্যক্তিগত মুহূর্তে মানুষ কত দুর্বল হয়ে পড়ে, কত অসহায়ভাবে কথা বলে!

প্রসূন বসুর 'কৃতীজনের সান্নিধ্যে' পড়ছিলাম। প্রসূনবাবু পুরোনো দিনের কমিউনিস্ট। যুক্তফ্রন্ট, বামফ্রন্টের আগের যুগ থেকে, পাঁচের, ছয়ের দশকে প্রগতি সাহিত্যের সুবর্ণযুগে প্রসূনবাবু সাহিত্য ও সংস্কৃতি আন্দোলনের সঙ্গে নিগূঢ়ভাবে যুক্ত ছিলেন। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, সুভাষ মুখোপাধ্যায় থেকে দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সোমনাথ লাহিড়ী সকলের সঙ্গেই ছিল তাঁর ঘনিষ্ঠতা। তাঁর সম্পাদিত 'আগামী' পত্রিকা ওই সময়ের বাংলা শিশু সাহিত্যেব প্রামাণ্য দলিল।

প্রসূন বসুর কথা থাক। তিনি আমার বন্ধুমানুষ। তাঁর প্রশংসা বেশি করা উচিত হবে না। বরং তিনি যাঁদের কথা বলেছেন তাঁদের প্রসঙ্গে আসি।

সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের আলোচনা সূত্রে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতার প্রসঙ্গ এসেছে।

প্রসূন বসু লিখছেন,

'সুভাষদা... একটি কথাই বলতেন, সাহিত্যের ক্ষেত্রে কোনো সমঝোতা চলে না।'

সেই সুভাষদার ওপর বর্ষিত হয়েছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতাব বোঝা। অনেক বোঝার সামনে মুখোমুখি মানুষটি আজ কবিতার বোঝায় বিধ্বস্ত।

কিছুকাল পরে সুভাষদার কাছে গিয়ে অবশ্য দেখলাম তিনি খুব হালকা এবং মুক্ত। একগাল হেসে আমাকে বললেন, "খুব বেঁচে গিয়েছি। আমার প্রিয় কলকাতা আর আমাকে ছাড়তে হচ্ছে না। মমতা তার কবিতার পাণ্ডুলিপি ফেরত নিয়ে গিয়েছে, গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হচ্ছে।" সুভাষদার চরিত্রের সঙ্গে ব্যাপারটা কেমন যেন বেমানান।'

গত শতকের মধ্যভাগে বামপন্থী তথা প্রগতিশীল সব লেখক এবং সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্বের কথা প্রসূন বসু বলেছেন। গালাগাল নয়, রাগ নয়, কিন্তু কোনো কিছু রেখেঢেকে লেখেননি।

তবে শুধুই তথাকথিত প্রগতিশীল ব্যক্তিরাই নন, শিবরাম চক্রবর্তী এবং সত্যজিৎ রায়ের মতো ব্যক্তিত্বের কথা, তাঁদের সম্পর্কে তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা যত্ন করে লিখেছেন। দু-একটি উদ্ধৃতি পাঠকদের উপহার দিচ্ছি। 'শিবরাম চক্রবর্তী ছিলেন সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ধরনের মানুষ। নিজের কথা তাঁর মুখ থেকে জানা ছিল অসম্ভব। বাংলা সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ তাঁর আত্মজীবনী 'ঈশ্বর পৃথিবী ভালোবাসা' এবং 'ভালোবাসা পৃথিবী ঈশ্বর' যাঁবা পড়েছেন তাঁরা জানেন তিনি সকলের কথাই বলেছেন, কেবল নিজের কথা ছাড়া। নিজের কথা বাধ্য হয়ে ততটুকুই বলেছেন যতটুকু না বললে অন্যের কথা বলা যায় না। তাঁর সামনে তাঁর লেখার প্রশংসা করতে গেলেই তিনি অন্য লেখককে টেনে এনে তাঁকেই বড় লেখক হিসেবে প্রতিপন্ন করবেনই। নিজের সম্বন্ধে এমন নির্লিপ্ত মানুষ বোধহয় পৃথিবীতে মেলে না। জীবনটা তাঁর কাছে ছিল একটি খেলা। কোনো দুঃখ নেই, কোনো বিষণ্ণতা নেই, কোনো ব্যথা নেই। কোনো বেদনা নেই—সব কিছুই যেন মজা, জীবনটা যেন মজা।' আবার ছোটোদের প্রতি তাঁর দায়বদ্ধতার কথা বলতে গিয়ে সত্যজিৎ রায় প্রসূনবাবুকে বলেছিলেন, 'আমার নিশ্চয়ই

একটা দায়বদ্ধতা আছে। সে দায়বদ্ধতা পরের প্রজন্মের প্রতি, আজ যারা ছোটো তাদের প্রতি। সে কারণেই বেশি বয়সে আমি কলম ধরেছি। 'সন্দেশ' পত্রিকা নিয়ে এত লড়াই করে চলেছি।'

সাহিত্য পুরস্কারের, বিশেষত আকাদেমি পুরস্কারের অনেক নেপথ্য কাহিনি প্রসূন বসু বিবৃত করেছেন। রঙ্গমঞ্চের 'উইংস'-এ বসে অনেক নাটকীয়তার তিনি সাক্ষী। এক কথায় বলা চলে ভয়াবহ ব্যাপার।

কিন্তু এই স্মৃতিকথনে প্রসূনবাবুর কোনো উদ্দেশ্য আছে তা মনে হয় না। তিনি যা দেখেছেন, তাই লিখেছেন। রীতিমতো শ্রদ্ধা সহকারে লিখেছেন। তবু বলি, সাধারণ সাহিত্য অনুরাগীর এসব না জানলেও চলবে।

পুরস্কার প্রদানের ক্ষেত্রে কতরকম দড়ি টানাটানির ক্ষমতাবাজি হয় প্রসূনবাবু অকপটে বিনা উদ্দেশ্যে সেসব লিখেছেন। বইয়ের বিভিন্ন জায়গায় এসব তথ্য আলোচিত হয়েছে। পড়ে যেমন হাসি পায়, তেমনি দুঃখও হয়।

রং নাম্বার

আমার মহাগুরু কানাডাদেশীয় সুরসিক লেখক স্টিফান লিকক বলেছিলেন ফোন কোম্পানির এক পাগল ব্যক্তির কথা।

আজকাল কেউ আর বিশেষ লিকক সাহেবের নাম জানেন না, তাঁর বই তো দূরের কথা। এ শুধু আমাদের দেশে নয়, বিদেশেও দেখেছি, বিশেষ করে ইংরেজি ভাষী মার্কিন দেশে স্টিফান লিককের কথা বিশেষ কেউ বলেন না, জানেনই না।

একালের পাঠক এখনো পর্যন্ত মার্ক টোয়েন কিংবা পি জি ওডহাউসকে হাসির লেখায় ধর্তব্যের মধ্যে আনেন। আসলে একালে কোনো হাসির লেখাই বোধহয় ধর্তব্যের মধ্যে নয়। জেরোম কে জেরোম কিংবা জেমস থার্বার-এর মতো সরস রচনাকারকে কেই বা মনে রাখছে। আমাদের দেশের মতোই অবস্থা। পরশুরাম কিংবা শিবরাম চক্রবর্তীকে নিয়ে কিংবা পিতামহ ত্রৈলোক্যনাথকে নিয়ে আমরা একটি সংখ্যালঘু গোষ্ঠী যা একটু মাতামাতি করি; বাকিরা প্রায় সকলেই কেমন যেন শীতল।

স্টিফান লিককের ফোন কোম্পানির পাগলা সাহেবের গল্পটা বলতে গিয়ে কক্ষচ্যুত হয়েছিলাম।

গল্পটা বলি।

স্টিফান লিককের ধারণা হয়েছিল নিউইয়র্ক শহরের টেলিফোনের অধিকর্তা কোনো উন্মাদ বা অর্ধ উন্মাদ। নিরীহ গ্রাহকদের সঙ্গে নানারকম খেলা করায় তাঁর আনন্দ।

ভদ্রলোক হঠাৎ একদিন ঠিক করলেন শহরের দক্ষিণাঞ্চলের সব টেলিফোনের নম্বর দু'ঘর বাড়িয়ে দেবেন। এবং উত্তরাঞ্চলের সব টেলিফোনের নম্বর চারঘর উলটিয়ে দেবেন।

এইভাবে পূর্ব ও পশ্চিমাঞ্চলের কোথাও ফোন নম্বরের সামনে বা পিছনে ২ যোগ করে কিম্বা ১৭ বিয়োগ করে তিনি রাতারাতি বিনা নোটিশে এবং বিনা কারণে সমস্ত শহরের সব ফোন নম্বর বদলে দিতেন।

গ্রাহকরা প্রথমে বুঝতেই পারত না কী হয়েছে। দু' একদিনের মাথায় শহরের সংবাদপত্রে খুব ক্ষুদ্র একটি নোটিশ বেরোত টেলিফোন কোম্পানির নম্বর পরিবর্তনের কর্মসূচি জানিয়ে।

এরকম বছরের পর বছর চলেছে। লোকের চিঠির প্যাড, ভিজিটিং কার্ড বারবার ছাপাতে হয়েছে।

'রং-নাম্বার বারে বারে
উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে।'

কবে সেই তিরিশ বছর আগে, প্রচলিত প্রবাদবাক্যের সঙ্গে একটি পঙ্‌ক্তি ব্যবহার করে এই ছড়াটি আমি প্রণয়ন করেছিলাম। সেটা ছিল রং নাম্বারের যুগ। কত রকম যে রং নাম্বার আসত তার কোনো মাথামুণ্ডু নেই।

কেন কীভাবে আমাদের লাইনের মধ্যে ঢুকে যেত! তখন ঘরে ঘরে রং নাম্বার। কোনো কার্যকারণ নেই, যোগাযোগ নেই।

অবশ্য যোগাযোগ নেই এই কথাটা স্পষ্ট বলা যায় না। কারণ, কয়েকবার দেখেছি "দাদা, এটা কি মাড়োয়ারি হাসপাতাল?" তারপরেই "ইয়ে ইসলামিয়া হাসপাতাল হ্যায়?"

শেষের দিকে গোলমালটা খুব একটা ছিল না। টেলিফোন-ব্যবস্থা প্রায় সুস্থির হয়ে এসেছিল। কিন্তু ৬ সংখ্যার নাম্বার ৭ হল। তারপরে সব নাম্বার দু'নম্বরি হয়ে ৮ হয়ে গেল।

সল্টলেকে এসে আর একটা জটিল সমস্যার মধ্যে পড়তে হয়েছিল। কয়েকবার এক্সচেঞ্জ বদল হল। তার মানেই আবার নম্বর বদল। এখন অবশ্য কিঞ্চিৎ স্থিতাবস্থা চলছে। তবে দু'একটা ধারাবাহিক গোলমাল আছে।

রোশনলাল খৈতান নামে এক মাড়োয়ারি ভদ্রলোক ইচ্ছে করে কিংবা অজ্ঞাতসারে তাঁর ভিজিটিং কার্ডে আমার টেলিফোন নম্বর দিয়েছিলেন। এমন হতে পারে এটা ছাপার ভুল, 'থ্রি', এইট হয়ে গেছে কিংবা 'ওয়ান' 'সেভেন' হয়ে গিয়েছে যা হামেশাই হয়। রাইটিং প্যাডে ঠিকানা-ফোন নম্বর সংশোধন করা যায়, কিন্তু ভিজিটিং কার্ড যাদের দেওয়া হয় তাদের নাগাল পাওয়া কঠিন। ফলে রোশনলাল যখন ধরতে পারেন ভিজিটিং কার্ডে ভুল নম্বর রয়েছে, তাঁর কিছু করার ছিল না। তিনি ওই ভুল নম্বরের জন্য আমাকে ফোন করে ক্ষমা প্রার্থনা করেছিলেন।

আমি অবশ্য ক্ষমা করিনি। আমার ফোনে কেউ রোশনলালকে চাইলেই আমি বলে দিতাম, "রোশনলাল জেলমে হ্যায়, বেল নাহি মিলা।" কিংবা "রোশনলাল ভাগ গিয়া।"

উপকার পেয়েছিলাম। এখন রোশনলালের ফোন আর খুব বেশি আসে না।

এখন ফোন আসে উদয় সেন নামের এক ভদ্রলোকের। তাঁর সম্ভবত ফোন নম্বরে একটা তিন, চার হয়ে গিয়েছিল। এটা অবশ্য গভীর গবেষণা করে আমি বুঝতে পেরেছি।

সে যা-ই হোক, আমাদের বাড়ির সবাইকে শেখানো আছে, কেউ ফোনে উদয় সেনকে চাইলেই সঙ্গে সঙ্গে বলবে,

'উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে।
রং নাম্বার বারে বারে।'

বিনোদবিহারী

বছরের এই কয়েকটা দিন একটু নিজের কাছে পাই। পুজোর লেখা শেষ। সাপ্তাহিক, মাসিক কিস্তিগুলি যা সারা বছর ধরে লিখি তারও অনেক আশ্বিন মাসে বেরোয় না। পুজোসংখ্যার সঙ্গে যুক্ত হয়ে যায়। ফলে আমাকেও কিস্তির জন্য মাথা ঘামাতে হয় না। এই সময়ে একটু বহু প্রার্থিত অবসর। পুজো সংখ্যাগুলো একটু উল্টেপাল্টে দেখি। খুব একটা পড়া-টড়া নয়, সামান্য একটু নাড়াচাড়া। বড় জোর নিজের প্রকাশিত লেখাটায় একটু মন দিয়ে চোখ বোলানো। তারপরেও অঢেল সময়।

কিছুক্ষণ দূরদর্শন, কিছুক্ষণ প্রয়োজনীয়, অপ্রয়োজনীয় দূরভাষ। তারপরেও ফেলে রাখা নতুন পুরোনো বইগুলো দেখাশোনার একটু সময় থেকে যায়।

এইভাবেই কয়েকদিন আগে হাতে উঠে এসেছে বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়ের 'চিত্রকর'। এখনকার চিত্রকর অবশ্য চিত্রকর, কত্তামশাই, কীর্তিকর এবং শিল্পজিজ্ঞাসা- এই চারটি ছোটো বইয়ের সমষ্টি।

বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায় নিজে শুধু চিত্রকর ছিলেন না, অসামান্য গদ্যে তিনি তাঁর স্মৃতিকথা ও আত্মকাহিনি লিখছেন। প্রথমেই বলে নিই, বিনোদবিহারী জন্ম থেকেই প্রায় অন্ধ ছিলেন, তাই অন্য দশজনের মতো সাধারণ বিদ্যালয়ের লেখাপড়া তাঁর হয়নি। কিন্তু শিল্পী হিসাবে তিনি অত্যন্ত উচ্চমানের। শান্তিনিকেতনের কলাভবনের ছাত্র। অবনীন্দ্রনাথের অত্যন্ত প্রিয় শিষ্য। চল্লিশ বছর পার হওয়ার পর তাঁর দৃষ্টিশক্তি ক্রমশ ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর হয়ে আসে। অবশেষে যখন তাঁর ৫২ বছর বয়স, চোখের

অপারেশন করে তিনি সম্পূর্ণ অন্ধ হয়ে যান। কিন্তু তাতে তাঁর শিল্পরচনার ক্ষমতা কমেনি। শান্তিনিকেতনের কলাভবন ও হিন্দিভবনের ফ্রেস্কোগুলিতে তাঁর সৃষ্টির অসামান্য নমুনা রয়েছে। অন্ধ হওয়ার পরেও তিনি ছবি এঁকেছেন। টালি দিয়ে ম্যুরালের কাজ করেছেন। তাঁর প্রধান ভক্তদের একজন ছিলেন সত্যজিৎ রায়, যিনি তাঁকে নিয়ে 'ইনার আই' শীর্ষক একটি প্রামাণিক তথ্যচিত্র নির্মাণ করেছিলেন। এই তথ্যচিত্রটির নামকরণে, বাংলায় যা হতে পারে অন্তর্দৃষ্টি, সত্যজিৎ রায় বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়েছিলেন।

এই প্রসঙ্গগুলি এইভাবে এল তার কারণ তাঁর জন্মশতবার্ষিকী নিঃশব্দে চলে গেল (১৯০৪ থেকে ২০৪৪)। কোথাও তেমন কিছু উদ্যোগ, আয়োজন, সভা হল না।

বিনোদবিহারীর 'চিত্রকর' বইয়ে অবনীন্দ্রনাথ, গগনেন্দ্রনাথ, নন্দলাল এবং রবীন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠ চিত্র পাওয়া যায়। অবনীন্দ্রনাথের কাছে যেদিন প্রথম গিয়েছিলেন, দুটো ছবি নিয়ে গিয়েছিলেন। অবনীন্দ্রনাথ ছবি দুটি দেখলেন। দেখে, প্রথম ছবি হাতে নিয়ে বললেন, "কী হয়েছে?"

বললাম, "বাঁশি বাজাচ্ছে।"

"বাঁশি বাজাচ্ছে, না কলা খাচ্ছে"?

দ্বিতীয় ছবি ছিল ধনুক হাতে ব্যাধ। চারদিকে গাছ। গাছের উপর জোনাকি জ্বলছে।

অবনীন্দ্রনাথ ছবিটি একটু দেখলেন। দেখে বললেন, "রাখো। এইবার এক্সজিবিশনে আমিও একটা ব্যাধের ছবি দেব। দেখি কার ভালো হয়।"

বিনোদবিহারী এক বোহেমিয়ান আর্টিস্টের কথা লিখেছেন। তিনি তৈরি করেছিলেন কাচের উপরে রবীন্দ্রনাথের প্রতিকৃতি। পৃষ্ঠভূমি তারকাখচিত। ছবিতে ছিল নানা রকমের সবুজ। ছবিটি কলাভবনে প্রদর্শিত হয়েছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে হাওয়ায় ছবিটি মাটিতে পড়ে টুকরো হয়ে যায়। এই দুর্ঘটনা যখন বোহেমিয়ান আর্টিস্ট দেখলেন, তিনি বললেন যে, "রবীন্দ্রনাথের প্রাণ বেরিয়ে গেল ছবি থেকে।"

বহু চরিত্র, বহু ঘটনা, শান্তিনিকেতনের প্রথম যুগের জীবন কত সহজে 'চিত্রকর' বইয়ে মাত্র ৭৫ পৃষ্ঠায় বিনোদবিহারী লিখেছিলেন, যে কোনো গদ্যলেখকের পক্ষে তা শিক্ষণীয়।

মা সেলুনে তো খুঁজবেন না

পর পর কয়েক সপ্তাহ অতঃপরের সাদামাঠা ভাবটা নেই। কবিতা থেকে শিবরাম চক্রবর্তী—কতরকম বিষয়ই যে আলোচনা করলাম, কিন্তু অতঃপরের যে সহজ-সরল পরিবেশ, সেই পরিবেশ এ ধরনের কলমবাজিতে থাকে না।

আমরা পুরোনো অতঃপরের পরিবেশে ফিরে আসার চেষ্টা করছি।

ব্যাপারটা আর কিছুই নয়। কাছাকাছি বিষয় নিয়ে কয়েকটা রসিকতা তার সঙ্গে প্রাসঙ্গিক কিছু মন্তব্য সরসভাবে সাজিয়ে দেওয়া। একটা রম্য নিবন্ধে আমার তিনটে 'জোক' লাগে। সেগুলি টাটকা না হলেও ক্ষতি নেই, তবে বহুপ্রচলিত হলে চলবে না। তা ছাড়া অশ্লীল বা রাজনৈতিক রসিকতা আমার আসে না।

সৈয়দ মুজতবা আলির একটা সুবিধা ছিল, তাঁর অসামান্য পাণ্ডিত্যের সঙ্গে অসাধারণ রসবোধ এবং ঝলমলে ভাষায় তাঁকে খুব বেশি রম্যগল্প সংগ্রহ করতে হত না। তবে তিনি যে দু'-একটি রসিকতা পাঠককে উপহার দিতেন সে সবই ছিল অনন্য মাত্রার।

এসব নিয়ে দুঃখ করে লাভ নেই। যে যেমন পারে, সে তেমন লেখে। আমি আমার মতো লিখি। অবশ্য এই মুহূর্তে যেটা লিখতে যাচ্ছি সেটা মোটেই আমার লেখা নয়। যেমন হয়, এদিক ওদিক থেকে পড়ে বা শুনে এই গল্প আমার নিজস্ব ভাষায় নিয়ে এসেছি।

পাড়ার মোড়ে চুল কাটার সেলুনে একটি অল্পবয়েসি কিশোর এসে বসেছিল। কিশোরটির বেশ লম্বালম্বা চুল ঘাড় পর্যন্ত নেমে এসেছে।

অনেকগুলো চেয়ার পরপর খালি হল। অনেকক্ষণ সময় চলে গেল, কিন্তু ছেলেটি আয়নার সামনে চুল কাটার চেয়ারে বসল না।

ক্ষৌরকার ভদ্রলোকের স্বভাবতই কৌতূহল হল। তিনি ছেলেটিকে প্রশ্ন করলেন, "কি খোকা, তুমি চুল কাটবে না।"

খোকা নির্বিকারভাবে উত্তর দিল, "আমি চুল কাটব কেন? আমি তো চুল কাটতে আসিনি।"

এবার ক্ষৌরকার জানতে চাইলেন, "তুমি এখানে কী করছ?"

সে বলল, "আমি মার ভয়ে লুকিয়ে আছি।"

ক্ষৌরকার জানতে চাইলেন, "কেন কী হয়েছে? মা খুঁজছেন কেন?"

ছেলেটি তার মাথার লম্বা চুলে হাত বোলাতে বোলাতে বলল, "আমার এই চুল মা ছোটো করে দিতে চায়। তাই আমি পালিয়েছি। মা যেখানেই খুঁজুক, নিশ্চয়ই কোনো চুল কাটার দোকানে খুঁজতে যাবে না।"

এই গল্পের কিশোরটি বেশ বুদ্ধিমান।

এরপর এক বুদ্ধিমান ব্যক্তির কথা বলি। একটা গর্হিত কারণে তার জেল হয়েছিল। কারণটা হল সে অফিসের বেশ কয়েক হাজার টাকা তছরূপ করেছিল। পুলিশ তাকে ধরতে পেরেছিল কিন্তু টাকাটা উদ্ধার করতে পারেনি।

সে যা হোক, তার বাড়ির পিছনে একটি ফাঁকা জমি ছিল। সেখানে সে প্রত্যেক বছর শীতের সময় আলু চাষ করত।

এবার জেলে যাওয়ার পরে শীতকাল এসে গেল। তার বউ-ছেলে চিঠি লিখল, এবারও আলুর চাষ করবে কি না।

সঙ্গে সঙ্গে সে তার স্ত্রীকে চিঠি লিখে জানাল, সাবধান। বাড়ির পিছনের জমিতে কোনো চাষ করবে না। কোনো খোঁড়াখুঁড়ি করবে না। আমার চুরির সব টাকা প্লাস্টিকের প্যাকেটে করে ওইখানে মাটির নিচে লুকিয়ে রেখেছি।

পুলিশ তো জেলের কয়েদিদের সব চিঠিই পড়ে। এ চিঠিও পড়ে ফেলল। এবং তার ফল হল এই যে, দু'দিনের মধ্যেই কয়েদিটির বাড়ির পিছনের জমিটা আগাগোড়া সমস্ত খুঁড়ে ফেলল। কিন্তু কোথাও টাকা পেল না।

কয়েদির বউ জেলে কয়েদিকে জানাল, পুলিশে এসে সমস্ত মাটি খুঁড়ে ফেলেছে, কিন্তু তোমার টাকা কোথাও থেকে বেরোয়নি।

কয়েদি জানাল, টাকা বেরোবার তো কথা নয়। আমি তো ওখানে মাটির নিচে টাকা রাখিনি। তবে যা হয়েছে ভালো হয়েছে। এখন ওই খোঁড়া মাটিতে আলু লাগিয়ে ফ্যাল। খুব ভালো ফসল হবে।

এটাও বুদ্ধির গল্প। কিন্তু এ বুদ্ধি অন্য জাতের।

মহাগুরু

গত যুগের বাঙালি কবি রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে লিখেছিলেন—

'তোমার গঙ্গার জলে/গঙ্গাপূজা নিয়তই হয়'।

সাপ্তাহিক এই ক্ষুদ্র নিবন্ধটি আমার মহাগুরু শিবরাম চক্রবর্তীর বিষয়ে রচিত। কিন্তু গঙ্গার জলে গঙ্গাপূজা করার সাধ্য আমার নেই। শিবরাম চক্রবর্তী নিজেই লিখেছিলেন, "শিবরাম চক্রবর্তীর মতো কথা বলার বিপদ"।

বলা বাহুল্য, পান (PUN) প্রবণ ঈষৎ বঙ্কিম বাঙাল দোষবর্জিত শিবরাম চক্রবর্তীর যে গদ্যভাষা তা নিয়ে বাংলা সাহিত্যের পণ্ডিত প্রবরেরা কোনোদিনই মাথা ঘামালেন না। অবশ্য শিবরামের গল্পের আঙ্গিক এবং রসকাহিনি, তা নিয়ে কখনো কখনো

আলোচনা, কথাবার্তা হয়েছে। তবে, এইসব আলোচনা-প্রসঙ্গে একটা কথা বারবারই উঠে এসেছে যে, শিবরাম চক্রবর্তীর এই গল্প মার্ক টোয়েন থেকে নেওয়া কিংবা ওই গল্প স্টেফান লিককের কাহিনির অনুসরণে। ওডহাউসের প্রসঙ্গ বারবার এসেছে। এ-সব অভিযোগ হয়তো অসত্য নয়, আমি নিজেও একজন পাঠক হিসাবে সেটা জানি। কিন্তু এ-ব্যাপারও সসম্ভ্রমে লক্ষ করেছি, কী অসাধারণ রচনাশৈলীর কৌশলে, কাহিনি-বিন্যাসের সরস ও সূক্ষ্ম তত্ত্বজ্ঞান দিয়ে শিবরাম এই গল্পগুলির নবায়ন করেছেন।

এই সূত্রে কালিদাসের ছায়ায় রবীন্দ্রনাথ কিংবা জীবনানন্দের ছায়ায় আধুনিক বাংলা কবিতা হাতের কাছে সুলভ দুটি উদাহরণ।

এ নিয়ে আমরা যারা অল্পসংখ্যক শিবরামবাদী রয়েছি, মোটেই চিন্তিত নই। এই ধরনের আলোচনা শিবরামকে কখনওই ছোটো করে না, বরং একদা হাস্যকরভাবে বঙ্কিমচন্দ্রকে 'বাংলার স্কট' বা রবীন্দ্রনাথকে 'বাংলার শেলি' বলা হত, সে-কথা স্মরণ করতে পারি।

হঠাৎ এই সব কথা আসছে এই কারণে যে প্রায় দৃষ্টির আড়াল দিয়ে শিবরামের আর একটা জন্মদিন চলে গেল। কোথাও কোনো আয়োজন-অনুষ্ঠান হয়েছে বলে জানি না। কোনো সাহিত্য-পত্রিকায় কোনো আলোচনা বা কোনো দৈনিকে জন্মদিনের উল্লেখ ছিল না। থাকলেও আমার চোখে পড়েনি।

শিবরামের জন্মদিন আমাকে খেয়াল করিয়ে দিল কলকাতার এক টিভি সম্প্রচারকেন্দ্র। তাঁরা শিবরাম চক্রবর্তী সম্পর্কে আমার কাছে জানতে চাইলেন। শিবরাম চক্রবর্তী সম্পর্কে আজ এতদিন পরে আর কী বলার আছে? তিনি মূর্খ সমালোচক-অধ্যাপকদের মাথার উপর দিয়ে হাইজাম্প দিয়ে বাংলা সাহিত্যের প্রকাশকদের ছদ্ম অনাগ্রহ অতিক্রম করে তথাকথিত সম্পাদকদের বাছ বিচারের বালাই না করে নিঃশব্দে বাঙালির জীবনে প্রবেশ করে গিয়েছেন।

শিবরাম এখন আর শুধু হাসির গল্পের লেখক, সুসাহিত্যিক, নাট্যকার, রাজনৈতিক আদর্শবাদী প্রবন্ধকার—এ-সব কিছুর ঊর্ধ্বে। বাঙালির ঘরোয়া জীবনে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে গিয়েছেন। কোথাও কোনো অসঙ্গতি থাকলে হাস্যকর ব্যাপার ঘটলে লোকে শিবরামকে স্মরণ করে। বলে "এ যে একেবারে শিবরামের গল্প হয়ে দাঁড়াল।" সেই যে শিবরাম একটা গল্প লিখেছিলেন, একটি বালককে লম্বা একটি মই দিয়ে বালকটির পিসেমশাই তাকে বলেছিলেন, সেটাকে বেশ দূরে একটা জায়গায় পৌঁছে দিতে, বোধহয় শ্যামবাজার থেকে বালিগঞ্জে। দীর্ঘ একটি মই হাতে ডবল ডেকার বাসে ওঠার প্রাণান্ত চেষ্টা বাংলা সাহিত্যে মহৎ হাসির সম্পদ হয়ে আছে তা-ই নয়, এখনও যখন হাজার হাজার লোককে অসম্ভব পরিস্থিতিতে দেখি, শিবরামকে মনে মনে সালাম জানাই।

শুধু সালাম নয়, প্রণাম। মহাপ্রণাম।

মহাগুরুকে আমার মহাপ্রণাম জানাই। দূরদর্শন সম্প্রচারে আমার কাছে জানতে চাওয়া হয়েছিল, শিবরাম চক্রবর্তীর কাছ থেকে সাহিত্যের পাঠ আমি নিয়েছি কি না;

এই প্রশ্নের উত্তরে আমার মনে হল দৈনিক কাগজে শিবরামের সাপ্তাহিক 'অল্পবিস্তর' কলামে আমার বাংলা সাহিত্যে অনুপ্রবেশ। যেখানে যা মজার কথা পেতাম, শুনতাম, কিংবা নিজেই ভাবতাম, সেগুলি পাঠিয়ে দিতাম। সেগুলি তিনি সম্পাদনা করে ওই কলামে ছাপিয়ে দিতেন। আমার নাম উল্লেখ করতেও ভুলতেন না।

পরবর্তী জীবনে শিবরাম চক্রবর্তীর সঙ্গে যথেষ্টই ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল। তিনি আমাকে প্রভূত প্রশ্রয় দিয়েছেন। শিবরাম চক্রবর্তীর বিস্তৃত ও যৌথ স্মৃতিচারণ প্রয়োজন আছে এবং সেটা শিবরামের পরিচিত যাঁরা এখনও বেঁচে আছেন, তাঁদের জীবিত অবস্থাতেই করতে হবে।

বাজার যেন রান্না

চমৎকার শীত পড়েছে। আলু-ফুলকপি-বাঁধাকপি-শিম-বরবটি ইত্যাদি তরকারিতে বাজার সবুজে সবুজ হয়ে আছে। সঙ্গে আছে পালং, মেথিশাক, কড়াইশুঁটি, কচিলাউ—এই রকম সারা বছরের দুর্লভ সব আনাজ।

এ বছর দামও কমের দিকে। পাঁচ টাকার মধ্যে একটা বড় ফুলকপি হয়ে যাচ্ছে। আলুও পাঁচ টাকার নিচে নেমেছে। বাজারে এসেছে ঘন সবুজ ক্যাপসিকাম আর ঈষৎ হরিদ্রাভ শিষপালং।

এ বছর মাছের দামও অন্যান্য বছরের তুলনায় খুব বেশি নয়। সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাসের পর বেশ জম্পেশ করে শীত পড়েছে।

একদিন ভালো করে রোদ উঠলে বেলা করে বাজারে গেলাম। আগে আমি নিয়মিত, প্রায় দৈনিক বাজারে যেতাম। দু'হাতে দুটো ব্যাগ। একটা মাছের, একটা তরকারির ব্যাগ নিয়ে আজকাল সকালবেলা কেমন যেন আলসেমি লাগে। খুব একটা যাই না। তবে এক কন্যাস্থানীয় এবং তার নবলব্ধ স্বামীকে দুপুরে খেতে নেমন্তন্ন করা হয়েছে। তাই আমার স্ত্রী মিনতি জোর করে আমাকে বাজারে পাঠাল।

বাজার করায় আমার সুনাম আছে। কুচো চিংড়ি কিনলে কচি লাউ। ছোটো পুঁটি কিনলে অম্বলের জন্য তেঁতুল। পেঁয়াজকলি কিনলে মিষ্টি কুমড়োর ফালি। পাকা পোনামাছের টুকরো কিনলে সঙ্গে আলু, ফুলকপি, কড়াইশুঁটি, ক্যাপসিকাম। অনেকক্ষণ ধরে দেখে দেখে বিবেচনা করেই মিলিয়ে মিশিয়ে আমার বাজার।

একালের মহিলারা ব্যাপারটা বুঝবেন না। কিন্তু আমার মা আমার বাজার দেখে খুব খুশি হতেন। আমার পিসিমা বলতেন, "খোকন বাজার করে এমন, যেন রান্না করে নিয়ে আসে।" মানে হল, যা দিয়ে যা রান্না হবে সব বুঝে দেখেশুনে নিয়ে আসা

হয়েছে। এমনকী পায়েসের চাল কিনলে আমি তেজপাতা কিনি, কুমড়ো ফুল কিনলে বেসন কিনে আনি।

সেদিন সকালবেলা ঠিক এই রকমই করেছিলাম। অনেকরকম পদ রান্না হয়েছিল। ফলে, অনেকদিন পরে তরুণ দম্পতির সঙ্গে এক টেবিলে বসে খেতে খেতে অনেকটাই গুরুভোজন হয়েছিল। বিকেলের দিকে শরীর আইঢাই করছিল। পেট ফুলে গিয়েছিল। এ বয়সে গুরুভোজনের যা পরিণাম হয় ঠিক তাই। তার উপরে আবার প্রচুর শাকসবজি এবং শেষ পাতে পায়েস খেয়েছিলাম। শেষে খুব অস্বস্তি হতে মিনতিকে বললাম, একটু খাওয়ার সোডা দিতে। অল্প জলে খাওয়ার সোডা দিয়ে খেলে আমার বেশ উপশম হয়। বাজারে তৈরি ওষুধ বা আরকের চেয়ে তাড়াতাড়ি ফল দেয়।

এতক্ষণ পেটের অবস্থাটাই মিনতির কাছে গোপনই রেখেছিলাম। কিন্তু এবার বাধ্য হয়ে খাওয়ার সোডা চাওয়ায় মিনতি আমার দিকে অগ্নিদৃষ্টি নিক্ষেপ করল।

এর আগে বাজার দেখে সে মোটেই খুশি হয়নি। বরং গঞ্জনা দিয়েছে, এত জিনিস দিয়ে কী হবে এই নিয়ে গজগজ করেছে। এরপর খাওয়ার সময় বারবার চেয়ে খাওয়ায় আপত্তি করেছে। কিন্তু নবদম্পতির সামনে না দিয়েও পারেনি।

এখন অপরাহ্নকালে শূন্যগৃহে তার কাছে খাওয়ার সোডা চাইতে সে খেঁকিয়ে উঠল, "তখনই বলেছিলাম।" আমি স্বভাবোচিত বিনয়ের সঙ্গে বললাম, "খুব ভুল হয়ে গিয়েছে। আর কখনো এমন হবে না।" তারপর কাতরকণ্ঠে বললাম, "বড় হাঁসফাঁস বোধ হচ্ছে, একটু খাবার সোডা এনে দাও।" এরপর অগত্যা মিনতি রান্নাঘরের সামনে তাকের কাছে গেল। ওই তাকে চাল-ডাল-তেল-মশলা সবকিছুই থাকে। সেখান থেকে দুটো কাগজে জড়ানো ছোটো কাগজের প্যাকেট বার করে আনল। তারপর একটা প্যাকেট খুলে একটু সাদা গুঁড়ো আমার হাতে দিয়ে বলল, "জিভে ঠেকিয়ে দেখত খাওয়ার সোডা কি না।"

একটু জিভে ঠেকিয়েই আমি টের পেলাম এটা খাওয়ার সোডা নয়। মিনতিকে সে কথা জানাতে মিনতি বলল, "সর্বনাশ তাহলে ওটা ইঁদুর মারার সেঁকো বিষ। আর এই অন্যটা খাওয়ার সোডা।"

খাওয়ার সোডার প্যাকেট আমার হাতে ধরিয়ে সে উপদেশ দিল, "তাড়াতাড়ি মুখটা জল দিয়ে ধুয়ে ফাল, তারপর সোডাটা খেয়ে নাও।"

বলা উচিত, রেগে গিয়ে সেদিন আর আমি খাওয়ার সোডা স্পর্শ করিনি এবং সবিস্ময়ে আবিষ্কার করেছি অল্প সেঁকো বিষেও হজমের গোলমাল চমৎকার কমে যায়।

ভ্রমণ

'ভ্রমে ভরা আমার ভ্রমণ', এইরকম আশ্চর্য সব পঙ্ক্তির কয়েকটি কবিতা লিখে সেই যে তরুণ কবি বিদেশে চলে গেলেন তিনি আর ফিরলেন না। এতদিনে বুঝতে পারি তিনি আর কখনো ফিরবেন না।

নিতান্ত ব্যক্তিগত কারণে গত একদশক ধরে আমাকে বারবার ভূ-পর্যটনে বেরুতে হচ্ছে। সঙ্গে আমার স্ত্রী মিনতিও থাকেন। আমার ছেলে তাতাই থাকে আমেরিকার পশ্চিম উপকূলে সানফ্রান্সিসকো অঞ্চলে। দুটি পরমাসুন্দরী পৌত্রী সেখানে বড় হচ্ছে। নিতান্ত মায়ার টানে বৎসরের পর বৎসর আমাকে প্রশান্ত মহাসাগর পাড়ি দিতে হয়। যাতায়াতের পথে সিঙ্গাপুর, ব্যাঙ্কক, হংকং, টোকিও এসব জায়গা জলভাত হয়ে গেছে। কতরকম যে বিচিত্র অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হতে হয়েছে তার ইয়ত্তা নেই।

একটা পুরনো গল্প দিয়ে শুরু করি।

তখন অবশ্য আমার ছেলে আমেরিকায় যাযনি, সেখানে বসবাস করছে না। আমি গিয়েছিলাম সরকারি নিমন্ত্রণে। আমেরিকান যুক্তরাষ্ট্র সরকারের আতিথেয়তায় এক-মাসের মধ্যে পুরো মার্কিন-পরিক্রমা করতে হয়েছিল। রাজধানী ওয়াশিংটন থেকে মহানগরী নিউ ইয়র্ক হয়ে জানুয়ারি মাসের বরফে ঢাকা নায়াগ্রা সীমান্তে; সেখান থেকে মিসিসিপি নদী তীরবর্তী সোয়াম্প অঞ্চল পরমাসুন্দরী নিউ অর্লিয়েন্স এবং মধুরেণ সমাপয়েৎ ক্যালিফোর্নিয়ায় সানফ্রান্সিসকো, লস এঞ্জেলেসে।

তখন আমার চল্লিশ ঘেঁষা বয়স। তাই অত হুল্লোড়, দৌড়ঝাঁপ সম্ভব হয়েছিল। এ বয়েস হলে বোধহয় ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি বলে পালিয়ে আসতাম। আমার জ্ঞানত একবার প্রেমেন্দ্র মিত্র অনুরূপ এক ভ্রমণের প্রথমেই অবস্থা টের পেয়ে পালিয়ে দেশে ফিরে এসেছিলেন কী এক অজুহাতে। আমার পক্ষে অবশ্য সেটা সম্ভব হয়নি। ফলে প্রায় পাঁচ সপ্তাহ পর যখন বিধ্বস্ত বিহ্বল এলোমেলো উশকোখুশকো আমি কলকাতা বিমানবন্দরে অবতরণ করলাম, আমার অবস্থা দেখে, আমার মুখের দিকে তাকিয়ে প্রাণাধিকা মিনতি হাঁউমাউ করে উঠেছিলেন, "ওগো, তোমাকে না তোমার পাসপোর্ট ফোটোর মতো দেখাচ্ছে।"

ফোটো নিয়ে সম্প্রতি খুবই মজা হয়েছিল হংকং-এ।

হংকং বিমানবন্দরে নিরাপত্তার খুব কড়াকড়ি। এক গোমড়ামুখো পীতচক্ষু চৈনিক রক্ষী আমাদের পাসপোর্টগুলি পরীক্ষা করে দেখছিলেন বিমানবন্দরের ট্র্যানজিট এলাকায়। আমার আর মিনতির পাসপোর্ট দুটি তাঁর হাতে দিতে তিনি প্রথম পাসপোর্টটি খুব খুঁটিয়ে দেখে আমাকে ছেড়ে দিলেন। কিন্তু মিনতির পাসপোর্টের ফোটো দেখে

মিনতিকে বারবার খুঁটিয়ে অবলোকন করে তিনি ঘোষণা করলেন, "এই পাসপোর্ট তোমার নয়।"

আমরা তো অবাক। আমি উঁকি দিয়ে পাসপোর্টের মধ্যে তাকিয়ে দেখি সেটা আমার ফোটো। তার মানে তিনি মিনতির পাসপোর্ট দেখে আমাকে ছেড়ে দিয়েছেন আর আমার পাসপোর্ট দেখে মিনতিকে আটকেছেন! পাসপোর্ট খুলে দেখি সত্যিই তাই। আমার হাতের পাসপোর্টটা মিনতির। মিনতির জলজ্যান্ত ফোটো সেখানে লাগানো।

এরপর সেই চিনেম্যানকে ব্যাপারটা বোঝাতে পনেরো মিনিট সময় লেগেছিল। সে কিছুই বুঝতে পারে না কিংবা চায় না। বিদেশি বিমান বন্দরে হাতাহাতি কিংবা মারামারি সম্ভব নয়। যাইহোক, এক ইংরেজি জানা চিনে ভদ্রলোক আমাকে উদ্ধার করেছিলেন।

ঘটনার শেষ নেই। কতরকম যে হাস্যকর পরিস্থিতি। 'নীল দিগন্তে তখন ম্যাজিক' নামে ভ্রমণকাহিনিতে সেসব কথা বিস্তারিত লিখেছি। নতুন করে খুব কিছু লেখার নেই। তবে নতুন পাঠকদের জন্যে দু-একটি কাহিনি অবশ্যই স্মরণ করতে পারি।

গভীর রাত। বিমান প্রশান্ত মহাসাগরের ওপর দিয়ে যাচ্ছে। বিমানের মাইকে ক্যাপ্টেনের রেকর্ড করা কণ্ঠস্বর শোনা গেল, "ভদ্রমহোদয়গণ, ভদ্রমহিলাগণ, আমরা এখন আন্তর্জাতিক তারিখ রেখা পার হচ্ছি। আপনাদের জীবনের ক্যালেন্ডার থেকে একটি দিন হারিয়ে গেল। একটু আগে ছিল ছয় তারিখ এখন আমরা আট তারিখে। আন্তর্জাতিক তারিখ রেখা অতিক্রম করতে আমাদের একটি দিন বিসর্জন দিতে হল।"...

এটা কিছু নয়। মামুলি ব্যাপার। কিন্তু সবিস্ময়ে দেখলাম কোট-প্যান্ট-টাই পরা ভারতীয় আদলের চেহারার এক ভদ্রলোক জানলা দিয়ে খুব উঁকিঝুঁকি দিচ্ছেন। তিনি আমার পিছনের সিটেই বসেছিলেন। তিনি বারবার উঁকিঝুঁকি দিতে দিতে আমাকে বললেন, "ও মশাই, আমি কিন্তু আন্তর্জাতিক তারিখ রেখাটা দেখতে পাচ্ছি না।"

আপাতত আর একটা মজার গল্প বলব। জাপানের এক রেল স্টেশনে একজন যাত্রী দাঁড়িয়েছিলেন। ওইখান দিয়ে বিখ্যাত বুলেট ট্রেন যায়। যার গতি বোধহয় ঘণ্টায় হাজার খানেক কিলোমিটার। তিনি হঠাৎ দেখলেন ধোঁয়ার মতো আবছা কী যেন একটা প্ল্যাটফর্মের সামনে দিয়ে ছুটে গেল। তার একটু পরে দেখলেন প্ল্যাটফর্মের ওপর দিয়ে একটা রেলগাড়ির ছায়া ছুটে যাচ্ছে।

রীতিমতো ভৌতিক ব্যাপার। তিনি স্টেশন মাস্টারকে জিজ্ঞাসা করলেন, "স্যার, ব্যাপারটা কী?"

স্টেশনমাস্টার গম্ভীর হয়ে বললেন, "বুঝতে পারছেন না? ওই যে প্রথমে গেল ধোঁয়াধোঁয়া আবছায়া, ওটাই বুলেট ট্রেন। আর পেছনে গেল বুলেট ট্রেনের ছায়া। ট্রেনের সঙ্গে সমানে দৌড়ে যেতে পারছে না।

শীতকাল

'চমৎকার শীত পড়েছে কলকাতায়। চমৎকার শীত মানে বেশি শীত নয়। সুন্দর ঠান্ডা ঠান্ডা ভাব। অথচ হাড়কাঁপানো বাতাস নয়। রক্তহিম করা শৈত্য নয়। বেশ আরাম-দায়ক। বিকেলের দিকে একটা হাফ সোয়েটার গায়ে দিলেই বেশ চলে যায়। রাতে গায়ে একটা মোটা কাঁথা কি চাদর। লেপ-বালাপোশের শীত কলকাতায় আজকাল কদাচিৎ আসে। দু'চার বছর বাদে মাত্র দু-চার দিনের জন্য তখন লোকে কাঠের আলমারি খুলে বার করে আনে পুরোনো লেপ, গলাবন্ধ গরম কোট। কিন্তু সে আর ক'দিনের জন্য।

ঠান্ডার অভিজ্ঞতা জীবনে দু' একবার হয়েছে। একবছর জানুয়ারির শেষে নিউইয়র্কে ছিলাম। রাস্তায় বরফ জমে পাথরের মতো শক্ত হয়ে গিয়েছিল, অথচ সাংঘাতিক পিচ্ছিল। গরম জামা, সোয়েটার, কোট ওভারকোট সমেত কতবার যে সেই বরফের উপর পড়ে গিয়েছি। এত পিছল যে নিজে থেকে ওঠাও কঠিন।

আরও বেশ কয়েকবার আমেরিকায় শীতের দৌরাত্ম্য টের পেয়েছি। এমনকী নাতিশীতোষ্ণ সান ফ্রান্সিসকো শহরে প্রচণ্ড ঠান্ডায় কেঁপেছি। তবে তার জন্য প্রধান দায়ী ছিল প্রশান্ত মহাসাগরের তীক্ষ্ণ শীতল ঝোড়ো বাতাস।

অবশ্য আমার ব্যক্তিগত স্মৃতি অনুসারে একদা পৃথিবীর সবচেয়ে শীতল স্থান ছিল আমাদের টাঙ্গাইল বিন্দুবাসিনী স্কুলের পিছনের পার্ক। ক্ষীণস্রোত লৌহজঙ্গ নদের এ পাশে কখনো কখনো শীতে মেলা বসত। গভীর রাতে যাত্রা হত সেই মেলায়। রাত্রের শেষ প্রহর অবধি আগাগোড়া চাদর মুড়ি দিয়ে সেই যাত্রা দেখে বাড়ির দিকে রওনা হতাম। টের পেতাম ঠান্ডা কাকে বলে।

এতক্ষণ খড়কুটো, বাঁশের টুকরো, কাঠের টুকরো দিয়ে জ্বালানো ছোটোবড় নানারকম অগ্নিকুণ্ড দিয়ে প্রেক্ষণ ময়দানের চারপাশ উষ্ণরাঙা হয়েছিল। এবার খোলা মাঠে পড়ে টের পেতাম জমে যাওয়া কাকে বলে।

এরই মধ্যে হয়তো সূর্য উঠত। সেই সূর্যের আলোয় কোনো তাপ পেতাম না। কেমন জ্যোৎস্নার মতো মনে হত।

*   *   *   *   *

ঠান্ডা নিয়ে বাড়াবাড়ি বোধহয় ঠিক হচ্ছে না। বাড়াবাড়ি করে লাভ নেই।

ঠান্ডার দিন, শীতের দিন অনেকেরই প্রিয় সময়। অনেকের উৎসব ও পার্টির দিন। অঘ্রান শেষের ইতুপুজো থেকে মধ্য বসন্তের দোল পূর্ণিমা পর্যন্ত শীতের পরমায়ু। এর মধ্যে কতরকম পুজো-পার্বণ, পালা-উৎসব। সেই সঙ্গে বনভোজন ও পিকনিক, এবং পার্টি।

যাঁরা রাজনীতি করেন তাঁদের পার্টি করার এটা প্রকৃষ্ট সময়। শীত মানেই ইনকিলাব-বন্দেমাতরম, মানে মিছিল, প্রসেশন, জনসভা-রাজনৈতিক পার্টিগুলি চনমনে হয়ে ওঠে।

তবে আরো একরকম পার্টি আছে। সেটা ককটেল পার্টি। মদ্যপানের সান্ধ্য আসর। সেদিন এইরকম এক সান্ধ্য আসরে গৃহস্বামিনী আমাকে বললেন, "আপনাকে একটা অনুরোধ আছে।"

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, "কি অনুরোধ?"

ভদ্রমহিলা বছর পঁচিশ প্রবাসে ছিলেন। বছর দুয়েক হল কলকাতায় ফিরেছেন। খুবই সাহিত্য অনুরাগী। তিনি বললেন, "আচ্ছা! এত যে নাম শুনি শক্তি চট্টোপাধ্যায়কে কোথাও দেখি না কেন? কত সাহিত্যসভায় কবি সম্মেলনে যাই, তাঁকে তো দেখি না!"

আমি বললাম, "ওঁর একটু আসার অসুবিধে আছে।" ভদ্রমহিলা জোর করলেন, "অসুবিধা আবার কী? কবিকে আমাদের এখানে একদিন নিয়ে আসুন।"

আমি বললাম, "তিনি আসতে পারবেন না।"

ভদ্রমহিলা বললেন, "কেন?"

আমি বললাম, "কয়েকবছর আগে তিনি মারা গিয়েছেন।"

রস ও রহস্য

'লেগস আপ।'

'সামনের দুটো পা মাথার ওপরে তোলো।"

গর্জে উঠলেন গর্জন গোয়েন্দা।

প্রবল পরাক্রান্ত আসামিকে পর্যুদস্ত করে উদ্যত রিভলভারের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে গোয়েন্দারা বলে থাকেন, 'হ্যান্ডস আপ।'

গর্জন গোয়েন্দাও প্রথম প্রথম তাই করতেন কিন্তু খ্যাতনামা কবি ও রসসাহিত্যিক তথা চোলাই মদ মানে চুল্লুর আড়তদার কালীচরণ রায়কে যখন ধরে বললেন, 'হ্যান্ডস আপ। মাথার ওপর হাত তোলো কালীচরণবাবু।'

সুরসিক কবি-ক্রিমিন্যাল কালীচরণ গর্জন গোয়েন্দাকে বলেছিলেন, 'আমাকে মাথার ওপরে হাত তুলে ধরলে কেমন যেন বোকা-বোকা দেখায়, মনে হয় যেন জগাই-মাধাইয়ের মতো দেখাচ্ছে আমাকে। দয়া করে আমাকে মাথার ওপরে হাত তুলতে বোলো না গর্জন।'

সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যুৎপন্নমতি গর্জন গোয়েন্দা গর্জে উঠেছিলেন, 'লেগস আপ।'

একালের পাঠক-পাঠিকাবৃন্দ এ গল্প পড়েনি।

চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ বছর হয়ে গেল। তখন কলকাতায় এত লিটল ম্যাগাজিন, ধান্দাবাজ আঁতেল পত্রিকা ছিল না। কিন্তু দেশ ছিল, প্রবাসী ভারতবর্ষ. বসুমতী. গানের কাগজ ছিল, রঙ্গমঞ্চের কাগজ ছিল, অবশ্যই কয়েকটা সিনেমা পত্রিকা। ছিল সচিত্র ভারত, দীপ্তেন সান্যালের অচলপত্র, রমাপদ চৌধুরীর ইদানীং পত্রিকা। এছাড়াও ছিল, রহস্য-রোমাঞ্চ পত্রিকা, নাম 'রোমাঞ্চ', উত্তর কলকাতার হরীতকী বাগান থেকে বেরোত। যতদূর মনে পড়ছে পত্রিকাটির প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন মৃত্যুঞ্জয় চট্টোপাধ্যায়, তখন কাগজ দেখতেন রঞ্জিৎ চট্টোপাধ্যায়।

এই 'রোমাঞ্চ' পত্রিকায় আমার গর্জন গোয়েন্দার গল্প প্রকাশিত হয়। বোধহয়, একাধিক, ষাটের দশকের গোড়ার দিকে।

সেই আমার গদ্যরচনার হাতেখড়ি। তার আগে কবিতা লিখে কিছুটা নাম বোধহয় হয়েছিল। এবার গদ্যে ঝুঁকেছিলাম। হাস্যকর গর্জন গোয়েন্দাকে পাঠকেরা গ্রহণ করেনি। ফলে অবশেষে সাদামাটা হাসির গল্পে এবং ধারাবাহিক রম্যরচনায় মনোনিবেশ করি।

এতকাল পরে বুঝতে পারছি, কিছুতেই আমার সুবিধে হল না। এ যাবৎ যা লিখলাম সবই পণ্ডশ্রম।

যা হোক মূল প্রসঙ্গে যাই। আমি চেষ্টা করেছিলাম কিন্তু সফল হইনি, তবে বড় সহজেই হাল ছেড়ে দিয়েছিলাম।

রহস্য কাহিনি কিঞ্চিৎ সরস হলে খুব উপাদেয় হয়। তার প্রমাণ হাতের কাছে সত্যজিৎ রায়। সত্যজিৎ রায়ের ফেলুদা-কাহিনি দু-চার হাজার নয়, দু-চার লক্ষ নয়, সর্বমোট ২৫-৩০ লক্ষ কিংবা তারও বেশি বিক্রি হয়েছে। এটা কম কথা নয়। এরজন্যে ফেলুদা-লালমোহনবাবু এবং তপসের মতো ঝকঝকে চরিত্রই শুধু নয়, প্রয়োজন ছিল সরসতার।

কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখে লালমোহনবাবুর মনের মধ্যে স্বর্গীয়, হেভেনলি, অপার্থিব, অনির্বচনীয়, সাবলাইম ইত্যাদি ভাব দেখা দেয়। তাঁর মনে পড়ে যায় তাঁর কৈশোরের এথিনিয়াম ইস্কুলের কবি-মাস্টার বৈকুণ্ঠ মল্লিকের লেখা একটি ছ'লাইনের কবিতা :

"অয়ি কাঞ্চনজঙ্ঘে!
দেখেছি তোমার রূপ উত্তরবঙ্গে
মুগ্ধ নেত্রে দেখি মোরা তোমারে প্রভাতে
সাঁঝেতে আরেক রূপ, ভুল নেই তাতে—
তুষার ভাস্কর্য তুমি, মোদের গৌরব
সবে মিলে তোমারেই করি মোরা স্তব।"

এইসঙ্গে লালমোহনবাবুর সংযোজন "সম্বোধনে আকারটা একার হয়ে যায় (কাঞ্চনজঙ্ঘা, কাঞ্চনজঙ্ঘে হয়েছে)। সেটাকে কীরকম কাজে লাগিয়েছেন কবি, দেখছ তপেশ?"

এই লালমোহনবাবুকেই ফেলুদা খেতাব দিয়েছিলেন, 'এ বি সি ডি' যার মানে হল 'এশিয়াজ ব্রাইটেস্ট ক্রাইম ডিটেকটর'।

সত্যজিৎ রায়ের শঙ্কু কাহিনিগুলিও রহস্যময়। কিন্তু তার মধ্যে মজার অভাব নেই। বরং প্রতিটি বইতে মজাটাই আসল।

সত্যজিৎ রায়ের পিতৃদেব সুকুমার রায় রহস্য কাহিনি সে অর্থে লেখেননি। কিন্তু তাঁর একাধিক রচনায়, বিশেষ করে হাসির কবিতায় বা হাসির গল্পে রহস্যের সর্বনাশ করেছেন। তাঁর সেই বিখ্যাত 'চোর ধরা' কবিতা :

"আরে ছি ছি! রাম রাম! বলো না হে বলো না—
চল্‌ছে যা জুয়া চুরি, নাহি তার তুলনা।
যেই আমি দেই ঘুম টিফিনের আগেতে,
ভয়ানক কমে যায় খাবারের ভাগেতে।"

সেই চোর ধরার বৃত্তান্ত আমরা আশৈশব পড়ে আসছি। তারপর সেই 'ডিটেকটিভ' গল্প। যেখানে পুলিশের ভাগনে জলধরের সরভাজা একটা মোটা হুলো বেড়াল চোখের সামনে চুরি করে পালিয়ে গেল। জলধরের গোয়েন্দাগিরি মোটেই দাঁড়াল না।

পাঁচকড়ি দে থেকে নীহাররঞ্জন গুপ্ত পর্যন্ত রহস্য-কাহিনির লেখকেরা গোয়েন্দাগিরির ব্যাপারটা মোটেই হালকাভাবে নেননি। তাঁরা হাসিঠাট্টার ব্যাপারটা এড়িয়ে গিয়েছেন তবে হেমেন্দ্রকুমার রায়ের ডিটেকটিভ কাহিনিগুলিতে সুন্দরবাবু বলে এক স্থূলোদর দারোগার চরিত্র ছিল। তিনি মধ্যে মধ্যে 'হুম' বলতেন এবং ডবল-ডিমের ওমলেট একবারে গলাধঃকরণ করতেন। মনে আছে বালক বয়সে কাহিনির মধ্যে সুন্দরবাবুর আবির্ভাব বিশেষ আহ্লাদের সঞ্চার করত। তবে কোনোরকম সরসতার চেষ্টা না করেই মোহন সিরিজের দুশো বই-এর বহু অংশেই অনিবার্য হাসির উপাদান থাকত।

দস্যু মোহনের সেই প্রেমিকের ভূমিকা, যেখানে তিনি তাঁর প্রেমিকা এবং পরে স্ত্রী রামকে প্রশস্ত বক্ষে টেনে নিতেন এবং বলতেন, 'রমা, ভয়াতুরা কপোতী আমার।' দস্যু মোহন, যিনি একাধারে শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক, শহরের প্রধান ব্যারিস্টার, এক নম্বর শল্যবিদ, জগৎবিখ্যাত ক্রিকেট প্লেয়ার, লখনউ ঘরানার কালোয়াতি গায়ক; যাঁর হাতে রয়েছে ধারালো অস্ত্র, তাতে লেখা আছে 'ন্যায়দণ্ড'—মোহন সিরিজের কোনো বই পাঠ না করলে মোহন সিরিজের মজা বোঝা যাবে না। দুঃখের বিষয়, বাজারে বই-এর দোকানে আজকাল আর মোহন সিরিজের বই পাওয়া যায় না। দুচারটে পুরোনো গ্রন্থাগারে চেষ্টা করলে হয়তো পাওয়া যাবে।

দস্যুমোহনের পর বাজারে দেখা দিয়েছিল স্বপন কুমারের বই। অতি অল্প দামে ভালোই বিক্রি হত, কিন্তু সত্যজিৎ রায়ের ফেলুদা সবাইকে বাজারছাড়া করেছে।

* * *

এই রচনায় আমি মনোরঞ্জন ভট্টাচার্যের অধুনা বিস্মৃত হুকা-কাশির গোলমেলে প্রতিভা কিংবা প্রেমেন্দ্র মিত্রের পরাশর বর্মার ক্ষুরধার বুদ্ধির উদাহরণ টেনে আনব না। কারণ মূলত হাস্যরস সৃষ্টির জন্যেই এই চরিত্রগুলির পরিকল্পনা। যেমন প্রেমেন্দ্র মিত্রের আরেক অবিস্মরণীয় চরিত্র ঘনাদা, যাঁকে বার্লিনের রাজপথে শীতকালের

বরফঝরা, হিম ঠান্ডা শেষ রাতে শর্টস পরে মর্নিংওয়াক করতে দেখেই চিনতে পেরেছিলেন দুঁদে জার্মান গোয়েন্দা।

অবশেষে এই সময়ের প্রধান রসিক হিমানীশ গোস্বামীর দুটি গোয়েন্দা চরিত্রের কথা বলতে হয়।

আমাদের পারিবারিক পত্রিকা 'কয়েকজন'-এর প্রধান আকর্ষণ ছিল হিমানীশের গোয়েন্দা দে এবং গোয়েন্দা দাঁ-র কার্যকলাপের বিবরণী। একটি গল্পের কথা মনে পড়ছে, যার নাম ছিল 'সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত খুন হলেন না' এবং তারপরেই সাবটাইটেল 'অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তকে পুনরায় হত্যার চেষ্টা।'

এরকম বিপজ্জনক নামের গল্প একা হিমানীশই লিখতে পারতেন।

সময় ক্রমশ ছোটো হয়ে যাচ্ছে। জীবন থেকে রসবোধ নাকি বিদায় নিতে চলেছে। এই সময়ে রহস্যের গল্পে রসের প্রবেশ খুব সহজ নয়।

বীরবল

প্রায় চার শতক পার হয়ে গেল বীরবলের প্রতিষ্ঠা। উত্তর ও পূর্ব ভারতের ঘরে ঘরে বীরবলের গল্প গত চারশো বছর ধরে চলে আসছে। সেদিক থেকে গোপাল ভাঁড়ের দ্বিগুণ বয়স তাঁর। গোপাল ভাঁড়কে অবশ্য ঠিক ঐতিহাসিক চরিত্র বলা কঠিন। সুকুমার সেন গোপাল ভাঁড়ের অস্তিত্বে অবিশ্বাস করতেন। অনেকেরই ধারণা গোপাল ভাঁড় পুরো কাল্পনিক নন, তিনি ভাঁড়ু দত্ত নামক জনৈক রাজ-বয়স্য। ভাঁড়ুর ভাঁড় থেকেই গোপাল ভাঁড়। এতদিন পরে ঐতিহাসিক সত্য খুঁজে বার করা কঠিন।

বীরবল কিন্তু ঐতিহাসিক চরিত্র। মোগল সম্রাট আকবরের সভাসদ এবং নবরত্নের এক রত্ন। এ বিষয়ে সন্দেহ নেই যে তাঁর কাণ্ডজ্ঞান এবং বিদ্যা-বুদ্ধির অভাব ছিল না, তবে তিনি অত্যন্ত উচ্চমানের সুরসিক ছিলেন। তাঁর সেই রসিকতার গল্পগুলি চার শতাব্দী পাড়ি দিয়ে এসেছে যে-কোনো এপিক বা ক্ল্যাসিকের মতো।

এই প্রসঙ্গে নাসিরুদ্দীনও স্মরণীয়। মোল্লা নাসিরুদ্দীনও রাজ সভাসদ এবং ভাঁড়ের মুখোশ পরে তিনি অনেক স্পষ্ট কথা বলেন। সুলতানকেও রেয়াত করেন না। নাসিরুদ্দীনের সঙ্গে পঁচিশ বছর আগেও সাধারণ বাঙালি পাঠকের তেমন পরিচয় ছিল না। সত্যজিৎ রায়ের অনুবাদে পরবর্তীকালে নাসিরুদ্দীন অতি জনপ্রিয় হয়ে ওঠেন। ইন্দ্রমিত্র ছদ্মনামে কবি অরবিন্দ গুহও খুব ভালো অনুবাদ করেছিলেন নাসিরুদ্দীনের। আধুনিককালের বটতলার বই-এর কল্যাণে এবং দূরদর্শনের দৌলতে এখন তো নাসিরুদ্দীন বাঙালির ঘরে ঘরে।

দাক্ষিণাত্যের তেনালি রামনও ধীরে ধীরে বাঙালি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করছে।

এবার আমাদের আলোচ্য বিষয় বীরবল।

বীরবলের ঐতিহাসিক তত্ত্বে যাব না। দুইটি পরিচিত গল্প একটু নেড়েচেড়ে দেখব।

একদা সম্রাট আকবর বীরবলকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, "আচ্ছা বীরবল, আপনি বলুন তো সত্য ও মিথ্যার মধ্যে ব্যবধান কতটুকু?"

এই প্রশ্নের উত্তরে বীরবল সঙ্গে সঙ্গেই জবাব দিলেন। একটুও না ভেবে ঝটপট উত্তর দিলেন, "মাত্র চার আঙুল হুজুর।"

সম্রাট আকবর অবাক। সভাসদরাও অবাক। এমন জটিল প্রশ্নের এরকম সরল উত্তর কিভাবে সম্ভব! চার আঙুল মাপল কে? কিভাবে? কি প্রকারে?

বেশিক্ষণ হেঁয়ালি না করে বীরবল বললেন, 'হুজুর মেপে দেখুন আমাদের চোখ আর কানের মধ্যে দূরত্ব ওই ঠিক চার আঙুল। আমরা চোখ দিয়ে যা দেখি তাই সত্য, চোখ কখনো মিথ্যা দেখায় না। সবই সত্য দেখায়। অন্যদিকে কান দিয়ে যা শুনি তার অনেকটাই সত্য নয়, অন্তত এক দুটা মিথ্যা।' মধ্যযুগের রীতি মেনে বীরবলের অধিকাংশ গল্পই উপদেশমূলক নীতিকাহিনী। বীরবলের জনপ্রিয়তার একটা বড় কারণ বীরবলের কাহিনিতে সর্বত্রই ন্যায়ের জয় হয়েছে।

একটি গল্পে দেখা যাচ্ছে একটি টাকার থলি নিয়ে দুই ব্যক্তির মধ্যে বিবাদ লেগে গেছে। এই দুজনের মধ্যে প্রথমজন হলেন এক পুরোহিত। দ্বিতীয় ব্যক্তি একজন কসাই, মাংস বেচে খায়। দুই ব্যক্তিই দাবি করছে টাকার থলিটি তার। অসামান্যভাবে এই সমস্যার সমাধান করেছিলেন বীরবল। তিনি টাকার থলিটি নিয়ে গোপনে পরীক্ষা করে দেখলেন থলির মধ্যে যে মুদ্রাগুলি আছে সেগুলির গায়ে মাংসের রক্ত, ছিবড়ে, চর্বি এসব লেগে রয়েছে। তিনি নিশ্চিত হলেন এই টাকা কসাই মাংস বেচে পেয়েছে। ব্রাহ্মণ পুরোহিতের টাকায় মাংস রক্ত এসব কোথা থেকে আসবে?

বলা বাহুল্য, কসাই আশা করেনি বামুন ঠাকুরের কথা ফেলে বীরবল তার থলে তাকে উদ্ধার করে দেবেন। থলি ফেরত পেয়ে কসাই ধন্য ধন্য করতে লাগল।

রাজাদের অনেক রকম খামখেয়ালিপনা থাকত। হঠাৎ সম্রাট আকবর একদিন বহুজনের সামনে বীরবলকে জিজ্ঞাসা করলেন, "আচ্ছা বলুন তো, আমাদের এই দিল্লি শহরে ইঁদুরের সংখ্যা কত?"

বীরবল বেশ চিন্তা করে যেন মনের মধ্যে অনেক গোনাগুনতি করলেন, এমন ভাব দেখিয়ে অবশেষে একটা কাল্পনিক সংখ্যা বললেন, 'এক লক্ষ তেইশ হাজার সাতশ বত্রিশ।'

সকলেই অবাক। সম্রাটও তাই। কি করে বীরবল এই সংখ্যাটা পেলেন। সে কথা সম্রাট জানতে চাওয়ায় বীরবল বললেন, 'রাজধানীর ইঁদুরের এটাই সঠিক সংখ্যা তবে সময় সময় কম-বেশি হতে পারে।'

সম্রাট বললেন, 'কম-বেশি কেন হবে?' বীরবল উত্তর দিলেন, 'যদি কম হয় বুঝবেন কিছু ইঁদুর দিল্লির বাইরে আত্মীয় বাড়িতে বেড়াতে গেছে, কিংবা ভ্রমণ করতে বা তীর্থ করতে গেছে। আর যদি বেশি হয় জানবেন যে কিছু ইঁদুর বাইরে থেকে দিল্লিতে বেড়াতে এসেছে।'

যথারীতি বীরবলের ছেলেও বীরবলেরই মতো। সেই শিশুটি বাবার সঙ্গে এসে রাজসভায় বসে থাকত। সম্রাট আকবর তাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'তুমি সকলের সব কথা বুঝতে পার?'

শিশুটি গম্ভীর হয়ে বলেছিল, 'অল্পবিস্তর পারি।'

সম্রাট অবাক। 'অল্পবিস্তর মানে কি?'

শিশুটি বুঝিয়ে বলল, 'যারা আমার থেকে বড়, তাঁদের কথা অল্প বুঝতে পারি। যারা আমার থেকে ছোটো তাদের কথা বেশি বুঝতে পারি।'

পুনশ্চ (১) : শুধু পুরোনো গল্প বলার জন্যে বীরবল বিষয়ক এ রচনা নয়। বাংলার রম্যরচনার জনক মহামহিম প্রমথ চৌধুরী স্মরণে এই লেখাটি রচনা করলাম। বীরবলের রসবোধ এবং যুক্তি-ক্ষমতা প্রথম চৌধুরীর ছিল। তাই এই ছদ্মনামের সার্থক অধিকারী তিনি।

পুনশ্চ (২) : একটি কীটদষ্ট পুরোনো ইংরেজি বই, বোধহয় কোনো সময়ে স্কুলপাঠ্য ছিল। কার লেখা, কী বৃত্তান্ত প্রথম দিকের পৃষ্ঠাগুলি নেই। আরও অনেক বই-এর সঙ্গে এই বইটি বহুদিন ধরে আমার সঙ্গে সঙ্গে ঘুরছে। আর রাখা যাচ্ছে না, এবার ফেলে দিতে হবে। তার আগে এই রচনাটা লিখে রাখলাম।

পুনশ্চের পরে আর লেখার নিয়ম নেই। কিন্তু আমার এই পুরোনো বইটির সঙ্গ অবশেষে আমাকে বিসর্জন দিতে হবে, এই ভাবনায় এই বইটি থেকে আর একটি গল্প লিখে রাখছি।

পৃথিবীতে নানারকম কঠিন প্রশ্ন আছে যার জবাব খুঁজে পাওয়া কঠিন।

যেমন গাছ আগে না বীজ আগে, পাখি আগে না ডিম আগে, এরকম প্রশ্নের জবাব কোনোদিন মেলেনি। আর একটি অতি জটিল প্রশ্ন হাঁস, মুরগি ইত্যাদি যে সব পাখির ডিম মানুষ খায় সেগুলি নিয়মিত ডিম পাড়ে। একসঙ্গে টানা কয়েকদিন, কিঞ্চিৎ বিরতি দিয়ে আবার অনেকদিন। কিন্তু যেসব পাখির ডিম মানুষ খায় না, যেমন—কাক, কোকিল, চড়ুই, ঘুঘু সেগুলি বছরে একবার একজোড়া ডিম পাড়ে। কেন?

এইরকমই একটা জটিল প্রশ্ন হাতের তালুতে কেন লোম গজায় না। সম্রাট আকবরের সভাসদেরা সম্রাটকে অনুরোধ করেছিল, 'হুজুর, আপনার বীরবল তো সব জানে, বোঝে তাঁকে একবার জিজ্ঞাসা করুন তো, হাতের তালুতে কেন লোম গজায় না?'

সভাসদদের অনুরোধ মতো সুবুদ্ধি সম্রাট একটু কায়দা করে নিজেকে জড়িয়ে বীরবলকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আচ্ছা, মহামতি বীরবল, আপনি আমার হাতখানা একটু দেখুন, দেখে বলুন, আমার হাতের তালুতে কেন লোম গজায় না?

বীরবল সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিলেন, 'হুজুর, সারাদিন আপনি দুই হাতে কত দানধ্যান করেন। দরিদ্রকে ভিক্ষা দেন, সম্মানীয়কে উপহার দেন, জ্ঞানীগুণীকে পুরস্কার দেন। এসবের ফলে আপনার হাতের তালুতে লোম গজাবার সুযোগ পায় না।'

সম্রাট এবার চেপে ধরলেন বীরবলকে, 'এই কথা? তাহলে আপনার হাতের তালুতে লোম নেই কেন?'

বীরবল মৃদু হেসে বললেন, 'সারাদিন আপনার হাত থেকে অনুগ্রহের দান নিচ্ছি দুহাত পেতে। সবসময়ই হাত জোড়া থাকছে। বলুন তো, লোম গজাবে কখন?'

আকবর বাদশা এত সহজে ছাড়বার নন। বললেন, 'তাহলে এবার বলুন আমার এই সভাসদদের হাতের তালুতে লোম গজায় না কেন?

বীরবব বললেন, 'ক্রোধে আর হিংসায় ওদের তালুতে লোম গজায়নি। আপনি আমাকে যত ভালোবাসেন, উপহার-পুরস্কার দেন, ওদের দুহাত নিশপিশ করে ওঠে আমার গলা টিপে ধরার জন্যে। ওরা হাত কচলাতে থাকে। হাতের ঘষায় লোম ওঠা তো দূরে থাক, তালু ক্ষয়ে যায়। আমাকে কবেই মেরে ফেলত ওরা, শুধু আপনি আছেন বলে আপনার সুশাসনে ওরা কিছু সাহস পায় না।

মাথাখারাপ

অনেকের মনে বদ্ধমূল ধারণা হয়েছে আমার মাথা সম্পূর্ণ খারাপ হয়ে গেছে। সম্পূর্ণ খারাপ।

আমার শুভানুধ্যায়ীরা অনেকে দুপুরের দিকে, অর্থাৎ আমি যখন বাড়িতে থাকি না, আমার অনুপস্থিতির সুযোগে আমার স্ত্রী-পুত্রের সঙ্গে দেখা করে খোঁজ নিতে আসেন।

আমি কেমন আছি, আমার পরিবারবর্গের কোনো অসুবিধে হচ্ছে কিনা, কাচের গেলাস, আয়না, চশমা ইত্যাদি ভঙ্গুর দ্রব্য ছুঁড়ে ফেলার প্রবণতা আমার কী রকম— এই জাতীয় বহুবিধ প্রাসঙ্গিক, অপ্রাসঙ্গিক প্রশ্ন, পরামর্শ ও উপদেশে আমার পারিবারিক জীবন বিপর্যস্ত হতে চলেছে।

একজন সুহৃদ নিজের পকেটের এক টাকা একত্রিশ পয়সা ব্যয় করে একগাছা তিরুলির বিখ্যাত পাগলের বালা আমার স্ত্রীকে পৌঁছে দিয়ে গেছেন, নিকটবর্তী কৃষ্ণপক্ষ মঙ্গলবার শেষ রাত্রিতে আমাকে গঙ্গাস্নান করিয়ে সেটা পরাতে হবে, তাহলে আর ভয় অথবা চিন্তার কোনো কারণ থাকবে না। পাগলের স্বাভাবিক প্রবৃত্তিবশত শেষ রাত্রে গঙ্গাস্নান করতে কিংবা বালা পরতে আমি বাধা দিতে পারি; আমার স্ত্রী যদি প্রয়োজন বোধ করেন তাহলে সেই বিশিষ্ট দিনে যথাসময়ে কয়েকজন বলশালী

লোক নিয়ে আমার সেই সুহৃদ আমার স্ত্রীকে সাহায্য করতে আসবেন বলে জানিয়ে গেছেন।

আরেকজন একটি দাতব্য মানসিক চিকিৎসালয়ের দরখাস্ত ফর্ম রেখে গেছেন। সেই ফর্মে কিছুই করতে হবে না, শুধু আমার স্ত্রী ও ভাই এবং দুজন প্রতিবেশী মাননীয় পুলিশ কমিশনার বাহাদুরের কাছে দরখাস্ত করবেন যে সামাজিক এবং পারিবারিক নিরাপত্তার প্রয়োজনে অবিলম্বে আমাকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করে কোনো মানসিক ওয়ার্ডে প্রেরণ করা প্রয়োজন। এর জন্য বিশেষ তদন্তের প্রয়োজন হবে না। যে কোনো দুই বা তিন কিস্তি 'কথায় কথায়' আবেদনের সঙ্গে জুড়ে দিলেই কমিশনার সাহেব আবেদনের যৌক্তিকতা এবং গুরুত্ব অনুধাবন করতে পারবেন।

এই দ্বিতীয় ভদ্রলোক নিতান্ত বেপরোয়া। যেদিন দরখাস্ত ফর্ম এনেছিলেন তারপর দিনই খোঁজ নিতে এলেন কতদূর কী হল। যখন আমার স্ত্রীর কাছে শুনলেন যে আমি সেই দরখাস্ত ফর্ম দেখে রেগে গিয়ে কুচিকুচি করে ছিঁড়ে ফেলে দিয়েছি, তিনি কপাল চাপড়িয়ে 'হায় হায়' করে উঠলেন এবং 'আর দেরি নয়, আর দেরি নয়' এই বলে দ্বিতীয় ফর্ম সংগ্রহের জন্য আমাদের বাড়ি থেকে দ্রুত নিষ্ক্রান্ত হলেন। বোধহয় ইচ্ছা ছিল সেদিনই আরেকটি ফর্ম নিয়ে আসবেন।

দুঃখের বিষয়, সেদিন উল্টোরথের জন্য আমাদের অফিস কয়েক ঘণ্টা আগে ছুটি হয়ে গিয়েছিল। উনি আমাদের বাড়ি থেকে বেরিয়ে গলির মোড়ে এসে দাঁড়িয়েছেন, আমিও ট্রাম থেকে নেমে ফিরছি। একেবারে মুখোমুখি দেখা। তিনি আমাকে দেখে একেবারে ভূত দেখার মতো চমকিয়ে উঠলেন। আমি ঠিক করে ফেললাম এঁকে উচিত শিক্ষা দিতে হবে।

সোজাসুজি বন্ধুবরকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'এদিকে কোথায় এসেছিলেন?' ভদ্রলোক আমতা আমতা করে বললেন, 'এই তোমার বাড়িতে।' আমি বললাম, 'আমিও আপনার বাড়ি হয়েই আসছি।'

ভদ্রলোক কেমন ফ্যাকাশে হয়ে গেলেন, 'আমার বাড়িতে, এই ভরদুপুরে আমার বাড়িতে কী জন্য।' তাঁর গলা কেমন যেন শুকিয়ে এল। আমি বললাম 'আপনার গলা কেমন শুকিয়ে গেছে, একটু জল খেয়ে নিন।' বলে তাঁকে পাশেই মোড়ের মুখে টিউবওয়েলের কাছে প্রায় ঠেলে নিয়ে গেলাম। বহুদিন অভ্যাস নেই মনে হল, ঘাড় গুঁজে টিউবওয়েলের মুখে মুখ লাগিয়ে জল খেতে তাঁর খুবই কষ্ট হচ্ছিল। কিন্তু আমি ছাড়লাম না, কর্কশ গলায় 'আরো খান আরো খান' হুকুম করে প্রায় এক গ্যালন জল খাওয়ালাম। যখন সোজা হয়ে দাঁড়ালেন, তখন টইটম্বুর জল খেয়ে ঢক ঢক করে টলছেন। সাদা জল খেয়ে কাউকে এর আগে এত বেসামাল হতে দেখিনি।

অবশ্য একটু পরেই সামলিয়ে নিলেন এবং ঠিক তখনই আবার হুঁশ হল তাঁর, 'আমার বাড়িতে কেন গিয়েছিলেন!'

আমি তাঁর চোখের দিকে স্থির দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলাম। গল্পে-উপন্যাসে

পড়েছি পাগলেরা মারাত্মক কিছু করার আগে এইভাবেই দৃষ্টি নিক্ষেপ করে। তিনি বেশিক্ষণ আমার চোখের দিকে তাকিয়ে থাকতে সমর্থন হলেন না। ভয়ে ভয়ে মাথা নামিয়ে নিলেন। এইবার আমি তাঁর একটু আগের প্রশ্নের জবাব দিলাম, হিমশীতল কণ্ঠে বললাম, 'আপনার বাড়িতে গিয়েছিলাম পেটানোর জন্য?' 'পেটানোর জন্য', সদাশয় পরোপকারী বন্ধু হার্টফেল করেন আর কী, 'কাকে পেটানোর জন্য?'

ভদ্রলোকের উৎকণ্ঠা দেখে বড় আনন্দ হল। মৃদু হেসে বললাম, 'কাকে আর? আপনিও বাড়ির বাইরে, আপনার স্ত্রীও অফিসে। প্রথমে পেটালাম আপনার চাকরকে, সে দরজা খুলে দিতেই তাকে ল্যাং মেরে ফেলে দিলাম। কিন্তু সে ব্যাটা মহা ধড়িবাজ। সে উঠে দাঁড়াতেই টেবিলের উপর থেকে যেই তাকে আপনার টাইমপিসটা ছুঁড়ে মারলাম, ব্যাটা ছুটে গিয়ে রান্নাঘরে দরজা আটকিয়ে চ্যাঁচাতে লাগল। তারপরে পেটালাম আপনার ছোটো ছেলেটিকে। কিন্তু যাই বলুন, আপনার বড় ছেলেটি বড় তুখোড়, রেডিয়োটা ছুঁড়ে মারতেই সে ছোকরা সামনের চারতলা বাড়িটার কার্নিসে উঠে বসে রইল; কিছুতেই ধরতে পারলাম না।'

আর অধিক বর্ণনার প্রয়োজন হল না, ভদ্রলোক বাড়ির দিকে ছুটতে লাগলেন।

লেখা ও লেখক

'দৈনিক সংবাদ' পত্রিকার শারদীয়া সংখ্যার জন্যে এই নিবন্ধটি রচনা করতে গিয়ে কয়েক বছর আগের একটি ঘটনার কথা মনে পড়ছে।

দৈনিক সংবাদ যে শহর থেকে প্রকাশিত হয় সেই ত্রিপুরার রাজধানী আগরতলায় প্রতি বছর খুব হইহই করে একটি বইমেলা হয। কলকাতার বড় বড় প্রকাশকেবা সেই মেলায় যোগদান করেন। সে বছর আমি ওই মেলায় প্রধান অতিথি রূপে যোগদান করেছিলাম, মাননীয় শিক্ষামন্ত্রীর সৌজন্যে।

বিশাল মঞ্চ বিশালতর সভাপ্রাঙ্গণ। প্রচুর লোকজন, কেনা-বেচা কলরব। মাননীয় রাজ্যপাল উদ্বোধন করলেন। তারপর অতিথিবরণ ইত্যাদি এবং আমাব ভাষণ।

কী বলব ঠিক করতে পারছিলাম না। এত ভালো সুশিক্ষিত ও বোদ্ধা শ্রোতা কলকতায় আমাদের কপালে জোটে না। আমাকে উদ্ধার করলেন পরম গুরু সৈয়দ মুজতবা আলি। মনে পড়ল ত্রিপুরার কাছাকাছি আসামের তৎকালীন শ্রীহট্ট জেলার লোক ছিলেন তিনি। বই বিষয়ে তার একটি সরস গল্প যেকোনো বইমেলাতে বলা যায়।

বলাবাহুল্য এই গল্পটি বই নিয়েই এবং মূল গল্পটি বোধহয় বিদেশি।

এক ভদ্রমহিলা একটি বড় দোকানে তার স্বামীর জন্য উপহার কিনতে এসেছেন, স্বামীর জন্মদিন। ভদ্রমহিলাকে চামড়ার মানিব্যাগ থেকে সিল্কের জামা, চিত্র-বিচিত্র পাঞ্জাবি, ঘড়ি, কলম, সিগারেট কেস, লাইটার দোকানের ম্যানেজার সাহেব ঘুরে ঘুরে দেখালেন কিন্তু ভদ্রমহিলার কিছুই পছন্দ হয় না, তিনি বলেন এইসব জিনিসই আমার বরের একটা করে আছে। অবশেষে ছাতা, লাঠি, টর্চলাইট, পারফিউম, দাড়ি কামানোর সেট, এসবও ভদ্রমহিলার পছন্দ হল না। ম্যানেজারবাবু অবশেষে ভদ্রমহিলাকে বই-এর শো-কেস-এর কাছে নিয়ে গেলেন। সেখানে উপহার দ্রব্য বাংলা-ইংরেজি বহু বই রয়েছে। ভদ্রমহিলা বইগুলো দেখে বললেন না, বই চলবে না আমার স্বামীর বইও একটা আছে।

এই গল্পের পরের অংশটুকু অবশ্য আমার সংযোজন।

......সেই ভদ্রমহিলাই কয়েক মাস পরে আবার ওই দোকানে এসেছেন। ভদ্রমহিলাকে দেখেই দোকানের ম্যানেজার চিনতে পেরেছেন। তাড়াতাড়ি এগিয়ে এলেন। ভদ্রমহিলা বললেন, বিশেষ কিছু দেখাতে হবে না আমাকে একটা সুন্দর দেখে বই দিন।

ম্যানেজার ভদ্রলোক তো অবাক। আগে অভিজ্ঞতা মনে ছিল। তিনি প্রশ্ন করলেন—বই কার জন্যে ম্যাডাম? ভদ্রমহিলা সলজ্জ হেসে বললেন—আমার জন্যে। ম্যানেজার-বাবু তখন বললেন, আপনাদের তো, আমার যতদূর মনে পড়ছে, আপনি বলেছিলেন, একটা বই আছে, সে বইটা কি হারিয়ে গেছে?

ভদ্রমহিলা খুব গদগদ কণ্ঠে উত্তর দিলেন, না ঠিক তা নয়...... আসলে হয়েছে কী, কাল আমার জন্মদিন ছিল আমার বর আমাকে একটা সুন্দব টেবিল ল্যাম্প উপহার দিয়েছেন। আমার তো নিজের কোনো বই নেই, তাই নতুন টেবিল ল্যাম্পে পড়বার জন্যে একটা বই কিনতে এসেছি।

এ গল্প এখানেই শেষ। কিন্তু আমি গল্পের শেষে বলেছিলাম যে, গল্পের ওই ভদ্রমহিলাকে আমি চিনি। তিনি এই বইমেলায় এসেছেন, দূরে দেখতে পাচ্ছি। তাঁকে আমার অনুরোধ, অন্তত একটা বই কিনবেন, বইমেলায় যখন এসেছেন।

সভায় উপস্থিত শ্রোতারা সকলে উঠে দাঁড়িয়ে বা ঘাড় ঘুরিয়ে সেই কাল্পনিক গ্রন্থ ক্রেতা মহিলাকে খুঁজছিলেন এবং তাকে দেখতে না পেয়ে যে প্রবল করতালি দিয়ে আমাকে অভিনন্দিত করেছিলেন। জীবনে অমন অভিনন্দন তার আগে কিংবা পরে পাইনি। আগরতলা বইমেলা সেই কারণে আমাদের কাছে স্মরণীয় হয়ে আছে।

এই পর্যন্ত লিখে মনে হচ্ছে এটা তো একটা বোকামি হয়ে গেল একেবারে নিজের কথা দিয়ে শুরু করলাম। এবার একটু বিলিতি লেখকদের কাছ থেকে ঘুরে আসতে পারি।

বিখ্যাত লেখক ড্রাইডেনকে তাঁর গুণমুগ্ধ এক সুন্দরী মহিলা বলেছিলেন আপনি রাত-দিন বই নিয়ে এত ডুবে থাকেন আমার ইচ্ছে করে পরের জন্মে বই হয়ে জন্মাই। ড্রাইডেন বই পড়তে পড়তে একবার চোখ তুলে তাকিয়ে সেই অনুরাগিনীকে

বলেছিলেন, প্রস্তাবটা খুবই সুন্দর। কিন্তু মেম সাহেব আপনাকে 'অ্যালমানাক' (Almanac = পঞ্জিকা) হয়ে জন্মাতে হবে যাতে বছর বছর আপনাকে পালটাতে পারি।

ড্রাইডেন-এর পর অবশ্যই জর্জ বার্নাড শ-র কাছে যেতে পারি। সবাই জানে, বার্নাড শ ছিলেন চূড়ান্ত বাক্যবাগীশ কিন্তু দেখতে মোটেই ভালো ছিলেন না। একটু ইতস্তত করে বলা যেতেই পারে দেখতে কুৎসিত ছিলেন। একবার এই চিরকুমার, তীক্ষ্ণধী বিখ্যাত লেখককে এক পরমা সুন্দরী অভিনেত্রী অনুরোধ করেছিলেন, জর্জ তুমি আমাকে বিয়ে করবে? বার্নাড শ অবাক হয়ে বলেছিলেন, কেন? মহিলা লজ্জার মাথা খেয়ে বলেছিলেন—তাহলে, আমাদের যে সন্তান হবে সে তোমার মেধা আর আমার সৌন্দর্য নিয়ে জন্মাবে। স্থিরবুদ্ধি বার্নাডশ অভিনেত্রীর দিকে তাকিয়ে ম্লান হাসি হেসে বলেছিলেন, কিন্তু এর যদি বিপরীত হয়? অভিনেত্রী জিজ্ঞাসা করলেন, এর আবার বিপরীত কী হবে? বার্নাড শ বললেন, শোনো বুঝিয়ে বলছি। এমনও তো হতে পারে সে সন্তানটি আমার মতো কুৎসিত আর তোমার মতো নির্বোধ নিরেট হয়ে জন্মাল।

জর্জ বার্নাড শ-র তিক্ত উক্তি দিয়ে রমরচনা ভারাক্রান্ত করব না।

তবে একটা কথা বলে রাখি বার্নাড শ সম্বন্ধে বই চুরির যে গল্পটি প্রচলিত আছে সেটি সত্যি নয়। আসলে অনেক আজগুলি গল্প বার্নাড শ-র নামে চলছে। যে গল্পটির কথা বলছি সেটি এইরকম : লেখকের বাড়িতে যত্রতত্র সিঁড়িতে মেঝেতে খাটের ওপরে খাটের নীচে হাজার হাজার বই ছড়ানো। তাঁকে এক শুভানুধ্যায়ী বলেছিলেন দু-একটা আলমারি কিনতে পারেন। তার উত্তরে সেই লেখক মার্ক টোয়েন বলেছিলেন, ভাই এই বইগুলো যেভাবে এনেছি আলমারি তো সেভাবে আনা যাবে না। অর্থাৎ বইগুলো বন্ধুবান্ধব চেনা পরিচিতদের কাছ থেকে চেয়ে চিনতে ধার করে এমনকী চুরি করে পর্যন্ত এনেছেন। আলমারি তো সেভাবে আনা যাবে না। এই গল্পটি আর একভাবে শুনেছি তাতে অবশ্য বার্নাড শ যুক্ত নন। এখানে সংশ্লিষ্ট লেখক বলছেন, বইগুলো বন্ধুবান্ধবদের কাছ থেকে ধার করে এনেছি। আলমারি তো কেউ ধার দেবে না।

যা হোক আলমারির কাছেই যখন এসে গেছি গ্রন্থাগারে বই-এর আলমারির কাছেই কিছুক্ষণ ঘোরাঘুরি করি। জনৈক প্রতিষ্ঠিত লেখক গ্রন্থাগারে গিয়ে দেখেন তার সমস্ত বই থাকে থাকে সুন্দর করে সাজানো আছে। তাকে গ্রন্থাগারিক বললেন, বইয়ের লিস্ট মিলিয়ে দেখুন, আপনার সব বই এখানে রয়েছে। একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ছেড়ে সেই লেখক বলেছিলেন, এর চেয়ে যদি দেখতাম দু-দশটা বই নেই—পাঠকেরা পড়তে নিয়ে গেছেন, তাহলে অনেক খুশি হতাম। অন্তত এইটুকু জেনে আনন্দ পেতাম যে লোকেরা আমার বই পড়ছে। বিলিতি লেখকদের নিয়ে যে সব কাহিনি শোনা যায় তার অধিকাংশ নিছক গল্পকথা।

আলেকজান্ডার দুমার সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছে বললে আন্তর্জাতিক সীমান্তে পাসপোর্ট লাগত না। এ গল্প মোটেই টেকসই নয়। অন্য এক কালজয়ী লেখক সম্পর্কে এখনো একটি গল্প বাজারে প্রচলিত আছে।

সেটি মিথ্যে নাও হতে পারে। আমাদের দেশেও এরকম লেখক দু-চারজন আছেন। গল্পের বিদেশি লেখকটি তখন জনপ্রিয়তার তুঙ্গে। মাসে-মাসে, সপ্তাহে-সপ্তাহে, তাঁর বই বেরোচ্ছে, বইয়ের নতুন সংস্করণ হচ্ছে। এসব বই তিনি আর নিজের হাতে লেখেন না। অতো কষ্ট তার পোষায় না।

(এই অনুলিখন ব্যাপারটা কিন্তু আমাদের দেশেও আজ বেশ কিছুদিন হল চালু হয়ে গেছে কিন্তু আমি ভাবতেই পারি না নিজের হাতে না লিখে লেখা হয় কী করে।)

তা, যে বিদেশি লেখকের কথা বলছিলাম তিনি একদিন তাঁর বাড়িতে সকাল বেলা দোতলা থেকে নামছিলেন। সিঁড়ির উপর তাঁর ছেলের সঙ্গে দেখা। সেই সময় লেখকের একটা বই বাজারে তুমুল শোরগোল ফেলে দিয়েছে। লেখক সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে ছেলেকে উঠতে দেখে বললেন—আমার নতুন বইটা নিয়ে খুব হইচই হচ্ছে। তুমি বইটা পড়েছ? ছেলে বাবার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করল, বাবা তুমি নিজে বইটা পড়েছ?

আর বিদেশি লেখক নয়, পুজোর বাজারে রচনা বড় হয়ে যাচ্ছে। এবার খাঁটি দেশি লেখকে ফিরে আসি।

শরৎচন্দ্র থেকে খাঁটি দেশি লেখক আর কে আছেন। অবশেষে শরৎচন্দ্রের দুটি ছোটো গল্প—

(১) ঠাকুর বাড়িতে রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যসভায় শরৎচন্দ্র। ঠাকুর বাড়িতে এ আসে সে যায়। সবসময় ভিড়। এরই ফাঁকে জুতো চুরি যায় আমন্ত্রিতদের অভ্যাগতদের, শরৎচন্দ্র সেটা জানতেন, রবীন্দ্রনাথও জানতেন।

শরৎচন্দ্র জুতো চুরির ভয়ে নিজের পায়ের জুতো-জোড়া খুলে ভালো করে কাগজ দিয়ে মুড়ে নিয়েছেন ঘরে ঢোকার আগে। তিনি ঘরে ঢুকতে তাঁর বগলে মোড়কটি দেখে রবীন্দ্রনাথ হেসে জিজ্ঞাসা করেছিলেন—কী হে শরৎ? তোমার বগলে ওটা পাদুকা পুরাণ নাকি?

(২) শরৎচন্দ্রের যুগে আরও এক শরৎচন্দ্র ছিলেন। শরৎচন্দ্র পণ্ডিত। বিদূষক নামে তিনি একটি খুব জনপ্রিয় রঙ্গব্যঙ্গ পত্রিকা প্রকাশ ও সম্পাদনা করতেন। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে একটি অনুষ্ঠানে দেখা। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের তখন 'চরিত্রহীন' উপন্যাস বেরিয়েছে। এদিকে শরৎচন্দ্র পণ্ডিত বিদূষক নামে খ্যাতির তুঙ্গে। ঔপন্যাসিক শরৎচন্দ্র তাঁকে দেখে সাদরে আহ্বান করলেন, 'এই যে বিদূষক শরৎচন্দ্র।' বিদূষক তথা দাদাঠাকুর ছিলেন কিংবদন্তির বাক্ কবি। তিনি মুহূর্তেই জবাব দিলেন, 'এই যে চরিত্রহীন শরৎচন্দ্র।'

আপাতত এখানেই শেষ। শরৎচন্দ্রের পরে আর রেশ টানা উচিত হবে না।

গঙ্গারাম ও মহাকাব্য

সেদিন সকালটা খুব সুন্দর ছিল। অনেকদিনের বৃষ্টি আর মেঘলা আকাশের বদলে সুন্দর ঝকঝকে সকাল। অমল-ধবল পালে পুরোনো দিনের সাদা মেঘেরা ফিরে এসেছে আকাশের আনাচে-কানাচে। আমাদের জানলার ওপারে ছোটো পার্কটায় কতরকম যে পাখি এসেছে, কতরকম যে চেনা-অচেনা বুনো ফুল ফুটেছে, অনেকদিন পর পরপর দু পেয়ালা চা খেয়ে ভাবলাম একটা প্রেমের কবিতা লিখি।

কিন্তু আমার ভাগ্য অত ভালো নয়। হঠাৎ খুশিতে মশগুল হয়ে কী একটা পুরোনো গান গুনগুন করতে করতে গঙ্গারাম ঘরে ঢুকল। একটু আগে সে-ই বাইরের দরজায় বেল বাজিয়েছিল। আমি পাত্তা দিইনি। ভাবলাম কোনো হকার বা ক্যানভাসার। নিদেনপক্ষে কোনো তরুণ সম্পাদক পুজোর লেখার জন্য এসেছে, তা তো নয়, এ যে স্বয়ং গঙ্গারাম। কী এক অজ্ঞাত গৌরবে তার মুখ উদ্ভাসিত। মনে হচ্ছে যেন কোনও রাজ্য জয় করে এসেছে। মনে পড়ল এইরকম শারদ প্রাতে পুরাকালের রাজা-রাজড়ারা যুদ্ধ করতে বেরোতেন। কিন্তু একটু থিতু হয়ে বসে এরপর গঙ্গারাম যা বলল তা যুদ্ধ জয়ের থেকেও মারাত্মক।

সে অনেক কিছু বলল, তার মর্মার্থ এইরকম। সে সম্প্রতি মহাকাব্য পাঠ করছে। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়ছে। এবং তার মধ্যে প্রচুর অসঙ্গতি আবিষ্কার করেছে।

গঙ্গারাম অবশ্য এত ভদ্রভাবে কথাগুলো বলেনি, সে বলল আমাদের হিন্দু প্রাচীন সাহিত্যে প্রচুর বুজরুকি আছে। আমি তাকে থামিয়ে দিয়ে বললাম, ধর্মের নাম তুলে এ ধরনের কথা বলতে নেই। হিন্দু বলে পার পেয়ে যাবে আর কোনো ধর্মের এ ধরনের বেয়াদপি সহ্য করবে না। তোমার ভাগ্য ভালো। তুমি একে হিন্দু তার ওপরে বাঙালি, ওই বুজরুকি-টুজরুকি বললে গুজরাতে, মহারাষ্ট্রে বিপদ হতে পারত। রীতিমতো মার খেতে হত।

আমার কথা শুনে গঙ্গারাম একটু চুপ করে গেল, কিন্তু সে সহজে দমবার পাত্র নয়।

দুটো মহাকাব্য, রামায়ণ এবং মহাভারত। দুটোর মধ্যেই সে নানারকম গোঁজামিল খুঁজে পেয়েছে। প্রথমে সে রামায়ণ নিয়ে পড়ল।

গঙ্গারাম আমাকেই প্রশ্ন করল রামায়ণে লক্ষ্মণ যে শূর্পণখার নাক-কান কাটল সেটা কীভাবে। আমি বিনীত ছাত্রের মতো জবাব দিলাম কেন তীরধনুক দিয়ে।

গঙ্গারাম তখন বলল, লক্ষ্মণ কি শূর্পণখার মুখের দিকে না তাকিয়েই মাটির দিকে তাকিয়ে তার নাক-কান কেটেছিল?

আমি বললাম, কেন?

গঙ্গারাম বলল, লক্ষ্মণ তো কোনো মহিলার মুখের দিকে তাকাত না।

আমি অবাক হয়ে বললাম, একথা তুমি জানলে কী করে?

গঙ্গারাম বেশ গর্বিতভাবে বলল, একথা জানার কী আছে! লক্ষ্মণ তো নিজেই বলেছে।

আমার মুখে প্রশ্নচিহ্ন দেখে গঙ্গারাম বুঝিয়ে বলল, সীতাহরণ করার পরে রাম আর লক্ষ্মণ যখন সীতাকে খুঁজতে বের হল তখন পথের মধ্যে ফেলা সীতার গায়ের অলংকার দেখে দেখে রাম বুঝে নিয়েছিল সীতাকে কোন্ পথে নিয়ে গেছে। সীতা বুদ্ধিমতী মেয়ে এইভাবেই রাম-লক্ষ্মণকে জানাতে চেয়েছিল তাকে হরণ করে কোথায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। রাম রাস্তা থেকে গয়নাগুলো তুলে নিয়ে একটা একটা করে লক্ষ্মণকে দেখিয়ে জিজ্ঞেস করেছিল এটা কি সীতার গয়না? লক্ষ্মণ কিন্তু বলতে পারেনি। তার কারণ সে পায়ের দিকে ছাড়া কোনো মহিলার শরীরের আর কোনো দিকে সম্ভ্রমভরে তাকাত না। তাই লক্ষ্মণ সীতার পায়ের নূপুর-জোড়া শুধু চিনতে পেরেছিল।

আমি গঙ্গারামের বক্তব্য আত্মস্থ করাব চেষ্টা করছিলাম। এবার সে বলল, আচ্ছা শূর্পণখাও তো মহিলা।

আমি বললাম যে, সে তো রাক্ষুসি।

গঙ্গারাম বলল, রাক্ষুসি বললে তো চলবে না। শূর্পণখা সুন্দরী মানবী সেজে রাম-লক্ষ্মণের কাছে এসেছিল।

আমি বললাম, চোখে দেখেই তির ছুঁড়তে হয় তা তো নয়। নানারকম বাণ-টান তো আছে।

গঙ্গারাম হেসে বলল, আর কোনো বাণ নয়, শুধু একটা বাণ আছে শব্দভেদী বাণ। সেটা দিয়ে নাক কাটা যেতে পারে। নাক দিয়ে নিঃশ্বাসের শব্দ বেরোয় কিন্তু কান; কান দিয়ে তো কোনো শব্দ বেরোয় না, কান কাটল কী করে?

গঙ্গারামের চোখে-মুখে কেমন একটু গোলমেলে ভাব দেখে আমি একটু চিন্তিত হয়ে পড়লাম। যাক গে, অনুরূপ চিন্তা থেকে নিবৃত্ত করার জন্যে আমি গঙ্গারামকে বললাম, দ্যাখো গঙ্গারাম রামায়ণ-মহাভারতে ভুল-ত্রুটি তুমিই প্রথম ধরছ না। বঙ্কিমচন্দ্র এক কাল্পনিক সাহেবের কথা লিখেছিলেন। সেই সাহেব রামায়ণের মহাকবিকে মূর্খ বলেছিলেন। কারণ রামায়ণ মহাকাব্যের দ্বিতীয় অধ্যায়ের নাম অযোধ্যা কাণ্ড। অথচ সেই অধ্যায়টি যোদ্ধায় পরিপূর্ণ।

গঙ্গারাম অস্থির হয়ে বলল, আপনার হেঁয়ালি ছাড়ুন। আদিকবি বাল্মীকি রামায়ণের রাবণের কী সর্বনাশ করে গেছেন জানেন?

আমাকে কোনো কথা বলার সুযোগ না দিয়ে গঙ্গারাম বলল, ওই যে রাবণের দশটা মাথা। তার একটি মাথা ঘাড়ের ওপরে। আর একদিকে পাঁচটি মাথা অন্য

একদিকে চারটি মাথা। যেদিকে পাঁচটি মাথা সেদিকে ঘাড়টা একটু হেলে পড়বে। রাবণ বেচারি বাল্মীকির অপকল্পনার দায়ে সারাজীবন ঘাড় বেঁকা হয়েই থাকল। আমি বুঝতে পারলাম গঙ্গারামের উত্তেজনার গতি রোধ করা যাবে না।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে অনেক ভেবেচিন্তে আলোচনার দিকটা একটু মোড় ঘোড়ানোর জন্যে আমি গঙ্গারামকে জিজ্ঞাসা করলাম, মহাভারত কেমন দেখলে? তার মধ্যেও কি এরকম গোঁজামিল পেয়েছ?

গঙ্গারাম বলল, পুরো মহাভারতটাই গোঁজামিল।

দ্রৌপদীর পাঁচ স্বামী। তা না হয় দ্রৌপদী বরদাস্ত করলেন। প্রকাশ্যে গোপনে ওরকম চার-পাঁচজন অনেক মহিলারই থাকে। কিন্তু দুঃশলা, মানে দুর্যোধনের একমাত্র বোনের একশোটি ভাই। ভাবুন তো একশোটি ভাই-এর জন্যে চন্দন বাটতে বাটতে ভাইফোঁটার দিন একশোটা চন্দনের ফোঁটা দিতে দিতে দুঃশলার কী কাহিল অবস্থা, কী কষ্ট। অথচ ব্যাসদেব স্বয়ং বলেছেন, দুঃশলা মেয়েটা খুব ভালো ছিল।

আমি কী যেন বলতে যাচ্ছিলাম, গঙ্গারাম আমাকে থামিয়ে দিয়ে বলল, মহাভারত পড়ে লজ্জায় মাথা কাটা গেল। আমি নড়েচড়ে বসলাম। প্রশ্ন করলাম, লজ্জায় মাথা কাটা যাবে কেন? গঙ্গারাম বলল, আমরা বাঙালি বলে।

আমি বলি, বাঙালি হয়েছি, তা মহাভারতের সঙ্গে কী সম্পর্ক। গঙ্গারাম মুচকি হেসে বলল, মহাভারতও ভালো করে পড়েননি। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে বাঙালিরা দুর্যোধনের পক্ষে সামিল হয়েছিল, তারপর দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছেড়ে গঙ্গারাম বলল, চিরকাল বাঙালিদের এই এক সমস্যা। চিরকাল তারা ন্যায়ের, ধর্মের বিপক্ষে লড়ে গেছে।

এতক্ষণে গঙ্গারাম উঠে দাঁড়াল। দাঁড়িয়ে বলল, পুজোর অর্ধেক বাজার বাকি আছে, আমারও সময় নেই, আপনারও সময় নষ্ট করব না। মহাভারত নিয়ে একটা প্রশ্ন করে চলে যাচ্ছি। আচ্ছা বলুন তো, বস্ত্রহরণের সময় দ্রৌপদী কেন বারবার শ্রীকৃষ্ণকে ডাকছিলেন।

আমি সরলভাবে বললাম, শ্রীকৃষ্ণ হলেন ভগবান, তাঁকে ডাকবে না?

গম্ভীর মুখে গঙ্গারাম বলল, মহাভারতে শ্রীকৃষ্ণ ভগবান নন। একেবারে রক্তমাংসের মানুষ। তবে দ্রৌপদী একথা জানত যে কিছুদিন আগেই শ্রীকৃষ্ণ স্নানরতা গোপিনীদের শাড়িগুলি চুরি করেছিলেন, তাই শ্রীকৃষ্ণই ভরসা। এক হাজার আট গোপিনী, এক হাজার আটটি শাড়ি খল দুর্যোধন আর কত টানবে।

গঙ্গারাম দ্রুত গতিতে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। মহাকাব্যের এই নবীন বিশ্লেষকের উদ্দেশ্যে আমি হাত জোড় করে নমস্কার জ্ঞাপন করলাম।

আমার এই করজোড়ে নমস্কার অবশ্য খুব কাজে লাগল না। একটু সময় পরেই গঙ্গারামের পুনরাবির্ভাব ঘটল। তবে এবার আর বসল না। সে শুধু একটা আদেশ বা উপদেশ দিয়ে গেল।

সকালের খবরের কাগজ আমার টেবিলের ওপর পড়ে আছে। গঙ্গারাম অনুপ্রবেশ

করায় সেটা এখনও ছোঁয়ার সুযোগ হয়নি। একটা প্রেমের কবিতা লিখব ভেবেছিলাম, তা আর হল না।

তা, এখন খবরের কাগজটা পড়তে যাচ্ছি এই সময় গঙ্গারামের পুনঃপ্রবেশ। আমার হাত থেকে খবরের কাগজটা তুলে নিয়ে সে বললে, 'মানে চার-পাঁচটা খবরের কাগজে তিন-চারশো টাকা নষ্ট করেন। খবরের কাগজ রাখা বন্ধ করে দিন। তার বদলে টেবিলের ওপরে রামায়ণ-মহাভারত রাখুন। যেমন ইচ্ছে খুলে মাঝে মধ্যে দু-চার পাতা পড়বেন।'

আমি বললাম, 'ওসব পড়বার মতো বুড়ো আমি এখনও হইনি।

গঙ্গারাম সঙ্গে সঙ্গে বলল, 'বুড়ো কেন? রামায়ণ-মহাভারত টগবগে যৌবনের বই। আপনি যেসব কারণে খবরের কাগজ পড়েন, সাহিত্য, রাজনীতি, অর্থনীতি, ধর্ম সব পাবেন এই দুই বইয়ে। টাটকা তাজা খবরের চেয়ে রোমহর্ষক যুধিষ্ঠিরের জুয়াখেলা, রাবণের সীতাহরণ। জুয়া-মদ, খুন-ছিনতাই, প্রবঞ্চনা-প্রতারণা, প্রেম-অপ্রেম এই দুই বইয়ে সব আছে।' রীতিমতো আদেশের সুরে 'আজ থেকেই মহাভারত পাঠ শুরু করুন' বলে আমার হাত থেকে খবরের কাগজটা ছিনিয়ে নিয়ে গঙ্গারাম বেরিয়ে গেল।

ওদের কেন্টাকি থাক, আমাদেরও কন্টাই আছে!

আমাদের বাড়ির বেশ কাছে, কলকাতা শহরের পূর্বসীমায় সল্টলেক উপনগরীর সিটি সেন্টারে কেন্টাকি ফ্রায়েড চিকেনের একটা দোকান হয়েছে। দোকান মানে এ কালের বাণিজ্যিক পরিভাষায় যাকে বলে আউটলেট।

এই বর্ষা-বাদলের মধ্যেও দোকানটি ভালোই চালু হয়েছে। দাম খুব বেশি নয়, দু-টুকরো মুরগির মাংস, বেসন বা চালগুঁড়ো দিয়ে ভাজা। দাম টাকা পঞ্চাশের কিছু বেশি। লোকে খাচ্ছে। আমি অবশ্য এখনও সিটি সেন্টারেব মুরগি ভাজার স্বাদ গ্রহণ করিনি। তবে দেশের বাইরে নানা জায়গায় অনেক বার খেয়েছি। ভারতেই কলকাতার পূর্বে আরও দু'টি শহরে কেন্টাকি আগেই এসেছে।

তিরিশি বছর আগে মার্কিন দেশে, ঠিক মনে নেই কোন শহরে, খুব সম্ভব নিউ অরলিনসে, প্রথম কেন্টাকি ফ্রায়েড চিকেনের স্বাদ পাই। কেন্টাকি কেন? শুনলাম নং আয়ার্ল্যান্ড এবং কেন্টাকি এই দুই জায়গায় মুরগি বিখ্যাত। সেই কেন্টাকি মুরগির বিপণন সারা আমেরিকা জুড়ে শুরু হয়েছে।

অস্বীকার করতে পারব না। মনে হয়েছিল, কী অপূর্ব স্বাদ এই মুরগি ভাজার; তপ্ত, স্বর্ণাভ, মুচমুচে এবং পৃথুল ও মাংসল সেই শ্রীচরণ। চোখের সামনে টগবগে গরম

সাদা তেলে ভাজা, সঙ্গে কড়া ঝাঁজের ঘন কাসুন্দি আর ডুম ডুম করে কাটা আলু ভাজা। সাহেবরা যাকে বলে ফ্রেঞ্চ ফ্রাই। সে স্বাদ ভোলার নয়।

কিন্তু মূল মার্কিন দেশে কেন্টাকির সেই সুদিন আর নেই। তেলে চুবিয়ে ভাজা মাংস আর সেই সঙ্গে আলু—আজকের নজিরে তো সবই সুস্বাস্থ্য বিরোধী। ফলে কেন্টাকি সমেত তথাকথিত ফাস্ট ফুডের প্রায় সব দোকানিই আমেরিকা থেকে বাইরে সরে পড়ছে। সরতে সরতে অবশেষে আমাদের এই কলকাতা শহরেও কেন্টাকি এসে পড়েছে। তা থাকুক, ধরিত্রী মাতার মতোই কলকাতা সর্বংসহা। দু-দশটা কেন্টাকি বা ম্যাকডোয়েল অনায়াসেই অন্তস্থ করতে পারবে কলকাতা।

বরং আমরা নিজেরা এ বার নিউইয়র্ক তথা আমেরিকার দিকে এগোতে পারি। বিখ্যাত 'টিফানিস' (মনে আছে সেই আশ্চর্য ছায়াছবি 'ব্রেকফাস্ট অ্যাট টিফানিস'?) রেস্তোরাঁর আশেপাশে কোথাও দিতে পারি 'বউদির হোটেল' কিংবা 'কন্টাই কাজু সুইটস'। যার মানে হল কাঁথির কাজু বরফির দোকান। কাজুবাদাম এবং দুধের মিশ্রণে এই বরফি মার্কিনি স্বাস্থ্য সচেতন জনতা লুফে না নিলেও ফেলে দেবে না।

তা ছাড়া দুধ ও কাজু ওখানেই অঢেল পাওয়া যাবে, শুধু এক জন ভালো কারিগর লাগবে, সে আমি নিজেও হতে পারি।

আর 'বউদির হোটেল'; ভারতবর্ষের যে কোনো তীর্থস্থানে গেছি, বৃন্দাবন থেকে কন্যাকুমারী পর্যন্ত 'বউদিব হোটেল', কম দামে ঘরোয়া রান্না। এই কয়েক দিন আগে, পুরীতে গিয়ে দেখে এলাম, সেখানেও বউদির হোটেল হয়েছে। মাত্র চল্লিশ টাকায় মার্কিন এক ডলারেরও কমে ভাত ইলিশমাছের ঝোল। দোকানগুলোব নাম এক হলেও, মার্কিনিদের মতো একই চেনের নয়। তবে 'বউদি' এরা ভালো বুঝবে না, নাম দেওয়া যায় 'সিস্টারস রাইস হোটেল', রাইস শব্দটা খদ্দের আকর্ষণ করতে।

এ জাতীয় একটি হোটেল এক বার দেখেছিলাম নিউইয়র্ক শহরের বিখ্যাত গ্রিনউইচ ভিলেজে। গ্রিনউইচ ভিলেজ ছিল নিউইয়র্ক শহরের খানদানি শিল্পীপাড়া। অনেক গরিব ও নিম্ন মধ্যবিত্তের সঙ্গে অর্থবলে বলীয়ান নয় অথচ বিখ্যাত কবি, লেখক, চিত্রকরেরা ও' পাড়ায় থাকেন।

কবি অ্যালেন গিন্সবার্গ তখন খ্যাতি ও প্রতিপত্তির তুঙ্গে। বন্ধু পিটার অরলভস্কির সঙ্গে এ পাড়াতেই পুরোনো ভাড়াটে বাড়িতে থাকতেন। অ্যালেন আমার পুরোনো সুহৃদ ও শুভানুধ্যায়ী। উনিশশো আটাত্তর সালের বরফ পড়া এক জানুয়ারি শেষের দুপুরে অ্যালেনের বাড়িতে মধ্যাহ্নভোজে যাচ্ছিলাম, অ্যালেনের বাড়িটা গলির মধ্যে বড় রাস্তা থেকে একটু দূরে। মোড়ে নেমে পিচ্ছিল গলিপথ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিলাম, হঠাৎ চোখে পড়ল একটা ভাঙাচোরা পুরোনো বাড়ির দরজায় একটা স্লেটের ওপর চকখড়ি দিয়ে লেখা, 'এখানে ভাত ও গোস্ত পাওয়া যায়।'

কলিংবেল বাজিয়ে ভেতরে ঢুকে দেখলাম এক বাংলাদেশি তরুণ দম্পতি এই কারবার করছে। দেখলাম দুজন গ্রাহক পরিতৃপ্তির সঙ্গে খাচ্ছে, এক প্লেট ভাত, একটা

পেঁয়াজ আর গোমাংসের দুটো বড় টুকরো আলু দিয়ে লাল ঝোল। মূল্য এক ডলার, তখনকার ভারতীয় মুদ্রামানে আট টাকা। অ্যালেনের ওখানে গিয়ে দোকানটার কথা বলতে, পিটার বলল, 'বেস্ট অ্যান্ড চিপেস্ট' সে ও তার বন্ধুরা ওখানে কখনো কখনো খায়। লাইসেন্সহীন সে দোকান এখনও আছে কিনা জানি না, তবে নিউইয়র্কের জ্যাকসন হাইটে দেখেছি মাছের দোকান, দিশি তরকারি পটল, ঝিঙে এবং সজনেডাঁটা দেখলাম মনে হল। বাংলা বইয়ের দোকান, ক্যাসেটের দোকান এমনকী টাঙ্গাইল শাড়ি পাওয়া যাচ্ছে। দেওয়াল জুড়ে বাংলাদেশি গ্রন্থ প্রকাশকের গগনচুম্বি বিজ্ঞাপন।

ওই জ্যাকসন হাইটের এক পাশে কিংবা ফ্লাশিং-এ বা অনতিদূর নিউ জার্সিতে বাংলার বিভিন্ন বিপণি অনায়াসেই চালু করা যায়। বর্ধমানের সীতাভোগ, কৃষ্ণনগরের সরপুরিয়া বা বাগবাজারের রসগোল্লার ক্রেতার অভাব হবে না। বিক্রি হবেই হবে। একটা শর্ত, দেশ থেকে ছলে-বলে-কৌশলে ভালো কারিগর নিয়ে আসতে হবে, অথবা নিজে শিখে আসতে হবে।

আর দ্বিতীয় শর্ত, সব মিষ্টি নিজে খেয়ে নিলে চলবে না।

গোলমাল

এই হতভাগ্য বুভুক্ষ শহরে যেখানে শতকরা পঁচিশজন মানুষ দু-বেলা পেট ভরে খাওয়ার স্বপ্ন দেখে, সেই শহরের আনাচে-কানাচে হইহই করে গড়ে উঠেছে নতুন নতুন হোটেল-রেস্তোরাঁ, কাঁকড়ার চিনে চচ্চড়ি, জাপানি কাঁচা মাছের সুশি, এমনকী ইতালিয়ান পাস্তা, তুরস্কের ভেড়ার মাংসের খাবার, সবকিছুই এইসব দোকানে পাওয়া যাচ্ছে। শুধু কোরিয়ার কুকুরের মাংসের ঝোল ছাড়া।

এর সবই যে সুস্বাদু-সুপাচ্য, তা বলা যাবে না, তবে সবই খুব দুর্মূল্য। একবার দাম জানলে আমার মতো ব্যক্তির পক্ষে এইসব খাবারের স্বাদ গ্রহণ করা কঠিন।

এইসব হোটেলের মেনু দেখলে মনে হয় এরা মার্কিন ডলারে দাম ধরে ভারতীয় টাকায় দেখিয়েছেন। তা না হলে খাবারের দাম দেড়শো-দুশো টাকা না হয়ে এক-একটি একশো ষাট, একশো নব্বই এইরকম অসম দাম ধরা হয়েছে।

এই ধরনের অধিকাংশ রেস্তোরাঁয় কোনো জিনিসের দাম দেড়শো টাকার কম নয়। খেতে গেলে উর্দু বই-এর পৃষ্ঠার মতো ডান দিক থেকে বাঁ-দিক পড়তে হয়, দাম না বুঝে কোনো জিনিসের অর্ডার দেওয়া বুদ্ধিমানের কাজ হবে না।

সবাই জানেন আমাদের গঙ্গারাম খুব বুদ্ধিমান, কিন্তু সেদিন সে একটা নির্বোধের মতো কাজ করেছে। আমার বাড়িতে গঙ্গারাম আসছিল—আমাদের বাড়ির মোড়ে

নতুন একটা জমজমাট রেস্টুরেন্ট হয়েছে, নাম 'বে অফ বেঙ্গল'। আমাদের বাড়িতে আসার পথে প্রলুব্ধ হয়ে গঙ্গারাম ওই হোটেলে উঁকি দেয়। তারপর নিজেকে সংবরণ করতে না পেরে এক কোনায় একটি চেয়ারে আসন গ্রহণ করে।

সেখানে বসে বেয়ারা যেমন যেমন বলছিল গঙ্গারাম অর্ডার দিয়ে গিয়েছে—দেশি-অদেশি সবরকম খাবার, ভাপা ইলিশ মাছ থেকে মোগলাই বিরিয়ানি, চাইনিজ চিলিচিকেন থেকে স্পেশাল মশলা ধোসা—

প্যান্টের বেল্ট ঢিলে করে বসে গঙ্গারাম পরমায়েশে খাবারগুলো খেয়েছে। ইতিমধ্যে দন্ত বিকশিত করে বিল হাতে বেয়ারা এসে দাঁড়িয়েছে। বিলটা গঙ্গারামের হাতে দিতে গঙ্গারামের চোখ কপালে উঠল। এদিকে সহাস্য বেয়ারা ক্রমাগত প্রশ্ন করে যাচ্ছে, "স্যার ইলিশ কেমন ছিল?"

গঙ্গারাম বলল, "খুব ভালো।"

বেয়ারা বলল, "হুজুর বিরিয়ানি কেমন?"

গঙ্গারাম বলল, "খুব ভালো।"

বেয়ারা বলল, "হুজুর রেয়াজি খাশির মাংস দিয়ে এই বিরিয়ানি, বাজারের কোথাও পাওয়া যাবে না।"

একটু চুপ করে থেকে বেয়ারা আবার জিজ্ঞাসা করল, "হুজুর চিলিচিকেন কেমন খেলেন?"

গঙ্গারাম যথারীতি বলল, "খুব ভালো।" বেয়ারা বলল, "আমাদের চিনে খাবার খাঁটি চিনে মশলা দিয়ে তৈরি।" এইরকম আর কিছুক্ষণ চলার পরে গঙ্গারাম বিল পেয়েও টাকা বের করছে না দেখে বেয়ারা বলল—"হুজুর আর কিছু দেব?" বাদশাহি লাড্ডু আছে, বহরমপুরের ছানাবড়া আছে? গঙ্গারাম হাতজোড় করে বলল, "না না, খুব ভালো খেয়েছি। আর কিছু নয়।"

এবার বাধ্য হয়ে বেয়ারা জিজ্ঞেস করল, "হুজুর, এত ভালো খেলেন আর এরকম মুখ কালো করে বসে আছেন।"

গঙ্গারাম এবার বেসিনে গিয়ে হাত ধুয়ে এসে হাত-মুখ মুছতে মুছতে বলল—"সাধে কি আর মুখ কালো করে আছি। আমার পকেটে তো কোনো টাকা নেই।"

বর্তমান বেয়ারা আগে একটি জনপ্রিয় পানশালায় কাজ করত। সেখানে হামেশাই এরকম হত—এইসব ক্ষেত্রে কী করতে হয় সেসব ও জানে। সে বলল, "কোনো চিন্তা নেই স্যার। আপনি কাল যে-কোনো সময় এসে টাকাটা দিয়ে যাবেন।"

গঙ্গারাম বলল, "কিন্তু তোমরা তো আমাকে চেনো না"—বেয়ারা বলল, "তাতে কী হয়েছে। সামনের দেওয়ালে যেখানে পেরেক লাগানো আছে ওখানে আপনার নাম-ঠিকানা লিখে রাখুন।"

গঙ্গারাম এই কথায় অবাক হয়ে গেল, যা-ই হোক বেয়ারার কাছ থেকে একটা পেনসিল নিয়ে ওই পেরেকের নিচে নিজের নাম ঠিকানা লিখল।

বেয়ারা বলল, "অন্য কাস্টমার দেখলে কী ভাববে—আপনি আপনার জামাটা খুলে ওই পেরেকের সঙ্গে ঝুলিয়ে রাখুন। তা হলে আপনার নাম-ঠিকানাটা ঢাকা পড়ে যাবে। কেউ জানতে পারবে না।"

এর পরের ঘটনা গঙ্গারাম আর বলেনি। আমিও জানতে চাইনি। এরপর আর একটা কাহিনি শুনলাম। গঙ্গারামই আমাকে গল্পটা বলল, আমি কিন্তু বিশ্বাস করিনি।

...ওই যে অফ বেঙ্গলেই এক ভদ্রলোক হঠাৎ হন্তদন্ত হয়ে ঢুকে বললেন, "ভাই গোলমাল লাগার আগে একটা কাটলেট দিন তো।" কাটলেটটা এক মুহূর্তে খেয়ে নিয়ে খদ্দের আবার বললেন, "এখনো গোলমাল লাগল না। আপনি আরেকটা কাটলেট দিন।" এরকমভাবে গোলমাল লাগল লাগল বলে এই খদ্দের পরপর ছয়-সাতটা কাটলেট খেল। অবশেষে ম্যানেজার জিজ্ঞাসা করতে বাধ্য হলেন, "দাদা এই যে গোলমাল গোলমাল বলছেন, গোলমালটা কী? গোলমালটা কে করবে?"

শেষ কাটলেটটি কাসুন্দি মাখিয়ে ধীরে-সুস্থে গলাধঃকরণ করতে করতে খদ্দের হেসে বললেন—"গোলমালটা কিছুই নয়, আসলে আমার কাছে পয়সা নেই তো।"

স্বামী-স্ত্রী

স্বামী-স্ত্রী. স্বামী আগে স্ত্রী পরে, নারীবাদীরা প্রতিবাদ করুন।

স্ত্রী-পুরুষ, স্ত্রী আগে পুরুষ পরে। এবার নারীবাদীরা চেপে যান।

এর পরে আবার নারীপুরুষ আছে, লক্ষণীয় এই যে পুরুষ নারী নয়, নারীপুরুষ।

এরকম কূটকাচালির রম্য নিবন্ধ আমার পছন্দ নয়। তার চেয়ে আমার স্বভাবসিদ্ধ হালকা রচনায় ফিরে যাই।

'সেবার আপনারা খুব হেসেছিলেন। আজকাল তো হাসি উঠেই গেল। হাসির রচনার পাতা দ্রুত ওলটাতে ওলটাতে পাঠক-পাঠিকারা বলেন, 'কে আবার বাজায় বাঁশি/এ ভাঙ্গা কুঞ্জবনে।'

'স্বামী-স্ত্রী' প্রসঙ্গে কোথায় যেন শুনে কিংবা কোন্‌খান থেকে যেন টুকে আমি লিখেছিলাম, সুসজ্জিতা স্ত্রীর পাউডার-পমেটম চর্চিত কাজল লাঞ্ছিত মুখের চিবুকটি তুলে মুগ্ধ স্বামী বলছেন, 'ওগো, আজ তোমাকে যে পরস্ত্রীর মতো দেখাচ্ছে।'

স্ত্রী না পরস্ত্রী, এ প্রশ্ন, এ সমস্যা বহুদিনের। আজকের যুগে শুনেছি এক ফ্ল্যাটবাড়ির বাসিন্দা এক নববিবাহিতা তার স্বামী অফিস যাওয়ার সময় ফ্ল্যাটের দরজা খুলে দিয়ে বেরোনোর মুখে বলেছিল, 'ওগো ও বাড়ির কর্তা দৈনিক অফিস যাওয়ার সময় তার স্ত্রীকে চুমু খায়। তুমি ওরকম করো না কেন?' কর্তা দুঃখিতভাবে বললেন, 'সাহস পাই না। ওই মহিলা কী আমাকে চুমু খেতে দেবেন?'

নিশ্চয়ই দেবেন না। সুতরাং আমরা প্রসঙ্গান্তরে যাই।

প্রসঙ্গান্তর মানে স্বামী-স্ত্রী বিষয়ে বলব। অথচ দাম্পত্যকলহে যাব না তা তো হতে পারে না। তবে অধিকাংশ দাম্পত্য কলহই বজ্র আঁটুনি ফস্কা গেরো। প্রসিদ্ধ সংস্কৃত শ্লোকে আছে, দাম্পত্য কলহ প্রভাতের মেঘ গর্জনের মতো সাধারণত রীতিমতো ফাঁকা ব্যাপার। আবার বাইরে থেকে দেখে দাম্পত্যকলহ ঠিকভাবে ঠাহর করা যায় না।

এক ভদ্রলোক বন্ধুদের কাছে কবুল করেছিলেন যে গত দশদিন তিনি তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে কথা বলেননি। সহৃদয় বন্ধুরা বলেছিলেন, 'এত ঝগড়াঝাঁটির কী আছে? যাও বউ-এর সাথে মিটিয়ে নাও।' ভদ্রলোক বলেছিলেন, 'বউ-এর সাথে কথা বলার সুযোগ পাইনি।'

'সুযোগ পাওনি কেন?' বন্ধুদের এই জিজ্ঞাসায় ভদ্রলোক বলেছিলেন, 'আমার স্ত্রী একনাগাড়ে কথা বলে যান। কোনো কথা বলার সুযোগ দেন না। তাই আমার কথা বলা বন্ধ রয়েছে।'

একটা প্রকৃত কলহের গল্প বলে এ রচনার সমাপ্তি টানা যেতে পারে।

সারাদিন রাত বউ খিটিমিটি করে। ভদ্রলোক যথাসাধ্য মেনে চলেন। বিশেষ কর্ণপাত করেন না। শুধু মাঝে মাঝে অনুরোধ করেন একটু শান্ত হতে, একটু কম চ্যাঁচামেচি করতে।

কিন্তু কে কার কথা শোনে। একদিন সকালবেলা দেখা গেল তিনি বাক্সপ্যাঁটরা গুছিয়ে বাড়ি থেকে বেবিয়ে যাচ্ছেন। ভদ্রলোক দরজা আটকে দাঁড়ালেন, 'এসব কী ব্যাপার?'

স্ত্রী বললেন, 'তুমিই তো আমাকে চলে যেতে বলেছ।'

ভদ্রলোক অবাক। ভদ্রমহিলা কাঁদতে কাঁদতে বললেন, 'তুমিই তো প্রত্যেক দিন বকো যে এরকম করলে এ বাড়িতে শান্তি থাকবে না। ঠিক আছে, তুমি তোমার শান্তিকে বলে দাও আমি চলে গেছি, শান্তি এসে থাকুক।'

দেবীপক্ষ

পিতৃপক্ষের শেষদিনের শেষরাত সকাল হলেই দেবীপক্ষের শুরু। নীল আকাশে ফরসা আমেজ। সারারাত টুপটাপ শিশির পড়েছে। শিশিরের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে পড়েছে শিউলিফুল।

শেষরাতের আলো-আঁধারিতে দূরে কোথায় রেডিয়ো বাজছে। রেডিয়োতে বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের মন্দ্র কণ্ঠস্বর। স্তোত্রপাঠ হচ্ছে, ''যা দেবী সর্বভূতেষু, শক্তি রূপেন সংস্থিতা...'', পঙ্কজ মল্লিকের উদাত্ত কণ্ঠে শারদীয় ঊষা উতলা হয়ে উঠেছে। দেবীপক্ষ বা মাতৃপক্ষ শুরু হয়ে গেল।

দেবী আসছেন। শুভ মহালয়া।

দেবী আসছেন, নৌকোয় কিংবা গজে কিংবা অন্য কোনো বাহনে' সে অশ্বও হতে পারে। তবে সে যুগে দেবীপূজার এইসব রীতিনীতি, বিধি প্রচলিত হয়েছিল, তখনও সাইকেল কিংবা মোটরগাড়ি আসেনি। তাই এসব আধুনিক বাহনে দেবী কখনও আসেন না।

কখনো নয়, লেখা উচিত ছিল এখনো আসেন না। অনতিদূর ভবিষ্যতে কম্পিউটার জ্যোতিষী হয়তো দেবীকে সদলবলে লাক্সারি বাসে অথবা হেলিকপ্টারে আনবেন।

অনুমান করি। সেই বাহনটি লাক্সারি বাসের মতো স্থলযান হোক কিংবা হেলিকপ্টারের মতো আকাশযান কিংবা সাবমেরিনের মতো ডুবো জলযান হোক, তাতে হাত-পা ছড়ানোর জায়গা থাকবে, দেবীর এবং দেবীর পুত্রকন্যাদের, এমনকী আত্মগোপন করা স্বামী দেবাদিদেব মহাদেবেরও বাংকের উপরে একটা গোপন আসন হবে। নিকটবর্তী পাশাপাশি খাঁচায় থাকবে সিংহ এবং মোষ। ছোটো ছোটো খাঁচায় ময়ূর, হাঁস, ইঁদুর ও পেঁচা আর অবশ্যই সাপ। অর্থাৎ যা কিছু মায়ের সঙ্গে বৎসরান্তে ধরাধামে অবতীর্ণ হয়।

মহালয়ার আগে পরে আকাশে মেঘের ঘনঘটা। আবহাওয়া অফিস এবং সংবাদপত্রের ভাষায় বজ্রবিদ্যুৎ সহ অল্পস্বল্প বৃষ্টি।

মহালয়ার পুণ্য প্রভাতে বৃষ্টি যে খুব একটা হয় তা নয়। সাম্প্রতিকালে একবারই হয়েছিল, তবে মহালয়ার আগে পরে, সময়ে-অসময়ে দিনে রাতে যে-কোনো ক্ষণে ভয়াবহ বজ্রগর্জন সঙ্গে ঝিরঝিরে বৃষ্টি মোটেই অস্বাভাবিক নয়। যদিও যত গর্জায় তত বর্ষায় না। কিন্তু এ সময়ে বজ্রপাত মারাত্মক হতে পারে। প্রায় প্রতিবছরই। অন্য কোথাও নয়, একেবারে কলকাতা ময়দানে বজ্রপাতে মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে।

আমাদের কৈশোরে মহালয়ার আগে বজ্রগর্জন সম্পর্কে দু'রকম রটনা ছিল। প্রথমটি ছিল, মা দুর্গা জেদ ধরেছেন বাপের বাড়ি আসবেন, তার মানে হিমালয় থেকে মর্তভূমিতে অর্থাৎ বাংলায় সমতল বঙ্গদেশে; আর মায়ের জেদে উত্তেজিত হয়ে কিছুকাল আগে শ্বশুরালয়ে চূড়ান্ত অপমানিত মহাদেব একের পর এক বজ্র গর্জন করছেন। পার্বতী অবশ্য তাতে ভয় পাওয়ার মহিলা নন। সেই বজ্রগর্জনই মেঘের গর্জন হয়ে ধরাতলে ফিরে আসছে। আরেকটি কাহিনি ছিল, মা দুর্গা পতিগৃহ থেকে রওনা হয়েছেন। তার সঙ্গে একই যানে পিঞ্জরাবদ্ধ রয়েছে মোষ ও সিংহ। মোষের পাশের খাঁচায় ক্রুদ্ধ সিংহ। সিংহের আস্ফালন ও গর্জন আকাশের মেঘে মেঘে প্রতিধ্বনিত হয়ে পৃথিবীতে এসে পৌঁছেছে।

স্মৃতিরূপেন সংস্থিতা

এ কাহিনি থাক। এবপরের কথা বলি। বহুদূর মফঃস্‌সল শহরে সময়জর্জর এক প্রাচীন গৃহের খোলা জানলায় পুকুরের ওপারে বাণীকণ্ঠ মৈত্রের বাড়ি থেকে ভেসে

আসছে বীরেন্দ্রকৃষ্ণের পাঠ, পঙ্কজ মল্লিকের স্তোত্রসংগীত। ভোরের আলো ফুটে উঠছে। ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য শরতের আকাশের সাদা মেঘে সঙ্গীতের আলোড়ন ছড়িয়ে দিলেন। সূর্য ওঠে ওঠে, ভোর হয় হয়, সুপ্রীতি ঘোষের কণ্ঠে বাণী বেজে উঠল।

সেসব কত কালের কথা। সেসব কাল কি কোনোদিন কোথাও ছিল।

সে ছিল আমার বিদ্যালয়ে পড়ার দিন। একটু বড় হলাম। কলকাতায় চলে এলাম। থাকতাম এসপ্ল্যানেডে। কার্জন পার্কের উল্টোমুখে আমাদের গলি। একালের 'ফাস্টফুড স্ট্রিট' ডেকার্স লেন। সেই গলিতে বাঙালি হিন্দু প্রায় ছিলই না। একটি তুলসীগাছ বা শিউলিগাছ অকল্পনীয় ছিল।

বলা বাহুল্য, সেকালের কার্জন পার্কে কোনো শিউলি গাছ ছিল না। সাহেবি কলকাতায় বকুলগাছও খুব জনপ্রিয় ছিল না।

সেসব কথা থাক। বাল্যবয়সে কলকাতায় চলে এলেও কলেজে পড়ার সময় এবং তারও পরে শিক্ষকতার সময় প্রতিবছর নিয়মিতভাবে আমি দেশের বাড়িতে বছরে দুবার যেতাম। তখন এত অরাজকতা ছিল না। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে একবার গরমের ছুটি হত দুমাসের জন্য। পহেলা মে থেকে তিরিশে জুন পর্যন্ত। এর কোনো ব্যতিক্রম ছিল না। অন্যদিকে, পুজোর ছুটি হত মহালয়ার দিন থেকে ভ্রাতৃ দ্বিতীয়া পর্যন্ত। মা-বাবা-আত্মীয়-স্বজন সবাই দেশে। সারাবছর মন পড়ে থাকত পলেস্তারা খসা ভগ্নপ্রায় এক ঈষৎ হলুদে বাড়ির দুপাশের বারান্দায়, এঘর থেকে ওঘরে, সিঁড়িতে, চিলেকোঠায়, ছাদে। সামনে পুকুর। ওপারে বাণীকণ্ঠ মৈত্রের বাড়ি। তাদের বাড়ির বড় মেয়ে আমার থেকে তিনবছরের বড়। কোথা থেকে একটা সাদা কাঠের চিরুনি, বোধহয় কোনও মেলাটেলা থেকে কিনে আমাকে একদিন দিয়েছিল। বলেছিল, "একদম মাথা আঁচড়াচ্ছিস না! এই কাঠের চিরুনি দিয়ে আঁচড়াবি।"

তারপর কাঠের চিরুনিটা আমার হাতে দিয়ে বলল, "তোকে অবশ্য এলোমেলো দেখতেই ভালো লাগে।" সেটা ছিল এক মহালয়ার সকাল।

সে অনেকদিন আগের কথা। সবকথা স্পষ্ট মনে পড়ে না। কিন্তু কলকাতায় কলেজে পড়তে আসার আগে পুষ্করিণী অতিক্রান্ত বাণীকণ্ঠ মৈত্রের রেডিয়োতে ভেসে আসা মহালয়ার প্রভাতী অনুষ্ঠান আমাকে নাড়া দিয়েছিল।

এরপরে বেশ কয়েকবছর কেটেছে। মহালয়ার আগের দিন জলপথে নৌকোয়, স্টিমলঞ্চে কিংবা স্টিমারে কেটে যেত। তার কারণ ছিল একটাই, বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের সেই অবিস্মরণীয় মহালয়াবার্তা। বাড়ি ফিরে শুনতে হবে, পুকুরের উপরে বাণীকণ্ঠ মৈত্রের বাড়ি থেকে শেষ রাতের হিমেল বাতাসে, আধোঘুম, আধো জাগরণে ভেসে আসবে সামমন্ত্র।

মহালয়া নিয়ে আমার অন্যরকম অভিজ্ঞতা হয় বছর কুড়ি আগে। আটের দশকের শেষে।

সে বছরভর বর্ষায় দেশের বাড়িতে বাবা মারা গেলেন। মহালয়ার দিন কয়েক

আগে শ্রাদ্ধের দিন পড়ল। ফিরে আসার দিন ঠিক করলাম মহালয়ার পরের দিন। আত্মীয়-স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশী পিতৃবিয়োগের অশৌচান্তে দেবীপক্ষের আগে ছাড়লেন না। শেষরাতে পুরোনো দিনের মতো ঢাকের বাজনায় ঘুম ভাঙল। পাড়ার মোড়ে কালী-বাড়িতে মহালয়ার কালীপুজো শেষ হল, এ বাজনা তারই বার্তাবহ। বাজনা থামলে ঘুম-চোখে বারান্দায় বেরিয়ে এলাম। কোথায় একটা শূন্যতা।

পুকুরের ওপারে রেডিয়োর দেবীবন্দনা শোনা যাচ্ছে না। বাণীকণ্ঠ মৈত্ররা কবে দেশছেড়ে চলে গিয়েছেন। মনটা খারাপ হয়ে গেল।

পরের বছর বাবার বাৎসরিক শ্রাদ্ধ করলাম কলকাতায়। ওই একবছরই। তারপরে কয়েকবছর মহালয়ার সকালে গঙ্গার ঘাটে যেতাম। বিশাল ভিড়। ধাক্কাধাক্কি, ঠেলাঠেলি। প্রচুর ভিখিরি। ততোধিক পূজারি। তখন আমি থিয়েটার রোড অঞ্চলে থাকতাম। ভিখিরিদের অনেককেই চিনতে পারলাম। এরা ময়দান এলাকার স্থায়ী ভবঘুরে। আজ এখানে ভিখিরি সেজেছে।

সেই প্রাচীন গল্পটি মনে পড়ল। চোখ বুজে অন্ধ সেজে একজন ভিক্ষে করছিল। তাকে চিনতে পারায় সে স্বীকার করেছিল, "স্যার। আপনি ঠিকই ধরেছেন। আমি অন্ধ নই, মোড়ের বোবা ভিখিরি। এখানে যে অন্ধ ভিখিরি বসে, সে সিনেমা দেখতে গিয়েছে, তাই তার জায়গায় প্রক্সি দিচ্ছি।"

এ সেই সবই এক ব্যাপার। তর্পণ করতে গঙ্গায় গলাজলে নেমে গেলাম। একজন পূজারির কাছে নিজেকে আত্মসমর্পণ করলাম। তিনি মন্ত্র পড়ে পড়ে আমার চোদ্দো-পুরুষ উদ্ধার করতে লাগলেন। তার কাছে জানতে পারলাম তিনি পেশাদার পুরোহিত নন, পূর্বরেলের টিকিট চেকার। চারপাশে অসংখ্য লোক। তাদের প্রায় সকলের মাথান্যাড়া। একটু আগেই মুণ্ডনকর্ম সাধিত হয়েছে। কেমন অচেনা একটা পৃথিবী। সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে বেরনোর আগে দূরদর্শনে মহালয়া দেখেছি। এ মহালয়া সে মহালয়া নয়।

হঠাৎ মনে হল, পুরোহিতরা বিড়বিড় করে কী মন্ত্র পড়েন তাতো বুঝতে পারলাম না। অনেকগুলি 'ওম', অনুস্বার চন্দ্রবিন্দু আছে। আমার পরিচিত এক ব্যক্তি, তিনি নিয়মিত গঙ্গাস্নান করেন। তার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল, তাকে জিজ্ঞেস করলাম, "এই যে সবাই প্রায় এরকম মন্ত্র বলছে, এই মন্ত্রটা কী?"

ভদ্রলোক সুরসিক। 'এদের মন্ত্র আমি পড়ি না। আমি নিজেই নিজের মন্ত্র পড়ি। তবে এরা কী মন্ত্র পড়ে তা আমি পরশুরামের গল্প পড়ে জেনেছি।' আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম, 'কী মন্ত্র?' তিনি বললেন,

"আম্রচুরি জাম্র চুরি।
ভাদ্রমাসে ধান্য চুরি,
মদ্যপান ও কুকরা ভক্ষণ
মন্দস্থানে রাত্রিযাপন।

হক্কল পাপ বিমোচন
ওঁ গঙ্গা, গঙ্গা, গঙ্গা।"

— — — — —

ওঁ গঙ্গা, ওঁ মহালয়া।

মজার গল্প

এমন অনেকে আছেন যারা 'মজা' শব্দটি উচ্চারণ করতে পারেন না, তাঁরা বলেন মোজা। যে.ভাবে কলকাতা কোলকাতা হয়ে গিয়েছে।

অবশ্য শিবরাম চক্রবর্তীও বলতেন, "বাঃ খুব মোজা তো। ওতো বেশ মোজার গল্প।"

গঙ্গারামের একটি পুরোনো গল্পে একদা শিবরামীয় কায়দায় এই মজা আর মোজা মিশিয়ে দিয়েছিলাম।

গল্পটা নতুন করে বলি।

শ্রীমান গঙ্গারামের দু জোড়া মোজা। এক জোড়া সাদা। এক জোড়া লাল। সেদিন গঙ্গারাম আমাদের বাসায় এসেছে, দেখি তার দু পায়ে দু রঙের মোজা, বাঁ পায়ে সাদা. ডান পায়ে লাল।

আমি বললাম, "একি ব্যাপার গঙ্গারাম। দু পায়ে দু রঙের মোজা। তোমাব তো আরো মোজা আছে।"

গঙ্গারাম বলল, "আরও এক জোড়া আছে। কিন্তু জানেন দাদা, এই একই সমস্যা। দু পাটি দু রঙের, একটা সাদা, একটা লাল।"

শুনেছি শিবরাম চক্রবর্তী এমনই একটি গল্প শুনে বলেছিলেন, "বাঃ খুব মোজা।"

মোজার গল্প তো সবশুদ্ধ ওই একটাই। নাকি, আরও দুয়েকটা আছে? আমি তো জানি না।

অথচ আমাদের এই মুহূর্তে চাই মজার মজার গল্প, মজার গল্প, এক-দুই-বহু।

এই প্রসঙ্গে প্রথমেই জানিয়ে রাখা ভালো যে, এখন আর মজার গল্প বিশেষ শোনা যায় না। শোনা গেলেও তারা কোনোটাই টাটকা, বা আনকোরা নয়।

কোথায় পাওয়া যাবে আনকোরা, টাটকা গল্প? পৃথিবীর সব মজা কবে শেষ হয়ে গেছে, মজার গল্পও বিদায় নিয়েছে। আমার মতো হতভাগা দু-চারজন এখনো যারা নতুন নতুন মজার গল্প, মজার মজার গল্প খোঁজ করে তারা অবশেষে এক গোলক-

ধাঁধায় পড়ে যায়। ঘুরে ফিরে এসে যায় চিরকালের পুরোনো হাসির বা মজার গল্পগুলি।

আমি বরং আপাতত গোলকধাঁধাঁর মধ্যে ঢুকে যাই। বুদ্ধিমান পাঠকের এবং অবশ্যই পাঠিকার দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্যেই ধাঁধার গল্প নিয়ে আসছি।

আসলে সব মজার গল্পেই কিছুটা ধাঁধা থাকে এবং অনেক ধাঁধাই রহস্য উন্মোচনের পর মজার গল্পে পরিণত হয়।

প্রথম সরাসরি বলি। শ্রীযুক্ত অচলানন্দ গিরি প্রচণ্ড পর্বতপ্রেমিক ছিলেন। তিনি দশবার হিমালয় অভিযানে গিয়েছিলেন। তার মধ্যে একবার তিনি পর্বতে উঠতে গিয়ে পা পিছলে পড়ে মারা যান। সেটা কোন্ বার?

এ প্রশ্নের উত্তর অবশ্যই দশমবার এবং এই উত্তরের মধ্যেই ধাঁধাটি মজার গল্প হয়ে যায়।

দ্বিতীয় গল্পটিও হচ্ছে ধাঁধা, এক ভদ্রমহিলা বলছেন, "এই ঘরের মধ্যে আমি রিনা আর আমার বোনেরা ইনা-মিনা-টিনা রয়েছি। সবাই আমরা সহোদরা মায়ের পেটের বোন।" ঘরের দেওয়ালে একজনের ছবি আছে সে-ও মেয়ে এবং একই মায়ের পেটের কিন্তু আমার বোন নয়। ওই মেয়েটি কে?"

মানে ওই ছবিটা কার? এই প্রশ্নের একমাত্র উত্তর—এ ছবিটা রিনা আপনার নিজের।

শ্রীমতী রিনা এই ধাঁধাটা এবং এর মধুর সমাধান তার বান্ধবী মাধুরীকে বলেছিল। প্রথমে ধাঁধাটা মাধুরী ধরতে পারেনি। তারপর জবাবটা শুনে এবং হৃদয়ঙ্গম করে খুবই চমকিত হয়।

মাধুরীব চিরকালের সন্দেহ আমি, এই তারাপদ রায়, লোকটি তেমন চালাক-চতুর নই। মাঝে মাঝে সে এসে আমার বুদ্ধি বাজিয়ে দেখে।

রিনার এই ধাঁধার গল্পের পরে এক ঘণ্টার মধ্যে মাধুরী আমাদের বাড়িতে এসে যায় এবং পুরো গল্পটা আমাকে বলে মূল প্রশ্নটি করে, দেওয়ালের ওই ছবিটি কার?

ধাঁধাটি আমি আগেই জানতাম। আমি মাধুরীর প্রশ্ন শুনে মৃদু-মৃদু হাসছিলাম।

মাধুরী বলল, হাসতে হবে না। আমি জানতাম, তুমি এ প্রশ্নের জবাব দিতে পারবে না। আমি বললাম তাহলে জবাব দিতে পারবে না।

আমি বললাম, তা হলে জবাবটা তুমিই দিয়ে দাও। খুব গম্ভীর হয়ে মাধুরী বলল, জবাবটা খুব সোজা। ওই ছবিটা হল রিনার।

আমি এরকম বোকা জীবনে বনিনি। মুখে বললাম, এর মধ্যে রিনা কোত্থেকে এল, গম্ভীর হয়ে মাধুরী বলল, ওইটাই তো ধাঁধা। উত্তর বার করতে বুদ্ধি লাগে।

সুতরাং এবার বুদ্ধিমানের গল্পে যাই। এ গল্পটা পুরোনো আমলের। তখন ইউনিয়ান বোর্ডের এজলাসে ছোটোখাটো মামলার বিচার হত। আজকাল যেমন পঞ্চায়েতে করার কথা ভাবা হয়েছে।

অভিযোগটা করেছিল যদুগোপাল। মধুলালের বিরুদ্ধে। "হুজুর, এই মধুলাল একটা পাজি কুকুর পোষে, ওই কুকুরটা আমার পায়ে কামড়ে দিয়েছে।"

মধুলালকে বিচারক জিজ্ঞাসা করলেন। "মধুলাল এ বিষয়ে তোমার কী বক্তব্য আছে?" মধুলাল হাত জোড় করে জানাল, "হুজুর আমি স্বীকার করছি আমার কুকুর ওর পায়ে কামড়েছে। কিন্তু সেই জন্যে আমি ওকে একশো টাকা ক্ষতিপূরণ দিয়েছি।"

এই শুনে যদুবাবু খুব খেপে গেল এবং পকেট থেকে একশো টাকার নোট বার করে বিচারককে দেখাল। তারপর বলল, হুজুর এই মধুলালের কুকুর যেমন পাজি, ও নিজেও তেমনই বদমাশ, এই নোটটা দেখুন হুজুর এটা একটা জাল নোট, ও আমাকে জাল নোট দিয়ে ক্ষতিপূরণ দিয়েছে।

এবার বিচারক মধুলালকে বললেন, "তুমি তো মোটেই লোক সুবিধার নও। তুমি জাল নোট দিয়ে ক্ষতিপূরণ দিলে?" এবার মধুলাল যা বলল তা অবিশ্বাস্য—সে নিবেদন করল, "হুজুর যদুগোপালের যে পায়ে আমার কুকুর কামড়েছে সেটা আসল পা নয় সেটা কাঠের পা। এবার আপনি বিচার করুন আমি উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দিয়েছি কি না।"

আমার যেমন কপাল, সবে এই অবধি লিখেছি এমন সময় মূর্তিমান গঙ্গারাম এসে হাজির।

সে এসেই লেখার প্যাডে একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে বলল, "এবার কুকুরের গল্প লিখছেন বুঝি?"

আমি বিরক্ত হয়ে তাকে বললাম, কুকুরের গল্প সারা জীবন ধরেই তো লিখছি। এখন লিখছি মজার গল্প।

—"মজার গল্প নয়, কুকুরের বুদ্ধির গল্প একটা আপনাকে বলছি।"

আমার মনে পড়ল, একবার গঙ্গারামের বাড়িতে গিয়ে দেখেছিলাম সে তার পোষা কুকুরের সঙ্গে লুডো খেলছে। আমি দেখে বলেছিলাম, "বাঃ খুব বুদ্ধিমান কুকুর তো।" গঙ্গারাম গম্ভীর হয়ে বলল, "বুদ্ধিমান মোটেই নয়। চার দান খেলা হয়েছে তার মধ্যে তিন বারই হেরেছে।"

আজ অবশ্য গঙ্গারামের ঝুলিতে একদম অন্য গল্প এবং এ গল্পটা যে মজার সেটা অস্বীকার করা যাবে না।

গঙ্গারাম বলল, "আমার কুকুরের কথা বলছি না। আমার শালা—তার বাড়িতে একটা মেয়ে অ্যালসেশিয়ান কুকুরের একটা বাচ্চা হয়েছে। বেশ কিছুদিন হল চোখ ফুটেছে। এ ঘর ও ঘর ঘুরে বেড়ায়। কখনও টিভি দেখে, কখনও চৌবাচ্চায় গিয়ে সাঁতরায়, এমন কী সকাল বেলা খবরের কাগজ এলে মনোযোগ দিয়ে পাতা ওলটায়।"

যদিও অসম্ভব ব্যাপার তবু গঙ্গারামকে তাল দেওয়ার জন্যে বললাম, এ আর বেশি কথা কী। গঙ্গারাম চটে গিয়ে বলল, আসল কথাটা তো এখনও বলিনি।

আমি বললাম, "আসল কথাটা বলে ফ্যালো।" গঙ্গারাম রুখে উঠল, "আসল কথাটিই বলছি—আজ সকালে শালার বাড়িতে গিয়েছিলাম, সেখানে গিয়ে দেখলাম আমার শালার মেয়ে হারমোনিয়াম বাজিয়ে গান শিখছে আর তার পাশে কুকুরছানাটা

বসে সামনের দুটো পা তুলে তবলায় সহযোগ করছে তেরে কেটে তাক তেরে কেটে তাক।"

আমি অবাক হয়ে বললাম, "আশ্চর্য কাণ্ড!"

এবার গঙ্গারাম বলল, "এখনই আশ্চর্যের কী হয়েছে! আসল গল্পটা শুনুন—বেশ বাজাচ্ছিল কুকুরের বাচ্চাটা, গানটার সঙ্গে সঙ্গত ভালোই হচ্ছিল, এমন সময় হঠাৎ কোথা থেকে বড় কুকুরটা, অর্থাৎ ওই বাচ্চাটির মা বাচ্চাটি ঘাড়ে ধরে মুখে করে ঘরের বাইরে নিয়ে গেল। তারপর দু-বার বাচ্চাটাকে বারান্দায় নামিয়ে দু-বার ঘেউ ঘেউ করে ধমকাল।"

আমি বললাম, "আশ্চর্য!" গঙ্গারাম বলল, "আরেকটু শুনুন। আমার শালার কাছে জানতে চাইলাম, ব্যাপারটা কী?"

শালা বলল—"কুকুরের বাচ্চাটার মা চায় না যে ওর ছেলে তবলাবাদক হোক। ওর ইচ্ছে ছেলে পুলিশ ডগ হবে অথবা শিকারি কুকুর হবে। তাই তবলা থেকে তুলে নিয়ে গেল।"

কুকুর নিয়ে যখন মজার গল্পটা এতদূর এসে গেল তখন শেষ গল্পটাও কুকুর নিয়েই বলি। গল্পটি অবশ্য আমার নয়। রসসিদ্ধ হিমানীশ গোস্বামীর।

এক বাড়িতে দুটো কুকুর আছে। একটা অ্যালসেশিয়ান জাতের কুকুর—সেটা বিশাল আকারের। আর একটা সাদা ধবধবে লোমওয়ালা কুকুর—ছোটোখাটো, স্পিৎজ বলে।

হিমানীশ গোস্বামীব গল্পের মজাটা এই যে আসলে ছোটো কুকুরটা বড় কুকুর আর বড় কুকুরটা ছোটো কুকুর।

কথাটার গূঢ় অর্থ হল—বিশাল আকার অ্যালসেশিয়ানের বয়স মাত্র ছ'মাস। এদিকে ছোটো কুকুরটা পূর্ণবয়স্ক। আট দশ বছর বয়সের। তাই ছোটো কুকুরটাই বড় কুকুর আর বড় কুকুরটাই ছোটো কুকুর।

পুনশ্চ :

বিদ্যাসাগর থেকে বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ থেকে শরৎচন্দ্র এঁরা প্রত্যেকেই শুধু সাহিত্যের নয়, মৌলিক মজার গল্পে দিকপাল।

আপাতত শুধু শরৎচন্দ্রের কথা বলি।

শরৎচন্দ্র পরিণত বয়েসে নিজের গ্রামে যেমন থাকতে চাইতেন না, তেমনিই কলকাতার নাগরিক জীবনে বীতশ্রদ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। তিনি অবশেষে হাওড়া জেলার সীমান্তের নদী তীরবর্তী গ্রামে বাড়ি করলেন।

এ খবর পাওয়ার পর বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়স্বজন, শুভানুধ্যায়ী, অনুরাগী-অনুরাগিণীরা সে গ্রামে ভিড় জমাল। সকলের মুখেই এক প্রশ্ন, "এ গ্রামের জলবায়ু কী রকম? স্বাস্থ্য কেমন?"

শরৎচন্দ্র সবাইকে বলতেন, "শরীর স্বাস্থ্য নিয়ে কী আর বলব? আমার ষাট বছর

বয়েস হয়ে গেল, এ গ্রামে এলে এখনও আমাকে লুকিয়ে হুঁকো টানতে হয়।"

কেউ কেউ এরপরেও জিজ্ঞাসা করেন, "তাই? কী হয়েছে?" শরৎচন্দ্র বলতেন, 'এ গাঁয়ের লোকেরা বাঁচেন আশি-নব্বই-একশো পর্যন্ত। তাই তো হুঁকো লুকোতে হয়।"

এখানে যে মোটা ওখানে সে রোগা

মোটা হওয়ার চিকিৎসার কর্মে কতরকম যে জিজ্ঞাসা, যথারীতি নাম, ঠিকানা, বয়স। এরপর উচ্চতা, ওজন, কোমরের মাপ, ভুঁড়ির মাপ ইত্যাদির ঘর ফাঁকা। চিকিৎসাকেন্দ্রটি ওগুলো নিজেরা মেপে পূরণ করবে।

এর পরে রক্তের ঘর। কতরকম যে রক্ত জিজ্ঞাসা। তার পরে প্রেসার, কোলেস্টেরল ইত্যাদি, ইত্যাদি, ইত্যাদি। অবশেষে পুরো দুই পাতা ব্যক্তিগত, পারিবারিক স্বাস্থ্যের ইতিহাস।

আমাকে কোনো দিন হুলোবিড়াল কামড়েছিল কিনা?

আমার পিসিদের কারো ডেঙ্গুজ্বর হয়েছিল কিনা?

আমার বাবার বুক ধড়ফড় করত কিনা?

আমার বাবা রাতে কতটা মদ খেতেন? কতবার বিয়ে করেছিলেন। আমার বাবা কতবার, ঠাকুমা কতবার, ঠাকুরদা কতবার, মাতামহ কতবার, মাতামহী কতবার?

আমার কোনো মাতুল পাগল ছিলেন কিনা।

আমরা সাপ, ব্যাং, ইঁদুর খাই কিনা, এমনকী, নিয়মিত নাচি কিনা, গান গাই কিনা, দৌড়োই কি না?

জনৈক প্রৌঢ় এবং অভিজ্ঞ স্বাস্থ্যসহায়ক আমাকে ফর্মপূরণে সাহায্য করলেন। তাতেই দুঘণ্টা লেগে গেল। তারপরে এক কৃষ্ণকায় রমণী আমাকে প্রায় উলঙ্গ করে কোচের উপর শুইয়ে লম্বা লম্বা রবারের হাতুড়ি দিয়ে পেটাতে লাগলেন আর জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন আমার লাগছে কি না।

এরপরে বিদ্যুতের শক। অদৃশ্য প্রায় সূচ দিয়ে খোঁচা—নানারকম অত্যাচার চলল। ইতিমধ্যে ওজন, আয়তন ইত্যাদি সমস্ত কিছুর পরিমাপ নেওয়া হয়ে গেল। আগাগোড়া, বিশেষ করে রবারের হাতুড়ি দিয়ে পেটানোর পর আমি প্রায় সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়েছিলাম। কোন প্রশ্নের কী উত্তর দিয়েছি, কী বলেছি, কিছুই মনে পড়ে না। শুধুই মনে পড়ে দীর্ঘকায় বিশাল দেহ কৃষ্ণাঙ্গ ও শ্বেতাঙ্গ রোগীরা আমাকে খুবই অনুকম্পার সঙ্গে লক্ষ করছিল।

যা-ই হোক। ঠিক সাড়ে বারোটায় কৃত্তিবাস এল। এসে তিনশো ডলার নগদ কাউন্টারে জমা দিল। এবং আমাকে বলল, "চলো। এরপর থেকে এদের ব্যবস্থা অনুযায়ী চলতে হবে।"

কিন্তু হিতে বিপরীত হল। সেই রিপোর্ট পড়তে পড়তে বাড়ি ফেরার পথে গাড়ির মধ্যেই কৃত্তিবাস হাত-পা ছুড়তে লাগল। বলতে লাগল, "এসব কী? এটা কী হয়েছে!"

আমি কিছুই জানি না। কৃত্তিবাসকে বললাম, "হাতুড়ি দিয়ে পেটানোর পর আমার সম্বিৎ ছিল না। কিসে কী হয়েছে আমি জানি না।"

কৃত্তিবাস বিশ্বাস করল না। সে বাসায় ফিরে মিনতির মুখের উপর রিপোর্টটা ছুড়ে দিয়ে বলল, "বাবা আমার তিনশো ডলারের সর্বনাশ করেছে।"

মিনতি কিছু বুঝতে পারল না। আমিও কিছু বুঝছি না। তখন শুনলাম কৃত্তিবাস বলছে, "বাবার আর দোষ কী? এই ইয়াংকিগুলো একদম মাথামোটা। বাবাকে নিয়ে গেলাম রোগা হওয়ার চিকিৎসা করাতে, আরম্ভ করল মোটা হওয়ার চিকিৎসা।"

তখনই আমি বুঝতে পারলাম মোটা রোগা দুই-ই আপেক্ষিক ব্যাপার। মার্কিনি কিংবা অধিকাংশ শ্বেতাঙ্গর তুলনায় আমি খুবই রোগা।

বলা বাহুল্য আমার আর রোগা হওয়া হল না।

জীবনে প্রথমবার ঘুষ

কোনো বই-ই নির্ভুল বা ত্রুটিশূন্য থাকে না। অনির্বাণ রায়ের 'উৎসর্গপত্র' বইটির অভিনবত্ব স্বীকার করলেও দু'একটি কথা বলতে হয়।

প্রথমেই বলতে পারি বইটি একটু দায়সারা গোছের। উৎসর্গপত্র অলংকৃত বাংলাগ্রন্থ বেরোচ্ছে প্রায় দেড়শো বছর। হাজার হাজার বইয়ে হাজার রকম উৎসর্গপত্র। সুতরাং সংকলনটি ঝাড়াই-বাছাই এবং আকর্ষণীয় করবার অনেক সুযোগ ছিল। দু'চারটি আকর্ষণীয় উৎসর্গের দেখা যে এই বইয়ে মেলে না তা নয়, কিন্তু যখন দেখি কল্লোলোত্তর বাঙালি কবিদের মধ্যে মাত্র একজনের উৎসর্গপত্রই আটি, দশটা এবং তার কোনোটিই প্রায় কোনো অর্থে চমকপ্রদ নয়।

হয়তো কোনো পাঠক বলবেন চমকপ্রদ হওয়াটিই বড় কথা নয়। কিন্তু উৎসর্গপত্র চমকপ্রদ না হলে আর কীভাবে আকর্ষণীয় হতে পারে?

"মাকে" "প্রিয় বন্ধু জগাকে" "স্বর্গীয় পিতামহ গোপাল পাল মহাশয়ের শ্রীচরণে", বড়জোর রবীন্দ্রনাথ বা নজরুলকে উৎসর্গীকৃত গ্রন্থগুলি যা বহুলাংশে অনেকেরই পরিচিত সেগুলি ভালো বাছাই হওয়া প্রয়োজন ছিল।

তবু হাতের কাছে 'উৎসর্গপত্র' নামক সংকলনটি থাকা ভালো। এই বইয়ে রয়েছে "ক্রাইম কাহিনির কালক্রান্তি" নামক সুকুমার সেনের বইটির উৎসর্গপত্র... "শৈশবে সেদিন (১৯৬০) হাওড়া স্টেশনের এক প্ল্যাটফর্মে গাড়িতে উপবিষ্ট আমাকে বাবা

হকারের ট্রে থেকে বেছে নিয়ে ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের 'বাবুচোর' পুস্তকখানি কিনে দিয়েছিলেন সেই সৌরকরোজ্জ্বল অপরাহ্নের এবং পরবর্তীকালের অনেক অনেক আনন্দময় দিনরাত্রির স্মরণে।"

"আবির কি একটু বড়ই হয়ে গেলে?

মেজো জ্যেঠু

শঙ্খ ঘোষের 'ছোট্ট একটা স্কুল' বইয়ের উৎসর্গে রয়েছে।

জ্যোতিভূষণ চাকীর "বাগর্থকৌতুকী" বইটি উৎসর্গ করা হয়েছে "শব্দর্ষি রাজশেখর বসুর উদ্দেশ্যে।"

অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর "চেকভের দু'টি একাঙ্ক" বইয়ের উৎসর্গ করেছিলেন এভাবে :

"শ্রী বারিক মিত্র

শ্রীমতী অর্চনা মিত্র

সহৃদয়েষু

যশিডির চিড়িয়াখানায় আপ্যায়নের

বিমল স্মৃতিতে

সৌজন্যমুগ্ধ

অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়।"

এগুলো তো এই বইয়ে পাওয়া যাচ্ছে এবং আরো অনেক কিছু। এ ছাড়াও রবীন্দ্রনাথ। উৎসর্গপত্রের উৎসর্গে মোহনলাল মিত্র নামটি উল্লেখ করে বলা হয়েছে, যার গ্রন্থ "উৎসর্গে রবীন্দ্রনাথ" আমাকে হাতে পায়ে বল দিয়েছিল।

রবীন্দ্রনাথ ছাড়াও বিশ শতকের প্রথম যুগের এবং তারও আগে অনেক বইয়ের উৎসর্গপত্র এই সংকলনে উৎকলিত হয়েছে। কিন্তু বাদ পড়েছে আরও অসংখ্য। এই মুহূর্তে কত সব আশ্চর্য উৎসর্গের কথা মনে পড়ছে। সব বইগুলি হাতের কাছে নেই। মনে পড়ছে জসিমউদ্দিনের আত্মজীবনী "জীবন কথা" নামক গ্রন্থটি, যেটি উৎসর্গ করা হয়েছিল ১৯৫০-এর সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় নিহত কয়েকজন মুসলমান ভদ্রলোকের উদ্দেশ্যে যাঁরা অসহায় হিন্দুত্বের প্রাণরক্ষা করতে গিয়ে জীবনদান করেছেন। এমন মর্মস্পর্শী, বেদনাময়, উৎসর্গপত্র এই সাম্প্রদায়িক হানাহানির যুগে ভাবাই যায় না।

আর একটা বই। চল্লিশ বছর আগে একটা বইয়ের কথা মনে পড়ছে। সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়ের প্রথম গদ্যগ্রন্থ যা উৎসর্গ করা হয়েছিল "সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ও শক্তি চট্টোপাধ্যায়—বন্ধুপ্রতিমেষু।" লক্ষণীয় বন্ধুবর নয়, বন্ধুপ্রতিম, শুধু সন্দীপনই পারতেন।

পুনশ্চ : আমার 'ঘুষ' বইটি উৎসর্গ করেছিলাম এইভাবে, "নলিনী, জীবনে প্রথমবার ঘুষ গ্রহণ করো।" নলিনী মানে নলিনী চক্রবর্তী, আমার বন্ধু, সচ্চরিত্র সরকারি কর্মচারী।

বেড়ালছানা একদিন বেড়াল হয়ে যায়

গত শতাব্দীর মধ্যভাগে, আমাদের যৌবনকালে রঙ্গ-ব্যঙ্গ, পরিহাসে বেশ কয়েকটি পত্রিকা বাংলা ভাষায় প্রকাশিত হত। সবই যে খুব উচ্চমানের ছিল এমন নয়। সেটা সম্ভবও নয়। বিলিতি 'পাঞ্চ' পত্রিকা, কিংবা মার্কিন 'নিউইয়র্কার' কাগজের বিবর্তনই এর প্রমাণ।

সাম্প্রতিককালে নিউইয়র্কাব কাগজের কয়েকটি সংখ্যায় দেখলাম ভারি ইটের মতো, নিরেট সম্পাদকীয়। পাতার ফাঁকে ফাঁকে তথাকথিত আধুনিক কবিতা, দু-একটিতে রসিকতার করুণ প্রচেষ্টা। বাংলা ভাষার যে কোনো মাঝারি কবি এর চেয়ে ভালো লেখেন। আর হালকা চালের পরিহাসমুখর কবিতা অধুনা বাংলা সাহিত্যের সম্পদ হয়ে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু নিউইয়র্কারের পৃষ্ঠায় এর সঙ্গে তুলনীয় কবিতা চোখে পড়ল না।

এ ছাড়া কিছু ফ্যাশনেবল গল্প বা ওভারস্মার্ট রম্য রচনা, সে সবই নিউইয়র্কারের পাতা ভরিয়েছে! নিউইয়র্কার কোনো আদর্শ পত্রিকা নয়। তবু আমরা যারা সর্বত্র হাস্যরসের সন্ধান করেছি এখানেই দেখা পেয়েছিলাম স্টিফেন লিকক এবং জেমস থার্বারের মতো লেখকের।

স্টিফেন লিককে বাঙালি পাঠক বহুকাল ধরে কাছে পেয়েছেন। তাঁর রচনার স্বাদ গ্রহণ করেছেন শিব্রাম চক্রবর্তী মারফত। এমনকী, অর্ধসফল লেখক তারাপদ রায় আজীবন টুকে যাচ্ছেন স্টিফেন লিককে। স্টিফেন লিককের গল্প জীবনে প্রথম ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খোলা নিয়ে কিংবা শিব্রাম চক্রবর্তী পরিবেশিত তার যমজের গল্প অতুলনীয়।

জেমস থার্বার অন্য জাতের মানুষ। উনবিংশ শতকের শেষ ভাগের মার্কিন ঘরোয়া জীবন, তার নানা মজা—এককে সময়, স্থান, কাল পাত্রের দূরত্ব সত্ত্বেও তাঁকে খুব কাছের মানুষ মনে হয়। আর তা ছাড়া তাঁর সেই অনবদ্য কার্টুনসমূহ যা কখনও কোনোদিন পুরোনো হবে না।

এই সূত্রে মন পড়ছে বিলিতি কবি অগডেন ন্যাশ-এর কথা। আধুনিককালের সরস কাব্য রচনায় তাঁর কোনও জুড়ি নেই। তিনিই লিখেছিলেন,

The problem with every kitten is that
Eventually it becomes a cat.

প্রত্যেক বেড়াল ছানাকে নিয়ে সমস্যা একটাই, একদিন সেটা বেড়াল হয়ে যায়।

লিকক বা থার্বার কিংবা ন্যাশের মতো লেখক বা কবি সব সময় আশা করা যায় না। তেমনি বাংলা পত্রিকায় যদি কেউ নিয়মিত আশা করেন ত্রৈলোক্যনাথ, পরশুরাম,

শিব্রামের মতো লেখা, সেটা চূড়ান্ত বোকামি হবে। কেউ যদি ভাবেন সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় কেন শিব্রামের মতো লেখেন না কিংবা তারাপদ রায় পরশুরামের মতো না হোক নিদেনপক্ষে বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের মতো কেন লিখতে পারবেন না, সে বড় বাড়াবাড়ি হয়ে যাবে।

পুনশ্চ :

সরস পত্রপত্রিকা নিয়ে, যেরকম হয় এই রচনাটি খুব নিরস হয়ে গেল। একটি পুরোনো নিউইয়র্কার কাগজের কার্টুন থেকে একটি সরস কথিকা পেশ করছি। বিরসতা কাটানোর জন্য—

পার্কে একটি ছেলে একটি কুকুর নিয়ে খুব লাফালাফি, দৌড়াদৌড়ি করছিল। এক ভদ্রলোক ছেলেটিকে প্রশ্ন করলেন, "খোকা তোমার কুকুরের নাম কী?"

ছেলেটি বলল, "দেখুন আমার এই কুকুরটা খুব মুডি। আজ সাতদিন হল পুষছি ওকে। কিন্তু এখনও ও ওর নামটা বলেনি।"

দাঁতের হাসপাতাল

হাসপাতাল সম্পর্কে আমার ধারণা খুব স্পষ্ট নয়। আমার নিজের ব্যক্তিগত প্রয়োজনে আমাকে কখনও হাসপাতালে যেতে হয়নি। এমনকী খুব একটা স্পেশালিস্টের কাছেও যেতে হয়নি। চিরকাল পাড়ার ডাক্তারই আমাকে দেখেছেন। বিশেষজ্ঞের কাছে যাওয়া যেত কিংবা হাসপাতাল নার্সিংহোমে ভর্তি হয়ে চিকিৎসা করানো যেত এরকম শারীবিক বিড়ম্বনা অন্য দশজনের মতোই আমাকেও অবশ্য সইতে হয়েছে।

এই তো সেদিন সল্টলেকের রাস্তার একেবারে আমাদের নিজেদের গলির মুখে পড়ে গেলাম। রীতিমতো মুখ থুবড়ে পড়ে যাচ্ছিলাম জমাট বাঁধানো ফুটপাতের উপরে। পড়লে নাক, চোখ, মাথা সবই চ্যাপ্টা হয়ে যেত। দাঁত ভেঙে যেত, থুতনি বেঁকে যেত, সেই যাকে পাড়ার মস্তানেরা বলে মুখের জিয়োগ্রাফি পালটে দেওয়া, সেই অবস্থা হত।

শেষমুহূর্তে অতিশয় ক্ষিপ্র বিচক্ষণতায় বাঁ-হাত এবং বাঁ-হাটু দিয়ে শরীরের বাকি অংশকে সম্মুখ আঘাত থেকে রক্ষা করি। তারপর হাতে পায়ে ব্যথা, চলতে ফিরতে কষ্ট। সেদিনই সন্ধ্যাবেলা আমার দয়াবতী স্ত্রী মিনতি রায় প্রতিবেশী রশিদ ডাক্তারকে খবর দেন।

রশিদ ডাক্তার নামকরা চিকিৎসক। নাসিকা-কর্ণ-কণ্ঠ বিশেষজ্ঞ, কিন্তু তিনি আমার ভগ্নপ্রায় হস্ত পদের চিকিৎসায় মনোনিবেশ করলেন। আমি বাধা দিলাম। কিন্তু ডাক্তার

বললেন আপনার পা ভীষণ ফুলে গিয়েছে, অবিলম্বে আপনার চিকিৎসার ব্যবস্থা করা দরকার। কাল সকালে রেডি থাকবেন। আমি আপনাকে আমাদের হাসপাতালে নিয়ে যাব। আর সে হাসপাতাল যা-তা জায়গা নয় কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল। ডাক্তার নার্স ছাড়া সেই প্রাচীন হাসপাতালে যারা যায় অনেকেই ফেরে না। ইতিপূর্বে আমাকে চিকিৎসার জন্যে এই রকম হাসপাতালে কিংবা অন্য কোনো হাসপাতালে যেতে বা থাকতে হয়নি। সুতরাং আমি এক্ষেত্রেও রাজি হলাম না। আসলে ডাক্তার কিংবা হাসপাতাল সম্পর্কে আমার মনের মধ্যে যথেষ্ট ভয় আছে। ছোটোবেলায় আমি যে শহরে বড় হয়েছি সেই শহরের একমাত্র হাসপাতালের প্রধান ডাক্তার সব কাজ শেষ করে রাত দশটা নাগাদ স্নান-খাওয়া সেরে আধ বোতল ডক্টরস ব্র্যান্ডি খেয়ে হাতে একটা শক্ত লাঠি নিয়ে বেরোতেন। সেই লাঠি নিয়ে সারারাত শহরের সমস্ত পথের কুকুরকে তাড়া করে বেড়াতেন। তাঁর কম্পাউন্ডার তাঁর পিছনে একটা লণ্ঠন হাতে ছুটতেন। ডাক্তারের গর্জন, কুকুরের আর্তনাদ এবং মধ্যে মধ্যে কম্পাউন্ডারবাবুর করুণ আকুতি 'স্যার আর নয়, এবার চলুন।' সব মিলে যে ভয়াবহ পরিবেশ রচিত হত আজও আমাদের মনের মধ্যে সেটা রয়ে গিয়েছে।

হাসপাতাল নিয়ে আমার পরবর্তী অভিজ্ঞতা একটু বড় হয়ে কালীঘাটে।

কালীঘাটের মোড়ে আমাদের বাড়ির কাছে 'দান্তের হাসপাতাল'-এর কথা আগে লিখেছি। আমার ধারণা ছিল হাজরার মোড়ে যেমন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের নামে হাসপাতাল তেমনি কালীঘাটের মোড়ে মহাকবি দান্তের নামে হাসপাতাল। কিন্তু পরে জেনেছি ওটা সাইনবোর্ড লেখকের ভুল। সে দাঁতের হাসপাতাল লিখতে গিয়ে দান্তের হাসপাতাল লিখেছিল। চন্দ্রবিন্দু 'ন' হয়ে গিয়েছিল।

আসলে হাসপাতাল নিয়ে যে দুটি মজার গল্প সম্প্রতি শুনেছি সে দুটি বলার জন্যে হাসপাতাল সম্পর্কে এত সব হাবিজাবি লিখতে হল।

প্রথম গল্পটি এক ব্যক্তিকে নিয়ে ব্যথা হওয়ায় যে হাসপাতালে গিয়েছিল। ডাক্তারবাবু তাকে একটা এক্স-রে তুলতে বলেন এবং স্লিপ করে এক্স-রের ঘরে পাঠিয়ে দেন। অনেকক্ষণ পরে ডিউটি শেষে ডাক্তারবাবু যখন ফিরে যাচ্ছেন দেখেন এক্স-রে ঘরের বাইরে বেঞ্চিতে রোগীটি বসে আছে। একটা এক্স-রে করতে এতক্ষণ লাগবে কেন। ডাক্তার প্রশ্ন করলেন, 'কী ব্যাপার'? এখনও এক্স-রে হয়নি? রোগীটি গম্ভীর হয়ে বলল, 'পাঁচবার এক্স-রে করলাম এখনও ব্যথা কমল না।'

অন্য একটি ঘটনা। হাসপাতালের রিসেপশনে দেখা গেল এক ব্যক্তি জানতে চাইছেন, 'আচ্ছা নুরুদ্দিন মিঞা, তিনশো তেরো নম্বর বেডের পেশেন্ট কেমন আছেন?'

রিসেপশনের ভদ্রমহিলা এদিক ওদিক খোঁজ খবর করে খাতা পত্র উলটিয়ে দেখে জানালেন 'খুব ভালো নয়, খারাপও নয়। তবু সুস্থ হতে এখনও দু-চার সপ্তাহ লাগবে।' এরপর ভদ্রমহিলা ওই ভদ্রলোককে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনি কে?' ভদ্রলোক হেসে

বললেন, 'আমিই নুরুদ্দিন মিঞা। হাসপাতালের ভিতরে ডাক্তার নার্সদের জিজ্ঞাসা করলে কেউ বলে না তাই আপনার কাছেই জানতে হল।'

শ্বশুরবাড়িতে নিরামিষ

নিউইয়র্কবাসী রঞ্জিতকুমার দত্তকে প্রবাসী মার্কিনদেশীয় বাঙালিরা অনেকেই খুব ভালো চেনেন। তাঁর যখন হার্টের ব্যামো হয়েছিল, বিখ্যাত মার্কিন ডাক্তাররা খুব ভালো একটা ব্যাখ্যা দিতে পারেননি। অবশেষে তাঁরা বলেছিলেন, 'এর জন্য লাইফস্টাইল দায়ী।' তখন রঞ্জিতবাবু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে প্রকাশিত 'এখন সময়' নামের একটি পত্রিকায় তাঁর লাইফস্টাইল বলতে তিনি যা বোঝেন, লিপিবদ্ধ করেছেন। তার কয়েকটি এখানে উদ্ধৃত করছি হৃদয়সচেতন পাঠক-পাঠিকাদের জন্য।

• বেশি ঝাল ও মশলা দিয়ে শুটকি মাছ খেয়েছি। পান্তা ভাত ও ইলিশ মাছ ভাজা বাদ দিইনি।

• গরম জলে চা পাতা না ভিজিয়ে চা পাতা সিদ্ধ করে চা খেয়েছি।

• শ্বশুরবাড়িতে খাঁটি নিরামিষ খেয়েছি। নির্দিষ্ট সময়ে ঘড়ির কাঁটা ধরে ব্রেকফাস্ট, লাঞ্চ ও ডিনার খেয়েছি।

• তাস, ক্যারাম বোর্ড, মনোপলি, স্পেলিং বি খেলিনি। বেসবল, ফুটবল বা টেনিস খেলিনি বা টিভিতে দেখিনি।

• অ্যাডাল্ট ও ভায়োলেন্ট মুভি প্রচুর দেখেছি। সুইমিং পুল বা বিচে গিয়েছি ও উপভোগ করেছি। মিস ইউনিভার্স, মিস ওয়ার্ল্ড যাবতীয় বিশ্বসুন্দরী প্রতিযোগিতা রাতভর দেখেছি।

• প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে মোট আটবার ভোট দিয়েছি ও যাঁদের ভোট দিয়েছি তাঁরা কেউ জেতেন নি। স্টক বা শেয়ার বা বন্ডের ফাটকা বাজারে যাইনি, লাইসেন্স থাকা সত্ত্বেও এগুলি বিক্রি করিনি। ব্যাংকে টাকা রেখেছি, ক্যাশ দিয়ে জিনিস কিনেছি, ক্রেডিট কার্ড আমার নেই।

• ঋণ খেলাপি হইনি। বরং টাকা ধার দিয়ে ফেরত পাইনি। তেলা মাথায় তেল দিয়েছি, টাকা ওয়ালাদের টাকা ধার দিয়েছি।

• 'নিউইয়র্ক টাইমস' পড়ি এবং 'ডেলি নিউজ' বা 'ভিলেজ ভয়েজ'-এর ইংরেজি পড়ে বুঝতে পারি না। সকাল ছ'টার মধ্যে নিউইয়র্ক টাইমস পড়ি ও কেটে শবচ্ছেদ করে ক্লিপিং বানিয়ে ফেলি। সিলেটি গলায় ইংরেজি বলি। টুকে পাস করিনি, বরং

এখন ক্লিপিং-এর স্তূপ থেকে দীর্ঘ প্যারাগ্রাফ কপি করে লিখি, ছাপাইও। স্ট্যাম্প দিয়ে এগুলি বন্ধুবান্ধবকে পাঠিয়ে বিরক্ত করি।

• ইংরেজি ও বাংলা ৬০ বছর ধরে এক আঙুলে টাইপ করছি। আমি কমপিউটারে বকলম। ই-মেল কিছু পাঠাতে পারি না বা পেতে পারি না।

• রেড লাইট মান্য করি ও স্টপ সাইনে স্টার্ট বন্ধ করি।

• মাথায় ঘিলু নেই, তাই মাথা ধরেনি, তাই অ্যাসপিরিন খাইনি।

• গাঁজা খেয়ে প্রচুর লিখেছি ও লাল ওয়াইন সহযোগে লেখাগুলো চূড়ান্ত করেছি।

• সঙ্গী পেলে বকবক করি, আর না পেলে শুধু পড়েছি।

হৃদরোগ নিয়ে মানুষের আশঙ্কা এবং উদ্বেগের অন্ত নেই। যে-কোনো পত্র-পত্রিকায় হৃদরোগ বিষয়ে রচনা থাকলে লোকে সেটাই মন দিয়ে পড়ে। এইসব ভেবেই রঞ্জিত-বাবুর রচনা থেকে উদ্ধৃতিগুলি দিলাম। রঞ্জিতবাবু হৃদরোগ আক্রান্ত হয়েছিলেন এবং সম্ভবত মার্কিনি চিকিৎসার গুণেই সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করেছেন।

সে যা হোক, হৃদয়ঘটিত আলোচনা একটু সহজভাবে শেষ করি। এক হৃদরোগের ডাক্তার রোগীকে বলেছিলেন, "জানলা দরজা খুলে রাতে মুক্ত হাওয়ায় শোবেন।"

পরদিন সকালে ডাক্তারবাবু ফোন পেলেন, "আপনার চিকিৎসায় আমি মারা পড়তে বসেছি। আপনার কথামতো রাতে জানলা-দরজা খোলা রেখে ঘুমোলাম। চোরে এসে সর্বস্ব নিয়ে গেছে।"

দু'চারজন প্রকৃত লুটেরা

আমাদের অল্প বয়সে রঙের এত ছড়াছড়ি ছিল না। সাধারণত রঙিন বই বা পত্রিকা দেখা যেত না। রঙিন বই বা পত্রিকা প্রায় ছিলই না। টেলিভিশন তখন প্রায় আসেইনি। যখন এল, তখন অনেকদিন সাদা-কালো ছিল। বিশ-শতকের প্রায় মাঝামাঝি পর্যন্ত সাদা-কালো সিনেমা লোকে মেনে নিয়েছিল।

মনে আছে, শতকের মাঝামাছি সময়ে যখন প্রথম রঙিন ফিল্‌ম এল, জনসাধারণের মধ্যে সে কী উত্তেজনা। বোধহয় সিনেমাটার নাম ছিল, 'আন'। রঙিন ছবি, সেই সঙ্গে নাদিরা নামে এক নবাগতা ভ্যাম্প, যাঁর ঠোঁটে পাইপে বসানো সিগারেট খুবই হইচই ফেলে দিয়েছিল। তখন আমরা সাধারণত একতলায় পাঁচ সিকে দামের টিকিটে দ্বিতীয় শ্রেণিতে সিনেমা দেখতাম। মনে হয়, টিকিটের দাম আট আনা বেশি ধার্য হয়েছিল।

আলোক বিভাজনের সাতটি মূল রঙের কথা বলা হয়। বেগনি, গাঢ় নীল, নীল, সবুজ, হলুদ, কমলা, লাল। অনেকে সব রং দেখতে পায় না। তারা দু'একটা রং কম দেখে। একটা গোল চাকায় সব কটি রংকে সমান অংশ দিয়ে বনবন করে ঘোরালে

কোনো রংই দেখা যায় না। মনে হয় সাদা। আসলে সাদা হল সব রঙের মিশ্রণ। যেমন—সূর্যকিরণ। রামধনুর সাত রং রৌদ্রে সাদা হয়ে যায়। আবার কোনো রং না থাকলে সেটা কালো। আমি নিজে বর্ণান্ধ। ধরা পড়েছিল কলেজের প্রথম বছরে। এয়ারফোর্স থেকে কর্তারা এসেছিলেন নতুন শিক্ষানবিশ নিতে। এ-বয়সে সবাই যেমন করে, আর সকলের সঙ্গে লাইন দিয়ে আমিও পরীক্ষা দিয়েছিলাম। সেখানে ধরা পড়ে আমি সবুজ, নীল ইত্যাদি রং ভালো করে ধরতে পারি না। অবশ্য লাল, নীল, হলুদে অসুবিধে নেই।

বর্ণান্ধ রোগের কোনো চিকিৎসা নেই। অন্তত তখন ছিল না। আজকাল হয়েছে কি না জানি না। ঘনিষ্ঠরা কেউ কেউ বলেন বর্ণান্ধ বলেই আমার কবিতা একটু অন্যরকম। নীলকে সবুজ বলি। বেগনিকে নীল ভাবি।

রবীন্দ্রনাথ বিষয়েও এরকম কথা শোনা গিয়েছে। একজন অধ্যাপক তো রীতিমতো বিশ্লেষণ করে দেখাতে চেয়েছিলেন, রবীন্দ্রনাথ বর্ণান্ধ ছিলেন। এবং সেই জন্যই তাঁর কবিতায় সুন্দর দিগন্তের ইন্দ্রজাল ইন্দ্রধনুর ছটা। তবে এই প্রসঙ্গটি একটু বাড়াবাড়ি হয়ে গিয়েছিল, যথাসময়ে চাপা পড়ে গিয়েছে।

বর্ণান্ধরা দিনের বেলায় যেমন তেমন হলেও সন্ধ্যার পর তাদের বর্ণভ্রম বেশি হয়। সেই ১৯৬২ সালে ভারত-চিন যুদ্ধের সময় একটা মজার গল্প শুনেছিলাম।

একদিন সন্ধ্যাবেলা কলকাতার চিনেবাজারে, মানে বেন্টিংক স্ট্রিটে কয়েকজন নিরীহ চিনে দোকানদারের জুতোর দোকান লুঠ হয়। ব্যাপারটা অপরিসীম লজ্জার। কিন্তু এর মধ্যে একটা মজার ঘটনা ঘটেছিল। দু'চারজন প্রকৃত লুটেরার সঙ্গে অধিকাংশ লুটেরাই ছিল অ্যামেচার। এরকম অ্যামেচার একজন লুঠেরা সরদারকে বলেছিল, "ভাই। এর পরের বার যখন জুতোর দোকান লুঠ করবে, দিনের বেলায় করবে কিন্তু।"

এর কারণ জানতে চাইলে সেই ব্যক্তি বলেছিল, "সন্ধ্যাবেলা লুঠের সময় রং গুলিয়ে ফেলেছিলাম। বাসায় গিয়ে দেখি একপাটি জুতো লাল রঙের, আর একপাটি কালো রঙের।" সুখের বিষয়, এরপরে আর ঘোরতর বিপর্যয়ের দিনেও কলকাতায় চিনে দোকান লুঠ হয়নি। বরং চিনেরা দোকান-বাজার হোটেল করে এ-শহরে ভালোই আছে।

আজকাল আনন্দ উৎসবে জয়ের আনন্দে আবির খেলা হয়। তার আবার রাজনৈতিক রং আছে। বামেদের লাল আবির। আর অ-বামেদের সবুজ আবির।

কিছুদিন হল গৈরিক আবিরও প্রচলিত হয়েছে। কখনও লক্ষ করেছেন, একটু আবির মাখলেই একটা মানুষের চেহারা কেমন অন্যরকম হয়ে যায়?

হোলি বা দোল উৎসবকে আমরা বলি রং খেলা। সে এক সাংঘাতিক খেলা। পাঁচ-সাত বছরের শিশু-কিশোর থেকে যুবক-যুবতী, বয়স্করা হোলির দিন সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত রং খেলে বেড়ায়। সারা বেলা ধরে খেলা। এই রং খেলা নিয়ে আমার একটা পুরোনো গল্প আছে, তবে সেটা পরের বার।

রংবাজ ভূপতিবাবু

বোধহয় তিরিশ বছর আগের কথা। আমরা পণ্ডিতিয়া অঞ্চলে থাকি। দক্ষিণ কলকাতার ওইসব অঞ্চলে রং খেলার খুব ধুম।

আমাদের ছেলে তাতাই, মানে ডোডো-তাতাই-এর তাতাই, তাতাইয়ের বয়স তখন সাত-আট বছর। বেলা বাড়তে বাড়তে রং খেলা জমে উঠল। হইচই, হুলস্থূল, তুলকালাম কাণ্ড। একটি ছোটো রাস্তায় অন্তত পঞ্চাশ-ষাটটি ছেলেমেয়ে উদ্দাম-উল্লাসে দোল খেলছে।

এমনতর কঠোর নিষেধ অগ্রাহ্য করে বেলা সাড়ে ন'টা-দশটা নাগাদ তাতাইও ঝাঁপিয়ে পড়ল রং খেলার রণাঙ্গণে। লাল, হলুদ. ম্যাজেন্টা, নীল—নানারকম রং, এমনকী কালো আলকাতরা, পচা ডিম অনেক কিছুই সেই বর্ণযুদ্ধে ব্যবহৃত হয়েছিল। কিছুক্ষণের মধ্যেই কে যে কে সেটা আর চেনা যাচ্ছে না, মাথার চুল থেকে পায়ের গোড়ালি পর্যন্ত রঙে মাখামাখি। পায়ের জুতো বা চপ্পল কখন নিরুদ্দেশ হয়েছে। গায়ের জামাগেঞ্জি ছিঁড়ে গিয়েছে। সবাই দেখতে মিলেমিশে প্রায় একরকম। ছেলেমেয়ে আলাদা করা যায় না।

বারোটা নাগাদ হুল্লোড় তুঙ্গে উঠল। ইতিমধ্যে পাশের পাড়াব একটি দল আমাদের পাড়াতে ঢুকে গিয়েছে। জাপটা-জাপটি। দু'একটা ছোটো মারামারি শুরু হয়েছে।

মিনতি গিয়ে দঙ্গলের মধ্য থেকে তাতাইকে ধরে আনল। রং মেখে কিম্ভুতকিমাকার হয়েছে। দেখে চেনাই যায় না। সে আসার সময় যথেষ্ট বাধার সৃষ্টি করেছিল। এমনকী, মিনতির হাতে কামড়ে দিয়েছিল।

যা-ই হোক, তাকে বাথরুমে নিয়ে গিয়ে প্রথমে ছেঁড়া তোয়ালে দিয়ে মুখ মুছিয়ে তারপর সাবানজল দিয়ে মুখ ধোয়াতেই মিনতি বিস্মিত আর্তনাদ করে উঠল। আমি তাড়াতাড়ি বাথরুমের সামনে গেলাম। মিনতি বলল, "এ তো তাতাই নয়।"

আমিও দেখলাম তাতাই তো নয়ই, এ বাচ্চাটা ছেলেই নয়। ভালোই চিনি। ডোনা নাম। তিনবাড়ি দূরের প্রতিবেশী চক্রবর্তীবাবুদের নাতনি।

বাংলায় রং মানে বর্ণ। বর্ণ শব্দটির নানারকম ব্যবহার। নানারকম অর্থ। বর্ণবিদ্বেষ থেকে বর্ণপরিচয় পর্যন্ত। পাড়াগাঁয়ের লৌকিক কথাবার্তাতেও বর্ণ শব্দের চমৎকার ব্যবহার।

'নববধূ গৌরবর্ণ' কিংবা কোনো ঘটনা 'বর্ণে বর্ণে সত্যি'—এই দুই বর্ণ এক নয়। প্রথম বর্ণ হল রং। আবার রং শব্দটির একটি মানে আছে, চলিত কথায়। যেমন, রং-এর কথা, দক্ষিণ চব্বিশ পরগনায় যাকে বলে অং-এর কথা অর্থাৎ ভালোবাসার কথা। 'মনে অং ধরেছে' অর্থাৎ প্রেমের শুরু।

ইংরেজিতে রং হল Wrong, মানে ভুল। এই ইংরেজির সঙ্গে বাংলা মিলিয়ে একটি চমৎকার শব্দ শুনেছিলাম একটি সরকারি অফিসে। সে অফিসে আমি নতুন বদলি হয়ে গিয়েছিলাম।

অফিসের একজন বড়বাবু বেশ ধীর-স্থির। গম্ভীর প্রকৃতির। আমি প্রথম দিকে তাঁর উপরে একটু নির্ভর করতে গিয়েছিলাম। এমন সময় এক সহকর্মী আমাকে সাবাধান করে দিলেন, "সর্বনাশ! ভূপতিবাবুর উপর মোটেই নির্ভর করবেন না। ওরকম রংবাজ লোক পৃথিবীতে কম।"

আমি তো অবাক। প্রবীণ ভূপতিবাবু তিনি এই বয়সে কী রংবাজি করলেন?

সহকর্মী বললেন, "আরে মশাই! রংবাজি মানে কি ইভটিজিং করবে, ছ্যাবলামি করবে? এ আসল রংবাজ (Wrong-বাজ)। এমন ভুলো চরিত্র দেখা যায় না। ধীরে ধীরে আমি জেনেছিলাম ভূপতিবাবু সত্যিই রংবাজ। সবই ভুলে মেরে দেন। তাঁর ভুলের জন্য সবাইকে পস্তাতে হয়।

অবশেষে সেই বাক্যটি বলি, 'টু রাইটস মেক এ রং'। এই রাইট হল Wright ব্রাদার্স। এঁরা দুজনে মিলে এরোপ্লেন বানিয়েছিলেন। তাই বলা হয় দুটো রাইট মিলে একটা রং অর্থাৎ ভুল জিনিস তৈরি হয়েছিল।

রোমে রসুনের দাম কত

আগেকার দিনে লোকেরা সর্বস্বান্ত হয়ে নিজেদের আদালত থেকে দেউলিযা ঘোষণা করত উত্তমর্ণদের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য।

মজার কথা লিখতে লিখতে আমি তো কবেই সর্বস্বান্ত হয়ে গিয়েছি। কিন্তু একালে সাহিত্যের কোনো আদালত নেই, যেখান থেকে নিজেকে দেউলিয়া ঘোষণা করতে পারি। আর আমার সম্পাদককে কতবার ঘুরিয়ে ফিরিয়ে এ কথা বলেছি, আর নয়। ক্ষমা-ঘেন্না করে এবার ছেড়ে দিন। কিন্তু ভদ্রলোকের কেমন যেন ধারণা হয়েছে আমাকে মজার লেখা লিখে দিতেই হবে।

তিনি ভালোই জানেন, পাঠক মোটেই আমার লেখার জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে থাকে না, কখনো পড়েও না। কিন্তু চৈনিক বাস্তু জ্যোতিষশাস্ত্রের কী যেন নাম (ফেংশুই নাকি) ঘব সাজানোর ভাগ্য সহায়ক নির্দেশের মতো আমার লেখাটিও সপ্তাহান্তে একদিন সম্পাদকীয় পৃষ্ঠার একপ্রান্তে মুদ্রিত না হলে মন কেমন খুঁতখুঁত করে।

খুঁত-খুঁতানি থাক। সেই পুরোনো গল্পেই যখন যেতে হচ্ছে ভিক্ষা করেই শুরু করি।

ভিখারি, ভিখিরি বা ভিক্ষুক মানবসভ্যতার সমান প্রাচীন। যেদিনই মানুষের

ব্যক্তিগত উপার্জন শুরু হল সেদিন থেকে ভিখারিরও যাত্রা শুরু। তার উপস্থিতি রয়েছে বেদ, বেদান্তে, বাইবেলে, কোরানে, প্রাচীন মহাকাব্যে—সর্বত্র।

প্রাচীন বাংলা কবিতায় আছে ভিখারিকে গৃহিণী জিজ্ঞাসা করছেন, রোমে এখন রসুনের কী দর? বোধহয় ওই গৃহিণী ভেবেছিলেন, ভিখারি এত জায়গায় যায়, রোমে যায় না? অথবা রসুনের দাম অত্যধিক হয়ে যাওয়ায় তাঁর মানসিক ভারসাম্য নষ্ট হয়ে গিয়েছিল।

মানুষ কেন ভিক্ষা করে?

এত সরাসরি উত্তর হতে পারে যে, উপার্জন করার সমস্ত ক্ষমতা শেষ হয়ে যাওয়ায় ভিক্ষা করাই একমাত্র অবলম্বন হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু যারা ভাবেন ভিক্ষা করায় পরিশ্রম কম, শুধুমাত্র অলস মানুষেরই ভিক্ষা করে সেটা কিন্তু ঠিক নয়।

সকাল থেকে সন্ধ্যা রোদ-বৃষ্টিতে রাস্তায় বসে থেকে কিংবা অ্যালুমিনিয়ামের থালা হাতে পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে অথবা মন্দিরে, মসজিদে, সিনেমাহল, খেলার মাঠের মুখে ভিক্ষাপাত্র হাতে দাঁড়িয়ে কম ধাক্কাধাক্কির মধ্যে পড়তে হয় নাকি ভিখারিকে?

এইরকম এক ভিখারির সঙ্গে রাইটার্স বিল্ডিংসের সামনে ফুটপাতে আমার দেখা হয়েছিল। ভিখারিকে দেখে ভদ্রলোক বলেই মনে হয়। এ-কথা হয়তো অনেকেরই জানা নেই, অনেক ভদ্র চেহারার লোকই বাধ্য হয়ে ভিক্ষাবৃত্তিতে নিযুক্ত হন।

অবসরপ্রাপ্ত কিন্তু পেনশন-অপ্রাপ্ত ভিখারি শিক্ষক মহাশয়ের করুণ কাহিনি সংবাদপত্রের বাঁধা খবর।

তা যা হোক, রাইটার্সের রাস্তায় যে ভদ্রলোকের সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল, যিনি একটা কোয়ার্টার পাউন্ড পাউরুটি কেনার জন্য সোয়া দু'টাকা ভিক্ষা চাইছিলেন, তাঁকে দেখে কেমন চেনা মনে হয়েছিল। এক মুহূর্তের মধ্যেই আমার খেয়াল হল আরে, এই ভদ্রলোকই মাসখানেক আগে আমাদের বাড়ি গিয়ে দশ টাকা দামের, 'উপার্জন করিবার একশো আটটি উপায়' নামে বই বিক্রি করে এনেছিলেন।

এ-কথাটা ভদ্রলোককে স্মরণ করিয়ে দিতে ভদ্রলোক স্বীকার করলেন, "হ্যাঁ, আমিই ওই বইয়ের লেখক ও প্রকাশক।"

কী আর বলব। সংক্ষিপ্তভাবে বললাম, "তা হলে?"

ভদ্রলোক করুণ হেসে বললেন, "তা হলে আর কী, বইটা আপনি পড়েননি। একশো আটটি উপায়ের মধ্যে ভিক্ষাবৃত্তিও উপার্জনের একটি পন্থা।"

ডেঙ্গু না ডেঙ্গি

কলকাতা শহরে হাসপাতালের আনাচে কানাচে আজ কিছুদিন হল একটা গল্প খুব চালাচালি হচ্ছে। গল্পটা শুরু হয়েছে সেই সময়ে, এই অল্প কিছুদিন আগে, যখন ডেঙ্গু ভাষান্তরে ডেঙ্গি জ্বরে শহর তোলপাড় হয়েছিল, এটা সেই সময়ের গল্প।

সেই সময় হঠাৎ দেখা যায় সংবাদমাধ্যমের একাংশ ডেঙ্গু না বলে ডেঙ্গি লেখা আরম্ভ করেছে। হঠাৎ একদিন সকালে মানুষ দেখল এতদিন তারা যাকে ডেঙ্গু জ্বর ভাবত সেটা আসলে ডেঙ্গি জ্বর। এই পরিবর্তনের কী কারণ তা অবশ্য সাধারণ মানুষ জানতে পারেনি।

এই সময় এক ভদ্রলোক জ্বরে আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য ভর্তি হয়েছিলেন। তাঁর আশঙ্কা হয়েছিল তিনি বোধহয় ডেঙ্গু জ্বরে আক্রান্ত হয়েছেন। অবশেষে সাতদিন পরেও যখন তাঁর জ্বর সারল না, তিনি নিশ্চিত হলেন তাঁর ডেঙ্গু জ্বরই হয়েছে এবং তিনি মারা যাবেন। এই সময় তিনি অস্থির হয়ে উঠলেন।

তারপর আরও দু'চারদিন গেল। এখন তিনি স্থির নিশ্চিত যে, তাঁর মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী এবং অবিলম্বে হবে। সাধারণত রোগী একবার স্থির বুঝে গেলে যে তার মৃত্যু অনিবার্য সে সম্পূর্ণ ঝিমিয়ে পড়ে, আর অস্থিরতা থাকে না। এ ক্ষেত্রে কিন্তু বিপরীত ঘটল। প্রত্যেকদিন সকালবেলা তিনি বিভিন্ন খবরের কাগজ নিয়ে বসেন এবং সবগুলিতে শুধু ডেঙ্গু/ ডেঙ্গি জ্বরের খবরগুলি পড়েন এবং একবার এ কাগজের হেডলাইন দেখেন একবার ও কাগজের হেডলাইন দেখেন। তারপর দুই কাগজের ভিতরের খবর মিলিয়ে পড়েন। আর অস্থির পদচারণা করতে থাকেন।

ডাক্তারবাবুরা দূর থেকে তাঁকে দেখে ভয়ে এড়িয়ে যান। কিন্তু সেদিন একজন সাধাসিধে ডাক্তার মনের ভুলে তাঁর ঘরের সামনের বারান্দা দিয়ে শর্টকাট করার চেষ্টা করছিলেন। সেই সময় ডাক্তারবাবুকে দেখে রোগশয্যা থেকে সেই রোগী উঠে ছুটে গিয়ে ডাক্তারবাবুকে বলেন, "ডাক্তারবাবু, আপনাকে রোগ কষ্টের কথা বলছি না, মৃত্যুভয়ের কথা বলছি না, শুধু আপনি আমার মনেব একটা জটিল প্রশ্ন আমার মৃত্যুর আগে মীমাংসা করে দিয়ে যান।"

ডাক্তারবাবু স্তম্ভিত। তিনি বুঝতেই পারছেন না কিসের মীমাংসা করতে হবে। রোগী নিজেই জিজ্ঞাসা করলেন, "ডাক্তারবাবু, আপনি আমার মৃত্যুর আগে আমাকে বলে দিন আমি ডেঙ্গু জ্বরে মারা যাচ্ছি, না ডেঙ্গি জ্বরে মারা যাচ্ছি।"

* * *

উপরের এই গল্পটি হয়তো সত্যি নয়। একটু বাড়াবাড়ি হয়েছে গল্পটায়। কিন্তু এ-

কথা সত্যি যে হাসপাতালের রোগীরা নানারকম সংশয়ে ভোগেন, তার কারণ তাঁর সত্যি ঠিক কি হয়েছে সেটা তাকে জানানোর কেউ নেই। তা ছাড়া, রোগীকে তার রোগ সম্পর্কে বিস্তারিত জানানোর নিয়ম নেই। এই নিয়মেই থাকায় অনেক রোগীকেই নিজেকে চেষ্টা করে জেনে নিতে হয় তার অবস্থা ঠিক কী রকম। এই ধরনের চেষ্টার একটি নমুনা।

হাসপাতালের এনকোয়ারিতে এক জীর্ণ-শীর্ণ ব্যক্তি এসে জিজ্ঞাসা করল, "দাদা, তিনতলার ছয় নম্বর কেবিনের বলাইবাবু কেমন আছেন?" এনকোয়ারির কর্মচারী ভদ্রলোকের খাতাপত্র দেখে বলল, "একটু ভালো আছেন। একটা ছোটো অপারেশন বাকি আছে। সেটা ঠিকঠাক হলে হয়তো ছেড়ে দেওয়া হবে।"

তারপর তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, "আপনি বলাইবাবুর কে হন?"

জীর্ণ-শীর্ণ ভদ্রলোক বললেন, "আমিই বলাইবাবু।"

এনকোয়ারির সপ্রশ্ন দৃষ্টির সামনে দাঁড়িয়ে তিনি জানালেন, "আপনারা তো আমাকে বলবেন না কেমন আছি, তাই এই কায়দা করতে হল। ধন্যবাদ।"—এই বলে নমস্কার করে ভদ্রলোক তাব বেডে ফিরে গেলেন।